শ্রীল রূপগোস্বামী কৃত

# ভক্তিরসামৃতসিন্ধু



কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীল রূপগোস্বামী কৃত
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

ভক্তিবেদান্ত
বুক ট্রাস্ট

# ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

**কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দ্বারা রচিত গ্রন্থাবলী :**

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১০ম স্কন্ধ)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)
লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
ঈশোপনিষদ
পরলোকে সুগম যাত্রা
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
দেবহূতিনন্দন কপিলদেবের শিক্ষা
প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
যোগসিদ্ধি
জীবন আসে জীবন থেকে
জন্মমৃত্যুর পরপারে
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
কৃষ্ণভাবনামৃত এক অনুপম উপহার
গীতার গান
ব্যাক্ টু গড্‌হেড (প্রতিষ্ঠাতা)

অনুরোধের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ-তালিকা পাওয়া যাবে :
The Bhaktivedanta Book Trust, ISKCON Temple, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400049, India

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ইস্‌কনের কেন্দ্রগুলিতে উপলব্ধ আছে। অনুগ্রহ করে আপনার নিকটবর্তী একটি কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ করুন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত

# ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

## ভক্তিযোগের সম্পূর্ণ বিজ্ঞান

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
কর্তৃক রচিত **The Nectar of Devotion** গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক : শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

এই গ্রন্থের বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সম্পাদকের সঙ্গে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে :

সম্পাদক
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ-মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির
শ্রীমায়াপুর ধাম
জিলা : নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৩১৩

Website / E-mail :
www.indiabbt.com
admin@indiabbt.com

Nectar of Devotion (Bengali)

1st to 16th printings : 1,06,000 copies ( BBT Mayapur Press )
17th printing, December 2016 :15,000 copies ( BBT Mumbai )



ISBN : 978-93-85986-46-8



Published & Printed by
The Bhaktivedanta Book Trust
Hare Krishna Land,
Juhu, Mumbai 400 049, India

C8AB

# সূচীপত্র

# উৎসর্গ

## শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামীর করকমলে—

*নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ*
*লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।*
*রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ*
*বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥*

যাঁরা নানা শাস্ত্র-বিচারে অতিশয় নিপুণ, সদ্ধর্ম সংস্থাপক, সর্ব-লোকের হিতকারী, ত্রিভুবনে সকলের মান্যপাত্র, সকলের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এবং যাঁরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজনানন্দে মত্ত সখীভাব প্রাপ্ত, সেই শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে আমি বন্দনা করি।

# ভূমিকা

এই গ্রন্থটি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদের সংস্কৃত রচনা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* নামক গ্রন্থের সার-সংকলন। শ্রীল রূপ গোস্বামী হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ ষড়্-গোস্বামীদের অন্যতম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বাংলার মুসলমান নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী তখন দবির খাস ও সাকর মল্লিক নামে পরিচিত ছিলেন। আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে, সেই সময় হিন্দু সমাজ অত্যন্ত গোঁড়া ছিল এবং কোন ব্রাহ্মণ যদি মুসলমান নবাবের চাকরি গ্রহণ করত, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে সমাজচ্যুত করা হত। দবির খাস ও সাকর মল্লিকও তাই সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁরা অতি সম্ভ্রান্ত সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মুসলমান নবাব হুসেন শাহের দরবারে চাকরি গ্রহণ করার ফলে তাঁরা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। অপার করুণাময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু তাঁদের তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং সমস্ত ব্রাহ্মণকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ যে গোস্বামীপদ তাতে অধিষ্ঠিত করেন। ঠিক এমনইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে তাঁর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের' নামাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। যদিও তিনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যে তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিতে এসেছিলেন তা সার্বজনীন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে মানুষ কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাঁর পদ ব্রাহ্মণকুলে জাত মানুষের থেকেও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। সেই কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রতিটি মানুষকে যথার্থ পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করে তাদের অতি উচ্চ গোস্বামীর পদে অধিষ্ঠিত করা। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত সেই শিক্ষা এই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দবির খাস ও সাকর মল্লিক এই দুই ভাইয়ের প্রথম মিলন হয় মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে, এবং সেই মিলনের ফলে দুই ভাই নবাবের মন্ত্রিত্বের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। দবির খাস, যিনি পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি তখনই তাঁর রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, এবং কর্মরত অবস্থায় যে ধন-সম্পদ তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, তা যথাযথভাবে বিতরণ

করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর কাছে এত সোনা ছিল যে, তাতে একটি বড় নৌকা বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সম্পত্তি তিনি যেভাবে বিতরণ করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত ভগবদ্ভক্তদের, এমন কি সমস্ত মানব-সমাজের গ্রহণ করা উচিত। তাঁর সম্পত্তির অর্ধাংশ তিনি ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিতরণ করেন, এক-চতুর্থাংশ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দান করেন এবং বাকি চতুর্থাংশ একজন ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত রেখে দেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে বলে। তারপর সাকর মল্লিক যখন নবাবের কাছে অবসর গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন নবাব খুব অসন্তুষ্ট হন এবং কোনমতেই তাঁকে রাজকার্যে বহাল থাকতে সম্মত করতে না পেরে, তিনি অবশেষে তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন। সাকর মল্লিক, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি রূপ গোস্বামীর গচ্ছিত টাকাটি কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়ে হুসেন শাহের কারাগার থেকে মুক্ত হন। এইভাবে দুই ভাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয় প্রয়াগে (এলাহাবাদে) এবং সেই পুণ্যতীর্থের দশাশ্বমেধ ঘাটে মহাপ্রভু তাঁকে দশদিন ধরে পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি রূপ গোস্বামীকে বিশেষভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা আমাদের *The Teachings of Lord Chaitanya* নামক ইংরাজী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

পরবর্তী কালে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ সেই বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক বিবরণ এবং শাস্ত্রজ্ঞানের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু *ষড়্-গোস্বামী অষ্টকম্* নামক স্তবে বর্ণনা করে গেছেন যে, এই ছয়জন গোস্বামী ছিলেন অতি উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত, তাঁরা কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন না, ফারসী, আরবী ইত্যাদি বিদেশী ভাষাতেও তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে বৈদিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র বিচার করে দেখিয়ে গিয়েছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করাই হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এই 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ'ও শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত সমস্ত বৈদিক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই আমরা 'রূপানুগ বৈষ্ণব' নামে পরিচিত। অর্থাৎ আমরা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। আমাদের পথপ্রদর্শন করবার জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ এই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন, যার ভাষ্যসহ

ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে *The Nectar of Devotion* (বর্তমান গ্রন্থটি *The Nectar of Devotion*-এর বাংলা অনুবাদ)। যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থটির সাহায্য গ্রহণ করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

'ভক্তি' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'ভগবানের সেবা'। সব রকমের সেবাতেই এমন একটা আকর্ষণীয় মাধুর্য থাকে, যা মানুষকে সেই সেবায় অনুপ্রাণিত করে। এই জগতে আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত কোনও না কোনওভাবে কারও না কারও সেবা করে চলেছি। সেবা না করে আমরা থাকতে পারি না। স্ত্রীর এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে গৃহী ব্যক্তিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করে। তেমনই আবার লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা সমস্ত জনগণের জন্য বা একটি বৃহৎ পরিবারের জন্য একইভাবে পরিশ্রম করে। জাতীয়তাবাদীরা তাদের দেশ এবং দেশের মানুষদের মঙ্গল সাধন করার জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে। যে আবেগ এই সমস্ত গৃহী, লোকহিতৈষী ও জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করে, তাকে বলা হয় রস, অর্থাৎ এক প্রীতির সম্পর্ক যার স্বাদ অত্যন্ত মধুর। 'ভক্তিরস' হচ্ছে এমনই এক অপ্রাকৃত রস। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বিষয়ী কর্মীরা যে রস আস্বাদন করে থাকে, সেই রস আর এই রস এক নয়। দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিষয়াসক্ত মানুষেরা যে রস আস্বাদন করে, তা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়া কিছুই নয়। সেই রসের স্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই বিষয়াসক্ত মানুষেরা সর্বদাই তাদের উপভোগের অবস্থার পরিবর্তন করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার চেষ্টা করে। ব্যবসায়ী সারা সপ্তাহ ধরে কাজ করে শান্তি পায় না; তাই সপ্তাহশেষে কোথাও বেড়াতে গিয়ে সে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ক্ষণিকের জন্য ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। এইভাবে দুইদিন ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ভুলে থেকে সে আবার তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ শুরু করে। জাগতিক কর্ম মানেই হচ্ছে কিছুকালের জন্য কোনও কর্মে রত হওয়া এবং তারপর তা থেকে বিরত হওয়া। একে বলা হয় ভোগ-ত্যাগ, অর্থাৎ কোন বিশেষ উপায়ে কিছুকালের জন্য জড় ইন্দ্রিয়ভোগ করার চেষ্টা করা এবং তারপর তা পরিত্যাগ করা। জীব কখনই অবিচলিত-ভাবে জড়ইন্দ্রিয় অথবা ত্যাগে লিপ্ত হতে পারে না। পরিবর্তন প্রতিনিয়তই হয়ে চলেছে, এবং আমরা এর কোন অবস্থাতেই সুখী হতে পারি না, কারণ আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি। জড় ইন্দ্রিয়সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাই তাকে বলা হয় 'চপল-সুখ'। যেমন, কঠোর পরিশ্রম করে কোন মানুষ তার পরিবার পরিজনদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করতে সক্ষম হতে পারে এবং তার ফলে সে কোনও বিশেষ রস আস্বাদন করতে পারে, কিন্তু তার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সুখও অন্তর্হিত হয়ে যায়।

তাই নাস্তিক ভাবাপন্ন মানুষদের কাছে মৃত্যু হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি। ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ-সেবার দ্বারা ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, আর নাস্তিক মৃত্যুরূপে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করে। মৃত্যুতে সব কিছু পরিসমাপ্তি হয়, এবং তাকে নতুন পরিবেশে নতুন জীবন শুরু করতে হয়—সম্ভবত আগের জীবন থেকে উন্নত অথবা নিম্ন ধরনের। রাজনৈতিক, সামাজিক, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক—যে কোন কর্মক্ষেত্রে জীবনের পরিসমাপ্তিতে আমাদের সমস্ত কর্মফল হবে। সেটা অবধারিত। ভক্তিরস কিন্তু মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যায় না। তা আত্মার সঙ্গে নিত্যকাল বিরাজমান থাকে, তাই তাকে বলা হয় অমৃত—তার কখনও বিনাশ হয় না। বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে যে, এই ভক্তি-রসের পথে অল্প অগ্রসর হতে পারলেও মানব-জীবনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, পরার্থবাদ, লোকহিতৈষণা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক জীবন উপভোগ করার ফলে যে রসের স্বাদ পাওয়া যায়, তাতে পরবর্তী জীবনে যে আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করব, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই জীবনে আমরা যে রকম আচরণ করছি, সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের পরবর্তী জীবন প্রাপ্ত হব। জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ বিশেষ দেহ প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত কর্মের ফলাফল নির্ধারণ করেন দৈব। এই দৈবকে *ভগবদ্গীতায়* সব কিছুর পরম কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে *দৈবনেত্রেণ* বা পরমেশ্বরের তত্ত্বাবধানে মানুষ তার কর্মফল অনুসারে তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে দৈবের তত্ত্বাবধানে আমরা ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন দেহের মধ্যে একটি দেহ প্রাপ্ত হই। এই দেহ আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে পাই না; আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দৈব আমাদের তা দান করেন। আমাদের দেহ যদি কৃষ্ণভাবনামৃতে নিযুক্ত থাকে, তা হলে যে পরবর্তী জীবনে মনুষ্য শরীর লাভ করা যাবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত যদি এই জন্মে ভক্তিযোগে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে নাও পারেন, তা হলে পরবর্তী জন্মে তিনি উচ্চ মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করবেন এবং পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার সুযোগ পাবেন। তাই কৃষ্ণভাবনাময় সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান অমৃত বা চিরস্থায়ী। অতএব তাকে বলা হয় 'কৃষ্ণভাবনামৃত'। এই কৃষ্ণভাবনায় প্রতিটি কর্মই অমৃতময়। এটিই হচ্ছে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থ পাঠ করে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী পাঠক জীবের নিত্যবৃত্তি এই ভক্তিরস সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন। ভক্তিরস বা কৃষ্ণভাবনামৃত

গ্রহণ করার ফলে, সব রকমের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে যে মঙ্গলময় জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়, সেই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হলে মুক্তির আনন্দও নগণ্য হয়ে যায়। ভক্তিরসের প্রভাবে মুক্তি আপনা থেকেই লব্ধ হয়, কেন না তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন। সাধারণত কনিষ্ঠ অধিকারীরা ভগবানকে বা শ্রীকৃষ্ণকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা আমাদের এই জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে কখনই দেখতে পারি না। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে নির্দেশিত পন্থার মাধ্যমে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে, আমরা ধীরে ধীরে জড় স্তর অতিক্রম করে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারি, তখন আমরা সব রকম জড়-জাগতিক উপাধি থেকে মুক্ত হই। ভক্তিরসের সংস্পর্শে আসার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি কলুষমুক্ত হয়। নির্মল ইন্দ্রিয়গুলি যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আমরা ভক্তিরসে অধিষ্ঠিত হই, এবং সেই অপ্রাকৃত ভক্তিরসে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তার ফলে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করা যায়। এইভাবে ভগবৎ-ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে নিত্যকাল সমস্ত আনন্দ রস উপভোগ করা যায়। প্রাথমিক স্তরে আচার্য বা গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে বৈধীভক্তি অনুশীলনের শিক্ষা লাভ করতে হয়। ধীরে ধীরে ভক্ত যখন উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষ্ণকে সেবা করার আগ্রহ দেখা দেয়। বারোটি বিভিন্ন রকমের রস রয়েছে, যা এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হবে। তার মধ্যে পাঁচটি মুখ্য রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আমরা আমাদের সৎ, চিৎ ও আনন্দময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারি।

জীবনের একটি মৌলিক বৃত্তি হচ্ছে কাউকে না কাউকে ভালোবাসার প্রবৃত্তি। কাউকে ভাল না বেসে কেউই থাকতে পারে না। এই প্রবৃত্তিটি প্রতিটি জীবের মধ্যেই রয়েছে। এমন কি বাঘের মতো একটি হিংস্র জন্তুর মধ্যেও ওই ভালবাসার প্রবৃত্তি অত্যন্ত সুপ্তভাবে রয়েছে, এবং মানুষের মধ্যে তো অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কোথায় আমাদের এই ভালোবাসা অর্পণ করলে সকলেই সুখী হতে পারে? এখন মানব-সমাজ সকলকে শিক্ষা দিচ্ছে তাদের দেশকে ভালবাসতে অথবা আত্মীয়-স্বজনদের ভালবাসতে অথবা নিজেকে ভালবাসতে, কিন্তু কাকে ভালবাসলে যে সকলেই সুখী হয়, তা তারা জানে না। যাঁকে ভালবাসলে সকলকেই ভালবাসা হয়, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রেম বিকশিত করা যায় এবং কিভাবে আমরা নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করতে পারি।

প্রাথমিক স্তরে একটি শিশু তার পিতা-মাতাকে ভালবাসে, তারপর সে তার ভাইবোনদের ভালবাসে, এবং ক্রমান্বয়ে সে যখন বড় হতে থাকে তখন সে তার

আত্মীয়স্বজন, সমাজ, সম্প্রদায়, দেশ, জাতি, এমন কি সমস্ত মানব-সমাজকে ভালবাসতে থাকে। কিন্তু সমস্ত মানব-সমাজকে ভালবেসেও আমাদের ভালবাসার তৃপ্তি হয় না; সেই ভালবাসার প্রবৃত্তি অপূর্ণ থেকে যায়, যতক্ষণ না আমরা পরম প্রেমাস্পদকে জানতে পারি। সেই পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণে যখন আমাদের ভালবাসা অর্পিত হয়, তখনই আমরা পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে পারি। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে পাঁচটি অপ্রাকৃত রসের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা যায়।

আলোক অথবা বায়ুর তরঙ্গ যেভাবে বর্ধিত হয়, আমাদের ভালবাসার প্রবৃত্তিও সেইভাবে বর্ধিত হয়, কিন্তু আমরা জানি না কোথায় তার শেষ হয়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* হচ্ছে ভালবাসার বিজ্ঞান, যার দ্বারা কৃষ্ণকে ভালবাসার মাধ্যমে অতি সহজেই সকলকে ভালবাসা যায়। মানব-সমাজে আজ আমরা শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়েছি। রাষ্ট্রসংঘের মতো এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানও সেই কার্যে সফল হতে পারেনি, কারণ প্রকৃত পন্থাটি যে কি তা তারা জানে না। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল, তবে সুস্থ মস্তিষ্কে তা বুঝতে হবে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* প্রতিটি মানুষকেই শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে অতি স্বাভাবিকভাবে এবং সহজভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারা যায়। আমরা যদি জানতে পারি কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে হয়, তখন প্রতিটি জীবকে ভালবাসা অত্যন্ত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। এটি ঠিক একটি গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার মতো বা উদরকে খাদ্য দেওয়ার মতো। সকলেই জানে যে, গাছের গোড়ায় জল দিতে হয় এবং উদরকে খাদ্য দিতে হয়। সকলেই জানে যে, যখন আমরা কিছু খাই, অর্থাৎ যখন আমরা উদরকে খাদ্য দিই তখন সমস্ত শরীরই তৃপ্ত হয়, সমস্ত শরীরেই শক্তির সঞ্চার হয়। তেমনই, আমরা যখন গাছের গোড়ায় জল দিই, তখন গাছের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই পুষ্টিসাধন হয়, তা সে যত বড় গাছই হোক না কেন। গাছের বিভিন্ন অংশকে জল দেওয়া যায় না, অথবা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে স্বতন্ত্রভাবে খাওয়ানো যায় না। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিভাবে একটি বোতাম টিপে সর্বত্র সব কিছুকে আলোকিত করা যায়। যে তা জানে না তার জীবন ব্যর্থ।

আধুনিক মানব-সমাজ প্রভূত জড়-জাগতিক উন্নতি সাধন করেছে, জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ সুখ-শান্তি পাচ্ছে না, কারণ তারা জানে না জীবনের আসল উদ্দেশ্য কি? কেবলমাত্র জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের মাধ্যমে আমরা শান্তি পেতে পারি না। তার একটি

জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমেরিকা—পৃথিবীর সব চাইতে সম্পদশালী দেশ, সব রকমের জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা সেখানে রয়েছে, কিন্তু তবুও সেখানকার মানুষেরা সম্পূর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত এবং তাদের জীবন সম্পূর্ণ নৈরাশ্যময়। আমি এই ধরনের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা এই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে যে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান নির্দেশিত হয়েছে, তা অনুশীলন করুণ। তা হলে স্থির নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারি, যে ভব-মহাদাবাগ্নির দহনে আপনাদের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে, তা অচিরেই নির্বাপিত হবে। আমাদের অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে যে, জড়-জাগতিক দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের অন্তরে যে ভালবাসার প্রবৃত্তি রয়েছে তা যথাযথভাবে চরিতার্থ হচ্ছে না। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে, কিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে আমরা এই জড় জগতে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ করে যেতে পারি এবং তার ফলে আমাদের এই জীবনের এবং পরবর্তী জীবনের সমস্ত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে পারি। জড়-জাগতিক জীবনধারার নিন্দা করা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাজকদের, দার্শনিকদের তথা সমগ্র জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে হয়। জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করায় কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে জানতে হবে শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে ভালবাসা যায়। আধুনিক যুগে আমরা আমাদের ভালবাসার প্রবণতা চরিতার্থ করার জন্য কত রকম উপায় উদ্ভাবন করছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ভুলে গেছি। আমরা গাছের বিভিন্ন অঙ্গে জলসেচন করছি, কিন্তু গাছের গোড়াতেই জল দিতে ভুলে গেছি। আমরা নানা উপায়ে আমাদের শরীরকে সুস্থ-সবল রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু উদরকে খাদ্য দিতে ভুলে গেছি। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে থাকা মানে নিজেকেও ভুলে থাকা। যথার্থ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান এবং কৃষ্ণভাবনামৃত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দিনের বেলা আমরা যখন আমাদের দেখি, তখন সেই দেখার মধ্যে দিয়ে আমরা সূর্যকেও দর্শন করি। সূর্যরশ্মি দর্শন না করে কেউই নিজেকে দর্শন করতে পারে না। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণকে না জানলে কখনই নিজেকে জানা সম্ভব নয়।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থটি বিশেষ করে সেই সমস্ত মানুষদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। আমার যে সমস্ত বন্ধু এবং শিষ্য সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই আন্দোলনের প্রসার করার কাজে আমাকে সাহায্য করছে, তাদের আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান জয়ানন্দ ব্রহ্মচারীকে—এই বইটি

ছাপাতে যার দান ছিল অসামান্য। সেই সঙ্গে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইস্কন প্রেসের পরিচালকদের যারা অতি যত্ন সহকারে এই মহান গ্রন্থটি মুদ্রণ করেছে। হরেকৃষ্ণ —

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী

১৩ই এপ্রিল, ১৯৭০
ইসকন হেড-কোয়ার্টারস
৩৭৬৪ ওয়াটসেকা অ্যাভিনিউ
লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া

# প্রস্তাবনা

মঙ্গলাচরণ : শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সর্ব কারণের পরম কারণ এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য, হাস্য, বীর, রৌদ্র, করুণ, ভয়ানক এবং বীভৎস—এই সমস্ত রসের পরম আধার। তাঁর রূপ পরম আকর্ষক এবং সেই অপ্রাকৃত রূপের দ্বারা তিনি তারকা, পালিকা, শ্যামা, ললিতা এবং সর্বোপরি শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখ সমস্ত গোপীদের চিত্ত হরণ করেছেন। সেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা যেন আমরা লাভ করতে পারি, যাতে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থ প্রণয়নের কার্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

আমি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুপ্রেরণায় আমি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের সার সংকলনের কার্যে ব্রতী হয়েছি। আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে নবদ্বীপের শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করে গিয়েছিলেন, এই গ্রন্থটি হচ্ছে সেই ভগবদ্ভক্তি বিজ্ঞানের সাবলীল সংকলন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী এই মহান গ্রন্থের আরম্ভে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরুদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করেছেন, এবং তিনি প্রার্থনা করেছেন যে, এই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থটি যেন তাঁর নিত্য আনন্দ বিধান করে। তিনি আরও প্রার্থনা করেছেন যে, সেই অমৃতের সরোবরে অবস্থান করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী যেন নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় দিব্য আনন্দ অনুভব করতে পারেন।

সমস্ত মহান ভক্ত ও আচার্যদের চরণে আমরা আমাদের প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা হচ্ছেন অমৃতের সমুদ্রে মকরের মতো। মকর যেমন নদীকে গ্রাহ্য করে না, কৃষ্ণভক্তি-সমুদ্রের এই সমস্ত মকরেরাও তেমনই মুক্তিরূপ নদীকে গ্রাহ্য করেন না। নদী যেমন সমুদ্রে মিশে যায়, নির্বিশেষবাদীরাও তেমনই ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে ব্যস্ত। সমুদ্রকে মুক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং বিভিন্ন নদীগুলি হচ্ছে মুক্তি লাভের বিভিন্ন উপায়। নির্বিশেষবাদীরা সেই নদীর জলে বাস করে, যা এক সময় সমুদ্রে মিশে যাবে। কিন্তু তারা জানে না যে, সমুদ্রেও নদীর মতো অসংখ্য জলচর প্রাণী রয়েছে। সমুদ্রে বাস করে যে মকর, সে যেমন কখনও নদীতে প্রবেশ করতে চায় না, ভগবদ্ভক্তও তেমন

ভগবদ্ভক্তিরূপ সমুদ্র ছেড়ে মুক্তিরূপী নদীতে প্রবেশ করতে চায় না। পক্ষান্তরে বলা যায়, যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁরা সর্বদাই অপ্রাকৃত প্রেমরূপ সমুদ্রে বাস করেন এবং অন্য কোন পন্থায় তাঁদের আগ্রহ নেই, সেগুলিকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর গুরুদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কাছে প্রার্থনা করছেন, যে সমস্ত মীমাংসকেরা ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানেও তর্কের অবতারণা করার চেষ্টা করে, তাদের থেকে তিনি যেন *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে* রক্ষা করেন। তিনি এই সমস্ত যুক্তি এবং তর্ককে সমুদ্রের গর্ভস্থিত আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সমুদ্রের মধ্যে এই ধরনের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যেমন কোনও ক্ষতি করতে পারে না, তেমনই যারা ভগবদ্ভক্তির বিরোধিতা করে, ভগবানের বিরোধিতা করে, এবং পরম তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে নানা রকম কাল্পনিক মতবাদ উপস্থাপন করে, তারা ভগবদ্ভক্তিরূপী এই বিশাল সমুদ্রের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীল রূপ গোস্বামী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, তিনি কেবল সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার চেষ্টা করছেন এবং গভীর বিনয়ের বশবর্তী হয়ে তিনি মনে করছেন যে, এই কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করার যোগ্যতা তাঁর নেই। শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের মনোভাব এই রকমই হওয়া উচিত। আমাদের কখনই মনে করা উচিত নয় যে, আমরা মস্ত বড় প্রচারক হয়ে গেছি। পক্ষান্তরে আমাদের সব সময়ই মনে করা উচিত যে, আমরা পূর্বতন আচার্যদের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলেই আমরা দুর্দশাক্লিষ্ট জনগণের যথার্থ মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম হব।

সমুদ্রকে যেমন কখনও কখনও দিক অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকেও* চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এবং সেই চারটি ভাগও আবার বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় 'লহরী'। সমুদ্রে যেমন পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে ঢেউয়ের উদয় হয়, তেমনই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও* বিভিন্ন লহরী রয়েছে। প্রথম বিভাগে চারটি লহরী রয়েছে, তার প্রথমটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সাধারণ বিবরণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈধীভক্তির বিবরণ, তৃতীয়টি হচ্ছে ভাবভক্তির বিবরণ এবং চতুর্থটি হচ্ছে প্রেমভক্তির বিবরণ। বিশেষ লক্ষণ সহ সেই লহরীগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী পূর্ববর্তী আচার্যদের অনুসরণ করে ভক্তির প্রামাণিক বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন—"অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে, পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় তৎপর হওয়াই হচ্ছে উত্তম ভক্তির স্বরূপ।" এর তাৎপর্য হচ্ছে যে,

কেউ যদি প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়, তা হলে তাকে শুদ্ধ ভক্তি বলা যায় না। শুদ্ধ ভক্তি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রাকৃত অভিলাষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সকাম কর্ম এবং মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞান, উভয়ই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অভিলাষের প্রকাশ। তাই শুদ্ধ ভক্তি যেন অবশ্যই জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত হয়। সাধারণত মানুষ কোন কিছু লাভের আশায় নানা রকম কর্মে লিপ্ত হয় এবং মনোধর্মী জ্ঞানী ও দার্শনিকেরা জল্পনা-কল্পনা ও শব্দ-বিন্যাসের মাধ্যমে বড় বড় সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করে জনসাধারণকে চিন্ময় জ্ঞান দান করার অভিনয় করে। শুদ্ধ ভক্তি অবশ্যই এই সমস্ত সকাম কর্ম এবং মনোধর্মপ্রসূত দার্শনিক জ্ঞান থেকে মুক্ত। কৃষ্ণভাবনামৃত বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে।

এই ভক্তি এক রকমের অনুশীলন, অর্থাৎ এক রকম সক্রিয় সেবা। এটি অলস মানুষদের বা মৌন ধ্যানীর নিষ্ক্রিয়তা নয়। বিভিন্ন মানুষদের প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন রকমের পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন তা থেকে ভিন্ন। অনুশীলন মানেই সক্রিয়তা। সক্রিয় না হলে কেবল মনে মনে চিন্তা করলে কাজ হয় না। সব রকমের কার্য দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—সেগুলি হচ্ছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। নিবৃত্তির অনেক উদাহরণ আছে। যেমন একজন রোগীকে খুব সাবধানে ওষুধ খেতে হয়, যার ফলে রোগরূপী প্রতিকূলতা দূর হয়ে যায়।

যাঁরা পারমার্থিক জীবন যাপন করেছেন এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছেন তাঁরা সর্বদাই সক্রিয়। এই ধরনের কার্যকলাপ শরীর অথবা মনের দ্বারা সাধিত হতে পারে। চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছা—এগুলি হচ্ছে ক্রিয়া। কোন কিছু করার সংকল্প করার পর স্থূল শারীরিক অঙ্গে সেই ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়। সেই জন্য আমাদের মানসিক ক্রিয়া দ্বারা সব সময় চিন্তা করার চেষ্টা করা উচিত, কিভাবে পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা যায়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বাণী দ্বারাও কর্ম সাধিত হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্ত তাঁর বাণী দিয়ে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন। তাকে বলা হয় কীর্তন। এই হচ্ছে বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অনুশীলন। কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্ত তাঁর বাণী দিয়ে ভগবানের গুণকীর্তন করেন। তাঁর মন দিয়ে তিনি সর্বদাই ভগবানের লীলা স্মরণ করেন—কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তিনি যেভাবে অর্জুনকে *ভগবদ্গীতা* শুনিয়েছিলেন বা বৃন্দাবনে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে তিনি যেভাবে লীলাবিলাস করেছিলেন। এইভাবে সর্বদাই ভগবানের কার্যকলাপ ও লীলাবিলাস স্মরণ করা যায়। এটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের মানসিক অনুশীলন।

এইভাবে আমরা আমাদের দেহ দিয়েও অনেক রকমের সেবা করতে পারি। কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ অবশ্যই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় হওয়া উচিত। এই সম্পর্কের

প্রতিষ্ঠা হয় গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। তাই দেহ দিয়ে কৃষ্ণভক্তির যে অনুশীলন, তা গুরুদেবের মাধ্যমে দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। গুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াকে বলা হয় দীক্ষা। সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত হওয়ার দিন থেকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনে রত ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত না হলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যথাযথভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায় না।

এই কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন প্রাকৃত নয়। ভগবানের শক্তি সাধারণত তিনভাবে প্রকাশিত হয়—যথাক্রমে বহিরঙ্গা শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি। জীবকে বলা হয় তটস্থা শক্তি, জগৎ হচ্ছে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি অথবা অপরা প্রকৃতি, এবং চিন্ময় জগৎ হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। জীব যখন নিকৃষ্ট বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত থাকে তখন তাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়, তখন সে প্রাকৃত কর্মে প্রবৃত্তি হয়। জীব যখন অন্তরঙ্গা পরা প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল থাকে, তখন সে কৃষ্ণভাবনাময় হয়। অর্থাৎ যাঁরা মহাত্মা বা মহাভাগবত, তাঁরা কখনও বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করেন না, তাঁরা সর্বদাই পরা প্রকৃতির আশ্রয়ে কর্ম করেন। ভক্তিযোগ অথবা কৃষ্ণভাবনামৃতে যাই করা হয় না কেন, তা সরাসরিভাবে পরা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, আমাদের শক্তি হচ্ছে কর্ম করার ক্ষমতা এবং এই কর্মক্ষমতাকে সদ্‌গুরু ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে চিন্ময় বা অপ্রাকৃত স্তরে রূপান্তরিত করা যায়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে, মহা-ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসেন। যাঁরা পারমার্থিক জীবনে যথার্থ আগ্রহী শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সদ্বুদ্ধি দান করেন, যার প্রভাবে তাঁরা সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসতে পারেন, এবং তারপর সদ্‌গুরুর কৃপার প্রভাবে তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের পথে অগ্রসর হন। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির সমস্ত কার্যকলাপ পরা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, তা সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীগুরুদেবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জড় জগতের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। কৃষ্ণ বলতে আমরা পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর অসংখ্য অবতারদের বোঝাই। তিনি তাঁর বিভিন্ন অংশরূপে ও তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই সব; শ্রীকৃষ্ণতে সব কিছুরই সমাবেশ। তবে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ বলতে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অংশ-অবতারদের বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, আদি বহু অবতার এবং অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তিতে প্রকাশিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, তাঁরা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো

অসংখ্য। সুতরাং সেই কৃষ্ণতত্ত্বে এই সমস্ত অংশ এবং শুদ্ধ ভক্তদের সমাবেশ রয়েছে *ব্রহ্ম-সংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সকল অংশ-অবতারেরা পূর্ণ আনন্দময়, চিন্ময় ও নিত্য।

কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ উৎপাদনের অনুকূল সমস্ত কার্য স্বীকার করা এবং যে সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের অনুকূল নয়, তাদের ভগবদ্ভক্তি বলে গ্রহণ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, রাবণ, কংস ও হিরণ্যকশিপু আদি সমস্ত রাক্ষস ও দানবেরা সর্বদাই কৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, কিন্তু তারা বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবত। এই ধরনের মনোভাবকে কৃষ্ণভক্তি বলে স্বীকার করা হয় না।

মায়াবাদীরা কখনও কখনও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর লীলা ও উপচার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। যেমন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতা* শুনিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য থাকলেও কুরুক্ষেত্রের কোন মাহাত্ম্য নেই। কিন্তু ভক্তরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে থাকেন যে, যেহেতু কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান *ভগবদ্গীতা* শুনিয়েছিলেন, তাই কুরুক্ষেত্র মহিমান্বিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁরা এটিও জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বলতে কেবল একলা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায় না। তিনি সর্বদাই তাঁর পরিকর ও পার্ষদ পরিবৃত থাকেন। যেমন, কেউ যখন বলে, "অস্ত্রধারী মানুষটিকে কিছু খেতে দাও।" খাবার মানুষটিই খেয়ে থাকে, অস্ত্রশস্ত্র নয়। তেমনই, কৃষ্ণভাবনামৃতেও ভগবানের লীলার উপকরণ ও স্থান সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদর্শন করতে পারেন। ভগবানের লীলাভূমি বলে তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের প্রতি আসক্ত, কিন্তু তা বলে তিনি যে কোনও রণক্ষেত্রের প্রতি আসক্ত নন। তাঁর আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে, তাঁর বাণীতে, তাঁর উপদেশ ইত্যাদিতে। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই সেই রণক্ষেত্রের মাহাত্ম্য।

এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের সারমর্মের উপলব্ধি। এটি না জানলে ভক্তরা যে কোন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের প্রতি তাঁদের গভীর আসক্তি প্রকাশ করে থাকেন, তা বোঝা সম্ভব হবে না। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন, তাঁরা তাঁর বিভিন্ন লীলাবিলাস ও কার্যকলাপের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারেন না।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামীর বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে—তিনি সর্বদাই অপ্রতিহতভাবে ও অনুকূলভাবে ভগবানের সেবা করেন। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের পবিত্রতা বজায় রাখতে হলে, তাঁকে জড় কর্ম এবং মনোধর্ম-প্রসূত দার্শনিক জ্ঞান থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত সমস্ত বাসনাই জড় বাসনা, এবং মনোধর্ম-প্রসূত দার্শনিক জ্ঞান

অবশেষে নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদে পর্যবসিত হয়। এই সমস্ত পন্থাগুলি কৃষ্ণভক্তের কাছে সর্বতোভাবে অর্থহীন। বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করাই যে পরম পুরুষার্থ, দার্শনিক জ্ঞানের প্রভাবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। সেই কথা ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে। দার্শনিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ, কেন না তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস, তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সকলেরই তাঁর শরণাগত হওয়া উচিত। এই চরম লক্ষ্যে যদি পৌঁছানো যায়, তা হলেই দার্শনিক জ্ঞানের অনুশীলন অনুকূল হয়। কিন্তু তা না হয়ে যদি নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তা হলে তা ভক্তি নয়।

কর্ম বলতে সাধারণত বৈদিক কর্মকাণ্ডের নির্দিষ্ট কার্যকলাপকে বোঝানো হয়। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। কিন্তু কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত কর্মের পরম ভোক্তা বলে না জেনে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত হয়, তা হলে তার সেই সমস্ত কার্যকলাপ কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। কৃষ্ণভক্তি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভক্তি সাধনের নয়টি পন্থা বর্ণিত হয়েছে, তা ছাড়া আর সবই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। এইভাবে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে জড়-জাগতের অজ্ঞান-অন্ধকারে অধঃপতিত হওয়ার থেকে নিজেকে সর্বদাই রক্ষা করা।

শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে *জ্ঞান-কর্মাদি* শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এই *কর্মাদি* (সকাম) বলতে সেই সমস্ত কর্মকে বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। তথাকথিত নানা রকম ত্যাগের পন্থাও কৃষ্ণভক্তির অনুকূল নয়।

ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী *নারদ-পঞ্চরাত্র* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—"কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়ার ফলে সব রকম উপাধি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং তখনই হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়। এই অবস্থায় জীব তার শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করতে পারে।" অতএব ইন্দ্রিয়গুলি যখন তাদের যথার্থ স্বামীর সেবায় তৎপর হয়, তখন তাকে বলা হয় ভক্তি। বদ্ধ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি শরীরের সমস্ত চাহিদা মেটাবার কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যখন সেই ইন্দ্রিয়গুলি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়, তখন তাকে বলা হয় ভক্তি।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে কোন পরিবারের বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে. মনে করে শরীরকে আত্মবুদ্ধি করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে উপাধিযুক্ত থাকে। কিন্তু যখন সে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে কোনও পরিবার, সমাজ অথবা দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তার নিত্য সম্পর্ক হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, তখন সে

অনুভব করতে পারে যে, তথাকথিত পরিবার, বা রাষ্ট্রের স্বার্থে তার শক্তির অপচয় না করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত। এটিই হচ্ছে জীবনের যথার্থ প্রয়োজন এবং এরই নাম কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্তিযোগ।

# প্রথম খণ্ড

## প্রথম অধ্যায়

# শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২৯/১২-১৩) ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার সময় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন — "হে মাতঃ, যাঁরা আমার শুদ্ধ ভক্ত, এবং যাঁদের পার্থিব কোন লাভের বাসনা অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের প্রতি কোন আসক্তি নেই, তাঁদের চিত্ত সর্বদাই আমার সেবায় এত গভীরভাবে মগ্ন যে, তাঁরা আমার কাছ থেকে আমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না। এমন কি, তাঁরা আমার ধামে আমার সঙ্গে বাস করার সৌভাগ্য পর্যন্ত কামনা করেন না।"

মুক্তি পাঁচ রকমের, যথা — সাযুজ্য বা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, সালোক্য বা ভগবানের লোকে বাস করা, সারূপ্য বা ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হওয়া, সামীপ্য বা ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করা এবং সার্ষ্টি বা ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া। ভগবদ্ভক্ত পার্থিব সুখভোগের কথা দূরে থাকুক, এই পাঁচটি মুক্তির কোনটিই কামনা করেন না। প্রীতি সহকারে ভগবানের সেবা করেই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* কপিলদেবের এই উক্তিতে শুদ্ধ ভক্তের যথার্থ মনোভাব বর্ণিত হয়েছে, এবং ভক্তির সামান্য লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী শাস্ত্র-প্রমাণের মাধ্যমে ভক্তির বিভিন্ন লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শুদ্ধ ভক্তির ছয়টি লক্ষণ আছে —

১। শুদ্ধ ভক্তি *ক্লেশঘ্নী*, অর্থাৎ সব রকম প্রাকৃতিক ক্লেশ তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি করে।

২। শুদ্ধ ভক্তি *শুভদা*, অর্থাৎ সর্বতোভাবে মঙ্গলময়।

৩। শুদ্ধ ভক্তি *সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা*, অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি দিব্য আনন্দ প্রদান করে।

৪। শুদ্ধ ভক্তি *সুদুর্লভা*, অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ।

৫। শুদ্ধ ভক্তি *মোক্ষলঘুতাকৃৎ*, অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি মোক্ষকেও তুচ্ছ করে দেয়।

৬। শুদ্ধ ভক্তি *শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী*, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করার একমাত্র উপায়।

শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি তাঁকেও আকর্ষণ করে। অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বলবতী, কারণ তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি।

## ক্লেশঘ্নী (শুদ্ধ ভক্তি ক্লেশ নিবারণ করে)

*ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে তিনি এই প্রতিজ্ঞাও করেছেন যে, এই ধরনের সমর্পিত আত্মাদের তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, এই জন্মের পাপ ও পূর্বকৃত পাপ—দুই-ই ক্লেশের কারণ। সাধারণত পাপকর্ম অবিদ্যার ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু অবিদ্যার অজুহাত দেখিয়ে পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। পাপের ফল দুই রকমের—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ। যে পাপকর্মের ফল আমরা বর্তমানে ভোগ করছি তা প্রারব্ধ। যা এখনও ভোগ হয়নি, সেই সঞ্চিত পাপকর্মকে অপ্রারব্ধ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন কোন দুর্বৃত্ত অনেক অপরাধ করা সত্ত্বেও এখনও ধরা পড়েনি, কিন্তু যখনই সে ধরা পড়বে, তখনই তাকে কারাগারে দণ্ড দেওয়া হবে। এইভাবে আমাদের অপ্রারব্ধ পাপের ফল আমরা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হব, আর আমাদের প্রারব্ধ পাপকর্মের ফল এখন আমরা ভোগ করছি।

এইভাবে পাপকর্ম ও তার পরিণামরূপী ক্লেশ ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। এইভাবে বদ্ধ জীব এই সমস্ত পাপের ফলে জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখভোগ করে থাকে। বর্তমানে পূর্বকৃত পাপের ফল ভোগ করতে করতে সে পরবর্তী জীবনের দুঃখরূপী নতুন বীজ বপন করতে থাকে। ভীষণ রোগ, আইন সংক্রান্ত অভিযোগ, নীচকুলে জন্ম অথবা বিদ্যা বা রূপের অভাব—এই সমস্ত প্রারব্ধ পাপকর্মের লক্ষণ।

পূর্বকৃত পাপের অনেক ফল আমরা বর্তমানে ভোগ করছি এবং বর্তমানে যে সমস্ত পাপ আমরা করছি, তার ক্লেশ আমাদের ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হই, তা হলে এই সমস্ত পাপকর্মের ফল অবিলম্বে নিবারিত হতে পারে। তার প্রমাণস্বরূপ শ্রীল রূপ গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* একাদশ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের ঊনবিংশতি শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধবকে উপদেশ প্রদানকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "হে উদ্ধব, আমার প্রতি ভক্তি প্রজ্বলিত অগ্নির মতো, যা ইন্ধনরূপী অপার পাপরাশি ভস্ম করতে পারে।" অর্থাৎ, প্রচণ্ড অগ্নি যেমন যে কোনও পরিমাণ ইন্ধনকে ভস্মীভূত করতে পারে, তেমনই কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি পাপকর্মরূপী সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মীভূত করতে পারে।

যেমন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধ করাটা পাপকর্ম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সেই যুদ্ধে নিযুক্ত হতে আদেশ দিলেন, এবং তার ফলে তাঁর কাছে সেই যুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে পর্যবসিত হল। তাই অর্জুনকে কোন পাপের ফল ভোগ করতে হল না।

শ্রীল রূপ গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৩/৩৩/৬) শ্লোক উল্লেখ করেছেন, যেখানে দেবহূতি তাঁর পুত্র কপিলদেবকে বলেছেন, "প্রভু! শ্রবণ, কীর্তন আদি ভক্তিযোগের নয়টি সাধনাঙ্গ রয়েছে। যদি কেউ আপনার লীলাশ্রবণ, যশকীর্তন, বন্দন, ভক্তিভরে আপনাকে প্রণাম, আপনাকে স্মরণ আদি নবধা ভক্তির যে কোনও একটি অঙ্গ অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি যদি চণ্ডালকুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবুও ভক্তিযোগের প্রভাবে তিনি সর্বতোভাবে পবিত্র হতে পারেন।" অর্থাৎ যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যথার্থ ভক্তি অনুশীলনে তৎপর হয়েছেন, তিনি সর্বতোভাবে কলুষমুক্ত না হয়ে পারেন না। কৃষ্ণভাবনা বা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ পুরুষ অবশ্যই সব রকম পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছেন। বস্তুত, ভক্তিযোগের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করার শক্তি রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্ত নিরন্তর সচেতন থাকেন যাতে আর কোনও পাপ না হয়; এটিই হচ্ছে ভক্তের বৈশিষ্ট্য। এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্ণয় করা হয়েছে যে, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় তৎপর হলে, চণ্ডাল কুলোদ্ভূত মানুষও বৈদিক যজ্ঞ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে, চণ্ডাল কুলোদ্ভূত মানুষের সাধারণত যজ্ঞ করার অধিকার থাকে না। বৈদিক যজ্ঞ করার অধিকার ব্রাহ্মণদেরই আছে; অতএব ব্রাহ্মণ না হলে কেউই এই কর্ম করতে পারে না।

পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে মানুষ ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করে। যিনি চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি অবশ্যই পূর্বজন্মে অসংখ্য পাপ করেছেন। কিন্তু তিনি যদি ভক্তিমার্গ অঙ্গীকার করে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ আদি কর্ম করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাঁর সমস্ত পাপ-কর্মফল তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়।

*পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, পাপকর্মের ফল চার রকমের হয় — ১) *অপ্রারব্ধ*, ২) *কূট*, ৩) *বীজ* এবং ৪) *ফলোন্মুখ*। সেখানে এও বলা হয়েছে যে, কেউ যখন ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হয়ে পূর্ণরূপে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় তৎপর হন, তখন তাঁর এই চার রকমের পাপফল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়।

যে পাপের ফল ভোগ হতে চলেছে, তাকে বলা হয় *ফলোন্মুখ*। হৃদয়ে বীজরূপে যে পাপের ফল রয়েছে, তাকে বলা হয় *বীজ*। বীজের উন্মুখতার

কারণকে বলা হয় *কূট* এবং যে পাপের ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি, তাকে বলা হয় *অপ্রারব্ধ*। *পদ্ম-পুরাণের* এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, জড় কলুষ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এর সূচনা, ফলন, পরিণাম এবং দুঃখরূপে তার ফলভোগ—এই সবই একটি বিশাল শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। কারও যখন রোগ হয়, সাধারণত সেই রোগের কারণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তার শুরু কোথায় এবং কিভাবে তা বর্ধিত হচ্ছে, তা বোঝা খুবই দুষ্কর। কিন্তু রোগের ক্লেশ অকস্মাৎ প্রকাশ হয় না, তার সময় লাগে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক যেমন সাবধানতা অবলম্বন করে রোগের প্রতিকারের জন্য টীকা দেন, তেমনই সব রকমের পাপবীজকে অঙ্কুরিত হওয়া থেকে নিরোধ করার জন্য পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করা অত্যন্ত আবশ্যক।

এই সম্পর্কে শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/২/১৭) অজামিল উপাখ্যানে উল্লেখ করেছেন। অজামিল প্রথম জীবনে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু যৌবনে বেশ্যার সঙ্গ করার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর পাপময় জীবনের অন্তিম সময়ে 'নারায়ণের' নাম উচ্চারণ করার ফলে, তিনি তাঁর সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার পান। শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, তপস্যা, দান, ব্রত ইত্যাদির প্রভাবে পাপের নাশ হয়, কিন্তু হৃদয়ের পাপবীজের নাশ হয় না, যা অজামিলের যৌবনে হয়েছিল। এই পাপবীজের নাশ একমাত্র কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়ার ফলেই হতে পারে, এবং তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে মহামন্ত্র বা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার প্রভাবে অতি সহজেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তির পথ অবলম্বন না করলে, সমস্ত পাপ থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায় না।

বেদবিহিত কর্ম দান, তপস্যা ইত্যাদির দ্বারা মানুষ কিছু সময়ের জন্য পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তার পরেই আবার সে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অতিরিক্তভাবে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করার ফলে যৌন রোগাক্রান্ত পুরুষ যখন ভীষণ কষ্ট পায়, তখন সে সাময়িকভাবে স্ত্রীসঙ্গ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু যেহেতু তার হৃদয় থেকে স্ত্রীসঙ্গ করার বাসনা দূর হয়নি, তাই রোগ নিরাময়ের পরে সে আবার অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে আবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং চিকিৎসার প্রভাবে সাময়িকভাবে এই যৌনব্যাধির নিরাময় হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বুঝতে পারছে যে, যৌনজীবন অত্যন্ত জঘন্য, ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। তেমনই, বৈদিক কর্ম, দান, তপস্যা ইত্যাদির ফলে সাময়িকভাবে পাপকর্মের নিবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হচ্ছে, ততক্ষণ মানুষ বারবার পাপকর্মে লিপ্ত না হয়ে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই সম্বন্ধে হস্তীস্নানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। হাতি সরোবরে খুব ভালভাবে স্নান করে। কিন্তু জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে এসে সে আবার তার সারা গায়ে ধূলি ছড়িয়ে দেয়। এই উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার শিক্ষা যে পায়নি, সে পাপকর্মের বাসনা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না। কর্ম, জ্ঞান বা যোগের দ্বারা পাপকর্মের বাসনা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই তা সম্ভব হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২২/৩৯) আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে সনৎকুমার বলছেন, "হে রাজন্, মানুষের মিথ্যা অহঙ্কার এতই প্রবল যে, তা রজ্জুর মতো মানুষকে ভববন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। ভক্তরাই কেবল ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, এই বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হতে পারেন। যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়ে যোগী বা সকাম কর্মী হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা কখনই ভগবদ্ভক্তের মতো কর্মবন্ধন মোচন করতে পারেন না। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে অহঙ্কার ও প্রাকৃত কর্মের দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়া।"

মিথ্যা অহঙ্কারের এই দৃঢ় গ্রন্থি অজ্ঞানতা-প্রসূত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, ততক্ষণ সে অবশ্যই অনুচিত কর্মে প্রবৃত্ত হবে এবং প্রাকৃত বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাব কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে দূরীভূত হতে পারে, যা *পদ্ম-পুরাণে* প্রমাণিত হয়েছে—"কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে পরম উজ্জ্বল জ্ঞানবর্তিকা, যা বাসনারূপে অমঙ্গলকারী সর্পদের জন্য দাবানল-স্বরূপ।" বনে যখন দাবানল জ্বলে ওঠে, তখন সেই আগুনে সমস্ত সাপ দগ্ধ হয়। অন্যান্য পশুরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাপেরা কোন মতেই নিস্তার পায় না, তারা সেই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সেই রকম, কৃষ্ণভাবনারূপী প্রজ্বলিত অগ্নি এতই প্রবল যে, তার প্রভাবে অবিদ্যারূপ সর্প অচিরেই ভস্মীভূত হয়ে যায়।

## কৃষ্ণভাবনা সর্ব মঙ্গলময়

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ মঙ্গলময় কথাটির একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যথার্থ মঙ্গল সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করে। আজকাল কিছু মানুষকে সমাজ, জাতি, বা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে তৎপর হতে দেখা যায়। যেমন রাষ্ট্রসংঘ (United Nations)-এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের হিতসাধন করার একটি প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। কিন্তু

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এমনই সর্বাঙ্গসুন্দর যে, তা সমগ্র মানব-সমাজের পরম উপকার সাধন করে। সকলেই এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, এবং তার সুফল অনুভব করতে পারে। তাই, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ মহাজনেরা এই বিষয়ে একমত যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা সমস্ত জগতে ভক্তিযোগের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার করাই হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম পরোপকার।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমগ্র বিশ্বকে আকৃষ্ট করতে পারে, এবং সমস্ত মানুষই এই কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করতে পারে। এই সম্বন্ধে পদ্ম-পুরাণে বলা হয়েছে — "যে মানুষ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সাধনে তৎপর হয়েছেন, তিনি সমস্ত জগতের সর্বোত্তম সেবা করতে করতে সমস্ত জীবের পরম কল্যাণ সাধন করেন। তিনি কেবল মানব-সমাজেরই নয়, গাছপালা, পশু-পাখিদেরও কল্যাণ সাধন করেন, কারণ তারাও এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবানের কৃপা লাভ করে।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করার জন্য মধ্য-ভারতের ঝারিখণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন। সেই বনের বাঘ, হাতি, হরিণাদি সমস্ত বন্যজন্তুরা তাঁর সঙ্গে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে করতে নৃত্য করেছিল।

কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবায় যিনি যুক্ত হয়েছেন, তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত গুণাবলী বিকশিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, "হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁরা অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যাঁরা নিষ্কপট, তাঁরা সমস্ত দৈবী গুণাবলী অর্জন করতে পারেন। ভক্তের বিকশিত কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে তাঁর মধ্যে সমস্ত দৈবী গুণাবলীর বিকাশ হয়, এবং সেই জন্য স্বর্গের দেবতারাও তাঁর সঙ্গলাভ করতে চান।"

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত নয়, তাদের মধ্যে কোনই সদ্‌গুণ দেখা যায় না। জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তারা মস্ত বড় বিদ্বান হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, তাদের কার্যকলাপ পশুদের থেকেও অধম। জড় বিদ্যায় মানুষ যতই পণ্ডিত হোক না কেন, সে তার মানসিক স্তরের উর্ধ্বে যেতে পারে না, তাই তার সমস্ত কার্যকলাপই জড়-জাগতিক স্তরে অনুষ্ঠিত হয়, এবং তার ফলে সে চিরকাল পাপ-পঙ্কিলময় হয়ে থাকে। আধুনিক জগতে এমন অনেক মানব আছে, যারা জড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে, কিন্তু দেখা যায় যে, তারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তার ফলে তারা সমস্ত দৈবী গুণাবলীর বিকাশ করতে পারেনি।

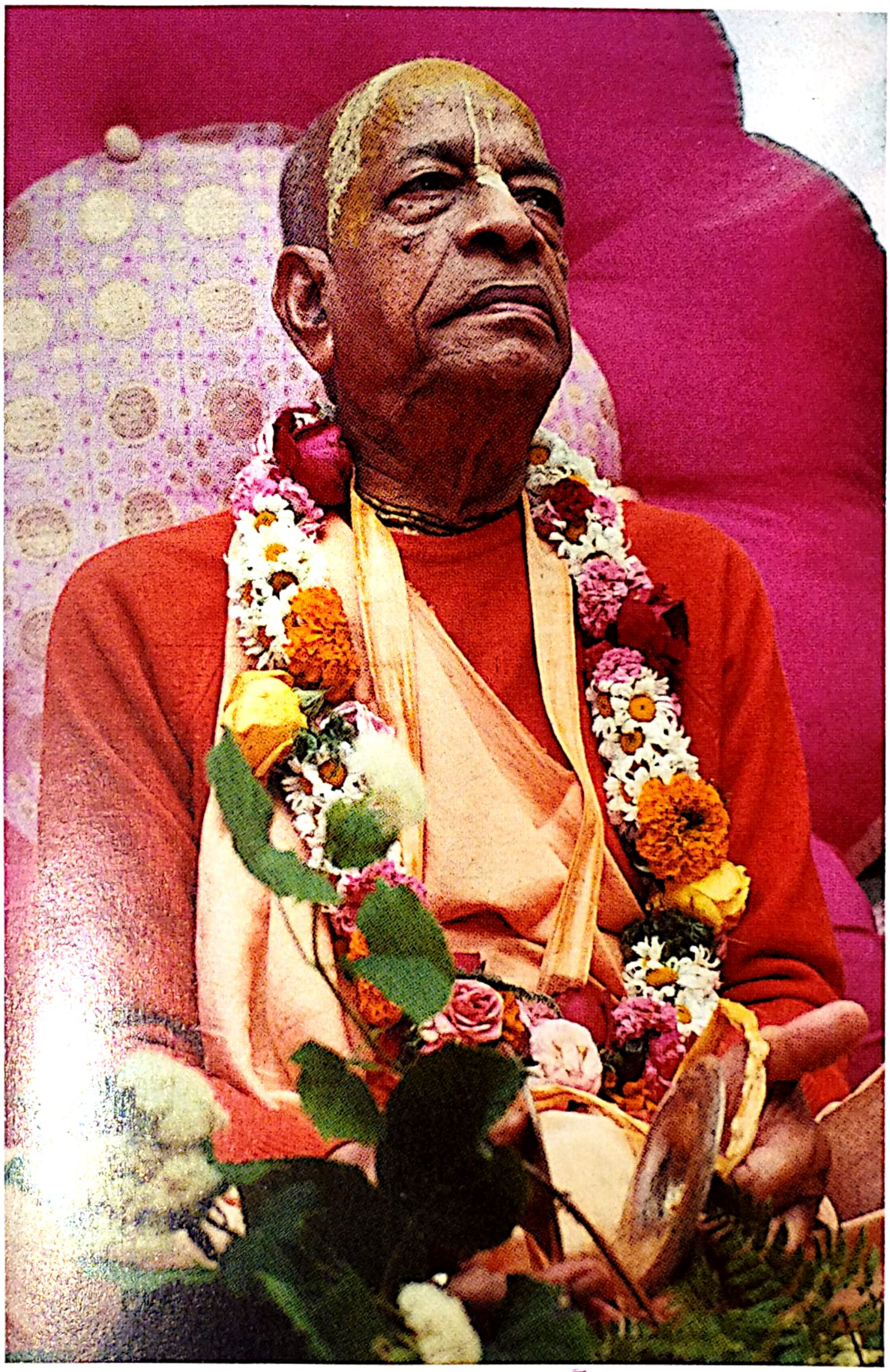
জড় বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষিত না হলেও কৃষ্ণভাবনাময় ভাবিত যুবক পরস্ত্রী গমন, দ্যূতক্রীড়া, মাংসাহার ও মদ্যপান—এই সমস্ত পাপকর্ম থেকে অনায়াসে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু যারা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত নয়, তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই মদ্যপায়ী, মাংসাহারী, লম্পট ও জুয়াড়ী হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মানুষদের মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণের চরম বিকাশ হয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনা-বিহীন মানুষদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাওয়া যায় না, এটিই হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমরা দেখেছি, কৃষ্ণভাবনাময় ভাবিত যুবকেরা চলচ্চিত্র, নাইটক্লাব, নগ্ন নৃত্য, হোটেল, মদ্যশালা ইত্যাদির প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। তাঁরা এই সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত হন এবং ধূম্রপান, মদ্যপান, থিয়েটার, নৃত্য ইত্যাদিতে তাঁদের দুর্মূল্য সময়ের অপব্যবহার করেন না।

যে মানুষ কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, সে এক জায়গায় আধঘণ্টার জন্যও স্থির চিত্তে বসে থাকতে পারে না। আজকাল তথাকথিত সমস্ত যোগপদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছে যে, চুপচাপ বসে থাকলেই উপলব্ধি করা যাবে 'আমি ভগবান'। এই পদ্ধতি বিষয়ী মানুষদের কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হতে পারে, কিন্তু এটিও বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, কতক্ষণ তারা এইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে পারবে? কৃত্রিমভাবে তারা এই তথাকথিত ধ্যানে বসতে পারে, কিন্তু এই যোগ অভ্যাসের পরেই তারা আবার পরস্ত্রী গমন, মদ্যপান, দূতক্রীড়া, মাংসাহার ইত্যাদি পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্ত এই কপট ধ্যান না করে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগামী হন। কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হওয়ার ফলে তিনি অনায়াসে এই সমস্ত পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সমস্ত সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত হন। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে সর্বোচ্চ চরিত্র বিকশিত হয়। এর সিদ্ধান্তে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হলে কেউই যথার্থ সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না।

## কৃষ্ণভাবনামৃতের আনন্দ

শ্রীল রূপ গোস্বামী আনন্দের বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। আনন্দকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—১) জড় সুখভোগের আনন্দ, (২) পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করার আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ এবং (৩) কৃষ্ণভাবনামৃতের আনন্দ।

*তন্ত্রশাস্ত্রে* শিব তাঁর স্ত্রী সতীকে বলেছেন—"প্রিয়ে, যিনি ভগবান গোবিন্দের চরণে শরণাগত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ করেছেন, তিনি নির্বিশেষবাদীদের অভিলষিত সমস্ত সিদ্ধি অনায়াসে প্রাপ্ত হতে পারেন; এবং তারও ঊর্ধ্বে শুদ্ধ ভক্তির পরমানন্দ তিনি আস্বাদন করতে পারেন।"



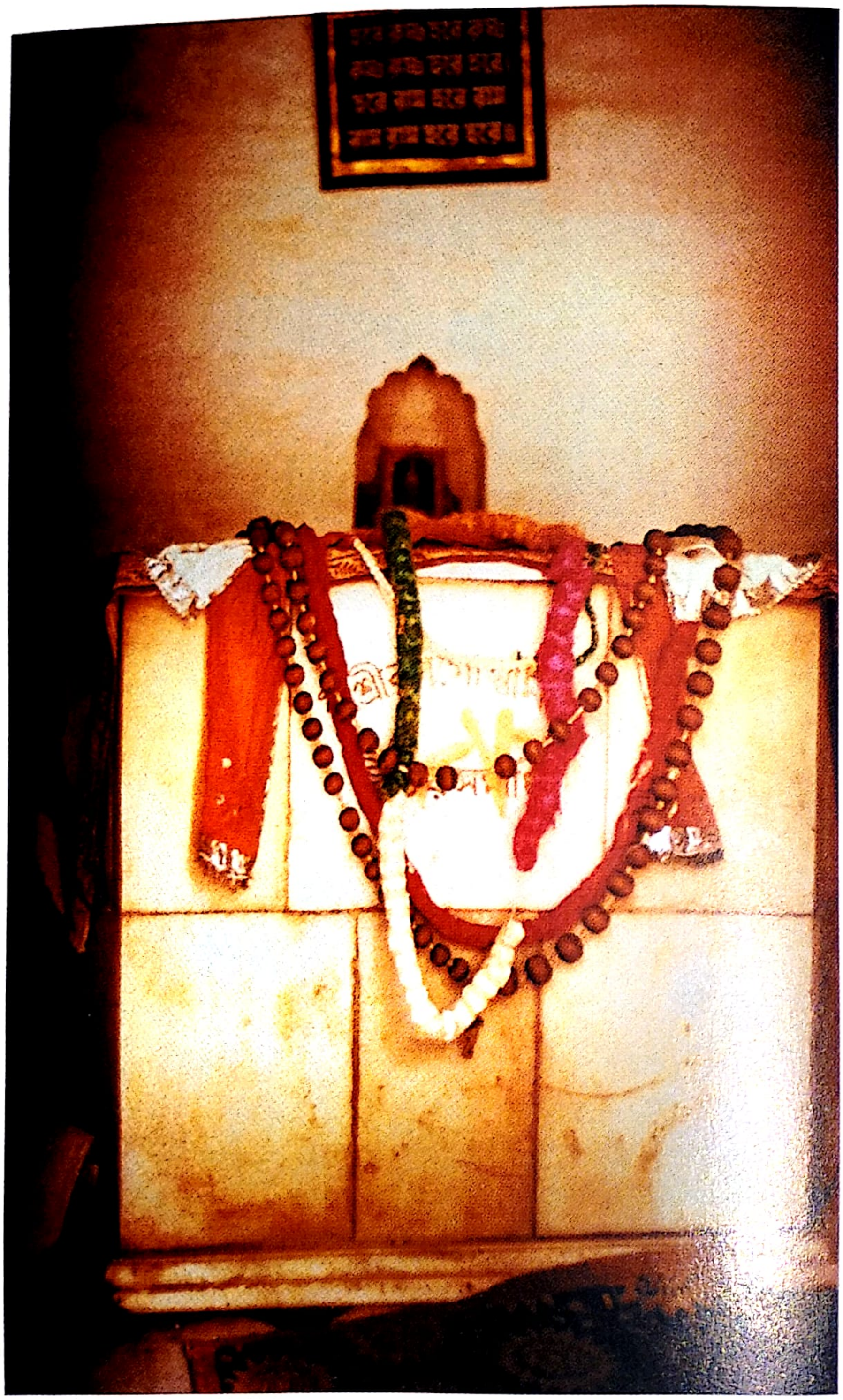
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য



শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী অনেক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন, যার ভিত্তিতে তাঁরা ভক্তিযোগের উপর অনেক সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং বৃন্দাবনের মধ্যে লুপ্ত অনেক তীর্থস্থানের উদ্ধার করেছেন।



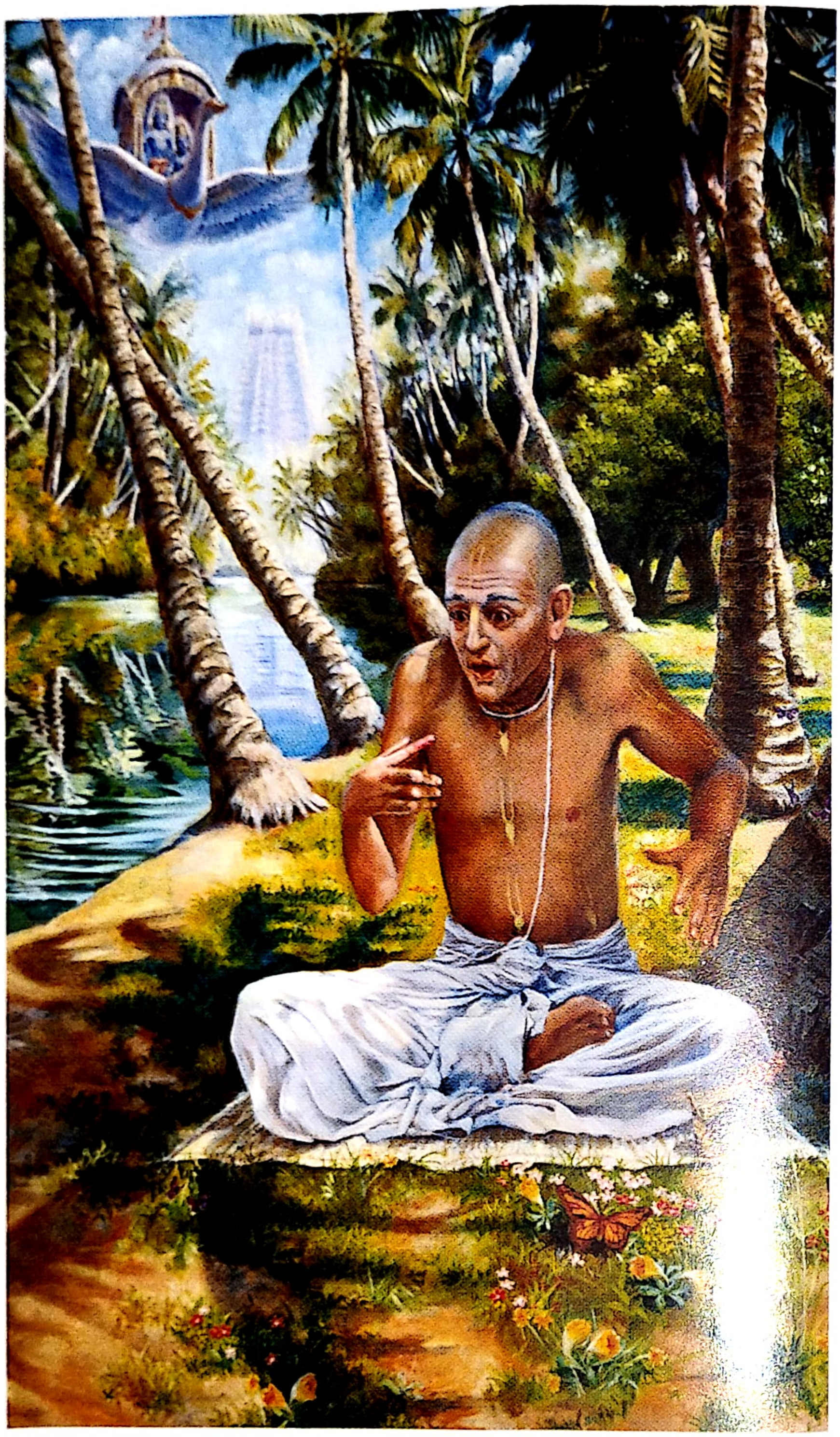
এটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর সমাধি মন্দির। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ভক্তি-বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক দিব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।



শ্রীল রূপ গোস্বামীর সমাধি-স্তম্ভ। সমাধি-বেদীর উপর তাঁর নিজেরই জপমালা বা মন্ত্র জপের মালাটি রয়েছে, যেটি ভগবানের দিব্য নামের জপ করার ফলে মহিমান্বিত হয়েছে।



শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচশ বছর পূর্বে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে আবির্ভূত হন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তন সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার উদ্দেশ্যে।



"ধ্যানমগ্নরত অবস্থায় সাধুটির একটি আঙুল পুড়ে গিয়েছিল।" এটিই সূচিত করে কৃষ্ণভাবনামৃতের যথার্থ ভাব। যথার্থ ধ্যান অনুশীলনের মধ্য দিয়েই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়।



"এই গোপবালকেরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়ারত, যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে একই স্তরে অধিষ্ঠিত!" ভক্তিযোগের বিজ্ঞান (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি) অনুশীলনের মাধ্যমে চিন্ময় জগতে স্থিত হওয়ার যথার্থ পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়, এবং সেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করা যায়।



মাতা যশোদা বাৎসল্য প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করেছিলেন।



কৃষ্ণের ছোট সখারা তাঁর পোশাক পরিধানে মাতা যশোদাকে সহায়তা করছেন। চিজ্জগৎ পরমেশ্বরের প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবকদের তাঁর প্রতি যে ভালবাসা এবং ভক্তির প্রগাঢ়তা রয়েছে, তা পরিমাপের কোন পন্থা নেই।



একটি বৃষের রূপ ধারণ করে বৃষাসুর যখন বৃন্দাবনে এসেছিল, তখন গোপিকারা অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। এইভাবে বিচলিত হয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি সমন্বিত তমাল বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরেন। এটি হিংস্র পশুর ভয়ে উৎপন্ন ত্রাস, এবং তার ফলে আশ্রয়ের অন্বেষণে কৃষ্ণস্মৃতিজনিত প্রেম।



শ্রীমতী রাধারাণীর তথাকথিত পতি অভিমন্যুর বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ খেলাচ্ছলে নিজেকে গোপন করেছিলেন। গোপীদের প্রেমের বশবর্তী হয়ে তাঁদের আনন্দ বর্ধনের জন্য তিনি বহুবিধ লীলা করেছেন।



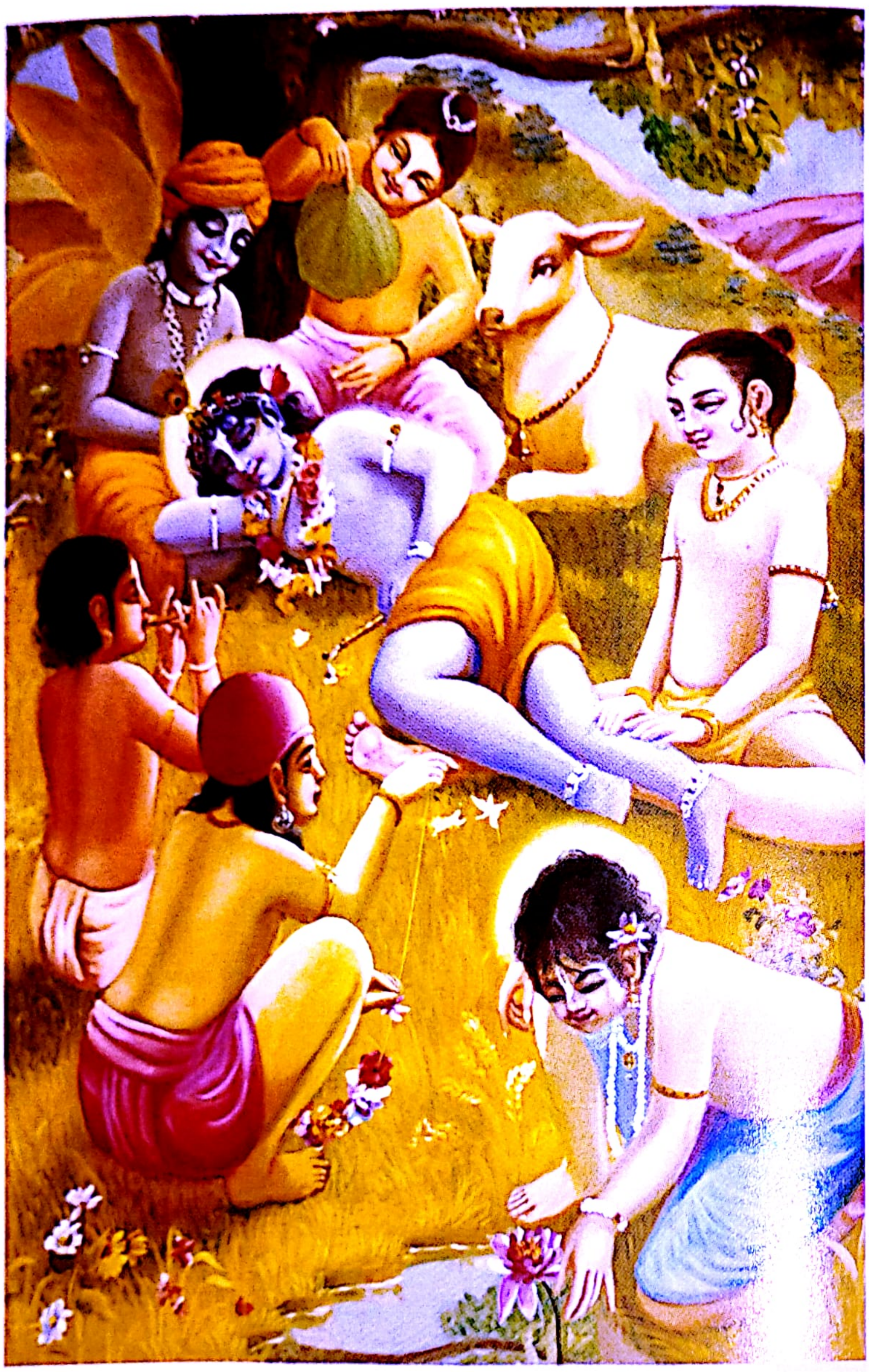
## শান্ত রস

"যখন একজন যোগী হৃদয়ে ভগবান বিষ্ণুর চিরন্তন রূপ দর্শন করেন এবং ভগবানের সৌন্দর্য শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে অনুভব করেন, তখন তিনি ভগবানের প্রতি ভালবাসার শান্ত রসের স্তরে অধিষ্ঠিত হন।" ভক্তিযোগের বিজ্ঞান ভগবানকে প্রত্যক্ষরূপে ভালবাসার পাঁচটি রস বা স্বাদের বিশ্লেষণ করে থাকে।



## দাস্য রস

দ্বারকাবাসী ভক্তগণ সকলেই কৃষ্ণসেবায় যুক্ত। মণ্ডন সর্বদাই ভগবানের মাথার উপর ছত্রধারণ করেন, সুচন্দ্র চামর ব্যজন করেন এবং সুতম্ব তাম্বুল অর্পণ করেন। তাঁরা সকলেই মহান ভক্ত এবং সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।



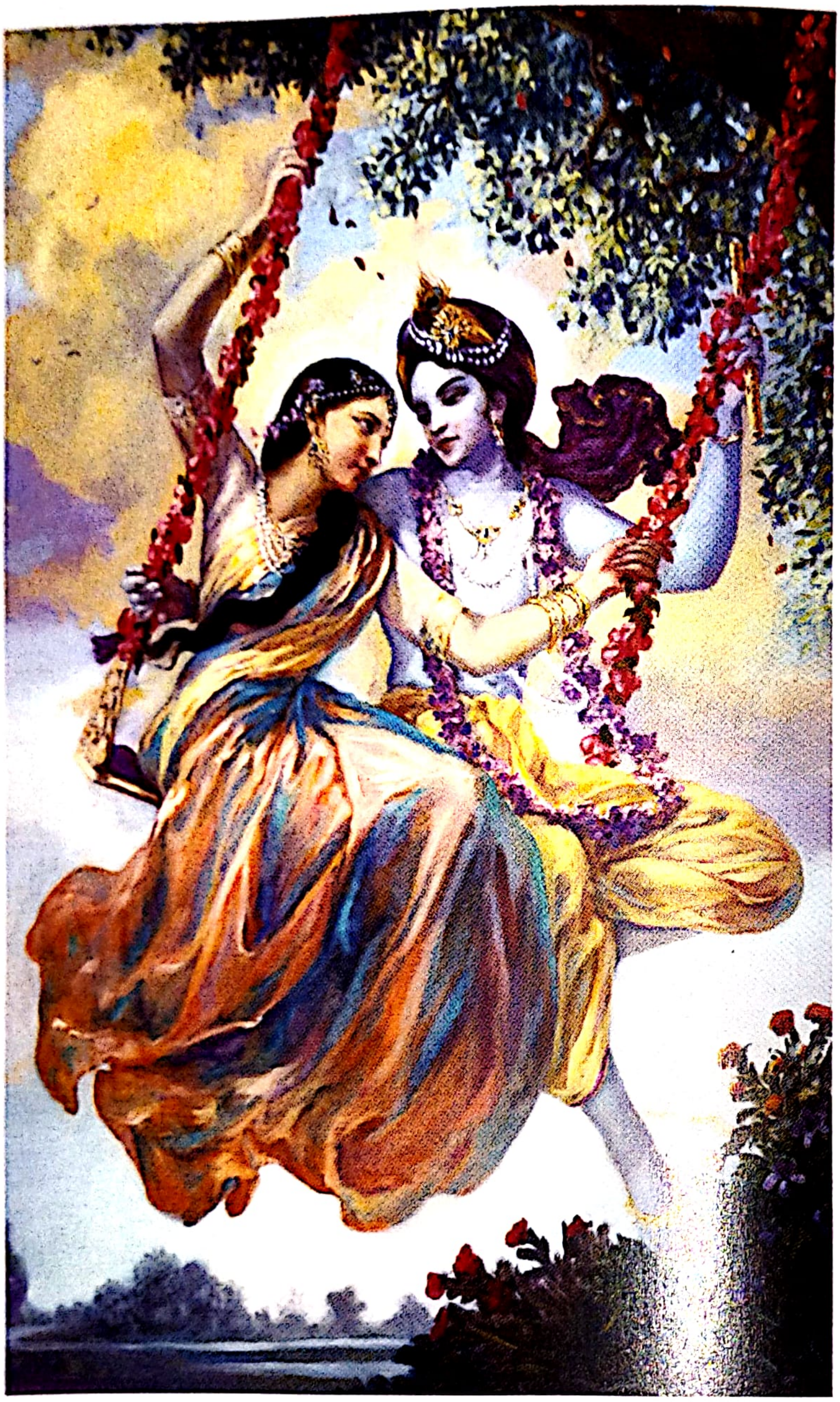
## সখ্য রস

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখারা অবিলম্বে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন উপায়ে তাঁর ক্লান্তি উপশম করার চেষ্টা করেন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশী শক্তি যোগমায়াই তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরকে ভুলিয়ে দেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবান, যাতে তাঁরা সখ্য রসের উপর আধারিত তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার রস উপলব্ধি করতে পারেন।



## বাৎসল্য রস

"মহারাজ নন্দ তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, 'প্রিয়া যশোদা, কৃষ্ণকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে, আর কিভাবে সে আমার দিব্য আনন্দকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে!'" শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা। কখনও কখনও তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের তাঁকে পুত্ররূপে চিন্তা করার অধিকার দেন, এবং তাঁদের বাৎসল্য রসে পুষ্ট স্নেহ ও ভালবাসা উপভোগ করেন।



## মাধুর্য রস

"পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তির অন্তরঙ্গ স্তরে মধুর রস প্রকটিত হয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে। কিন্তু এই ধরনের অনুভূতি কোনওভাবেই প্রাকৃত বা জাগতিক নয়।" জড়-জাগতিক ইন্দ্রিয় তর্পণের লালসা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মধুর রসে ভগবৎ-প্রেম উপলব্ধি করা বা অনুধাবনও করা যায় না।

শুদ্ধ ভক্তির আনন্দ সর্বোত্তম, কারণ তা নিত্য-শাশ্বত। প্রাকৃত সিদ্ধি অথবা ব্রহ্ম-সাযুজ্যের সুখানুভূতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, কারণ তা ক্ষণস্থায়ী। প্রাকৃত সুখ থেকে পতন অবশ্যম্ভাবী এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সুখ থেকেও সর্বদাই পতনের সম্ভাবনা থাকে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, মহাপণ্ডিত এবং তথাকথিত আত্ম-তত্ত্বদ্রষ্টা মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা রাজনীতি বা সমাজসেবায় প্রবৃত্ত হয়। এর কারণ হচ্ছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে তারা তাদের পরম ঈপ্সিত চিদানন্দ অনুভব করতে পারে না, তাই তাদের জড়-জাগতিক স্তরে নেমে এসে এই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হতে হয়। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের এইভাবে জড় স্তরে অধঃপতিত হওয়ার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে আছে। কিন্তু যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভবনায় ভাবিত, তিনি কখনই প্রাকৃত স্তরে ফিরে আসেন না। সেই প্রলোভন যতই মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, তিনি ভালভাবেই জানেন যে, কৃষ্ণভাবনাময় দিব্য কার্যকলাপের সঙ্গে প্রাকৃত কার্যকলাপের কোন তুলনা হতে পারে না।

যোগসিদ্ধি আট রকমের। 'অণিমা' সিদ্ধির প্রভাবে খুব ছোট হয়ে যাওয়া যায়; এত ছোট হওয়া যায় যে, একটি পাথরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রভাবে সাধারণ মানুষও এই সিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে, কারণ তারা এখন পাতাল রেল, সুড়ঙ্গ খনন ইত্যাদি উপায়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে অথবা মাটির নীচে যেতে সক্ষম হচ্ছে। সুতরাং, জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অণিমা সিদ্ধি লাভ হচ্ছে। এইভাবে একটু বিচার করে দেখলেই বোঝা যায় যে, সমস্ত যোগসিদ্ধিগুলি জড় বিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন, আর একটি যোগসিদ্ধির প্রভাবে এত হাল্কা হয়ে যাওয়া যায় যে, বায়ুতে বা জলে ভেসে থাকা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে এই সিদ্ধিটিও লব্ধ হয়েছে। আজকাল মানুষ অনায়াসে আকাশে উড়ছে, জলে ভাসছে, এমন কি জলের নীচেও ভ্রমণ করছে।

জড় সিদ্ধির সঙ্গে যোগসিদ্ধির তুলনা করলে দেখা যায় যে, জড় বৈজ্ঞানিকেরাও সেই একই সিদ্ধির অন্বেষণ করছে। সুতারাং, প্রকৃতপক্ষে জড় বৈজ্ঞানিকের সাফল্যের সঙ্গে যোগীর সিদ্ধির কোন পার্থক্য নেই। এক সময় একজন জার্মান পণ্ডিত বলেছিলেন যে, তথাকথিত যোগসিদ্ধিগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই লব্ধ হয়েছে, সুতরাং সেই সমস্ত সিদ্ধির প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই। যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য ভক্তিযোগ অনুশীলনে ব্রতী হয়েছিলেন।

অনেক যোগসিদ্ধি আছে যা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেনি। যেমন, সিদ্ধযোগী সূর্যরশ্মির মাধ্যমে সূর্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন। এই সিদ্ধিকে বলা হয় 'লঘিমা'। তেমনই যোগী তাঁর আঙ্গুল দিয়ে চাঁদকে স্পর্শ করতে পারেন। অন্তরীক্ষ যাত্রীরা যদিও অন্তরীক্ষ যানে করে চাঁদে যাচ্ছে, তাতে তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, কিন্তু যোগসিদ্ধির প্রভাবে যোগী কেবল হাত বাড়িয়ে তাঁর আঙ্গুল দিয়ে চাঁদকে স্পর্শ করতে পারেন। এই সিদ্ধিকে বলা হয় 'প্রাপ্তি'। প্রাপ্তি সিদ্ধির প্রভাবে যোগী কেবল চাঁদই স্পর্শ করতে পারেন, তাই নয়, তিনি তাঁর হাতকে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই প্রসারিত করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে কোন স্থান থেকে হাজার মাইল দূরে বসে থেকেও সেখানকার কোন বাগানের গাছ থেকে ফল পেড়ে নিতে পারেন। এরই নাম 'প্রাপ্তি' সিদ্ধি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে, যার প্রভাবে এই গ্রহের একটি নগণ্য অংশকে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু 'ঈশিতা' নামক যোগসিদ্ধির প্রভাবে কেবল ইচ্ছার দ্বারা একটি সম্পূর্ণ গ্রহ সৃষ্টি করা যায় বা ধ্বংস করা যায়। আর একটি সিদ্ধিকে বলা হয় 'বশিতা'। এই সিদ্ধির প্রভাবে যে কোনও মানুষকে বশীভূত করা যায়। এটি এক ধরনের সম্মোহনী শক্তি, যা প্রতিহত করা এক রকম অসম্ভব। কখনও কখনও দেখা যায় যে, এই 'বশিতা' শক্তির আংশিক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যোগী জনসাধারণকে বশীভূত করে তাদের ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যায়।

আর এক রকমের যোগসিদ্ধি হচ্ছে 'প্রাকাম্য'। এর দ্বারা মনের যে কোন বাসনা পূর্ণ করা যায়। যেমন, চোখে জল প্রবেশ করিয়ে তার পরে তা আবার চোখের ভিতর থেকে বার করে আনা যায়। কেবলমাত্র ইচ্ছার প্রভাবে এই সমস্ত অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদন করা যায়।

যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি হচ্ছে 'কামাবশায়িতা'। এটিও এক রকমের যাদুবিদ্যা। প্রাকাম্য শক্তির প্রভাবে যেমন প্রকৃতিতে অদ্ভুত সমস্ত কার্য সংঘটন করা যায়, কিন্তু কামাবশায়িতার প্রভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কামাবশায়িতার প্রভাবে অসম্ভব সমস্ত কার্য সম্পাদন করা যায়। এই সমস্ত জড় যোগসিদ্ধির প্রভাবে অবশ্যই প্রচুর আনন্দ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী।

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা, যারা আধুনিক জড় উন্নতির চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আছে, তারা মনে করে যে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অশিক্ষিত মূর্খ লোকেদের জন্য। তারা মনে করে, "জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের সমস্ত বন্দোবস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকে আমি খুব ভাল আছি—আমার সুন্দর বাড়ি আছে, আমার সুন্দর পরিবার আছে এবং আমি খুব সুন্দরভাবে আমার সমস্ত কামনা-বাসনাগুলি

চরিতার্থ করছি।" কিন্তু এই সমস্ত নির্বোধ মানুষেরা জানে না যে, যে কোন মুহূর্তে প্রকৃতি তার পদাঘাতে এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ থেকে তাদের নিষ্ক্রমণ করে দিতে পারে। অজ্ঞানের প্রভাবে তারা জানে না যে, যথার্থ জীবন নিত্য, চিরন্তন। অনিত্য দেহসুখ জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য নয়। গভীর অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে বলেই মানুষ আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতির চাকচিক্যে মোহিত হয়ে আছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই বলেছেন, "জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, জীবকে করয়ে গাধা"। কারণ জড় বিদ্যার চোখ ঝলসানো বৈভবের প্রভাবে মানুষ তার যথার্থ স্বরূপ বিস্মৃত হয়। সেটিই তার চরম দুর্ভাগ্য, কারণ এই জড় জগতের মোহ থেকে মুক্ত হওয়াই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু জড় বিদ্যার উন্নতির প্রভাবে মানুষ আরও বেশি করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার কোন আশাই তাদের নেই।

*হরিভক্তি-সুধোদয়* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান নৃসিংহদেবকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—"হে প্রভু, আমি বারংবার আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি, যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি দৃঢ়তর হয়। কৃষ্ণভাবনামৃতে যেন আমার স্থির নিষ্ঠা থাকে, কারণ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের আনন্দ এতই মধুর যে, তার সঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—সমস্ত সিদ্ধিই আপনা থেকে সুলভ হয়ে যায়।"

শুদ্ধ ভক্ত কখনই এই সমস্ত সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন না, কারণ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের আনন্দ এতই নির্মল ও অসীম যে, তার সঙ্গে অন্য কোন সুখেরই তুলনা হয় না। সেই জন্য বলা হয় যে, কৃষ্ণভাবনামৃতের যে আনন্দ, তার এক বিন্দুর সঙ্গে অন্য সমস্ত আনন্দের সিন্ধুরও তুলনা হয় না। তাই, যদি কোন মানুষের হৃদয়ে অল্প একটুও শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ হয়ে থাকে, তিনি তখন অনায়াসে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ থেকে লব্ধ সমস্ত তথাকথিত আনন্দকে পদাঘাতপূর্বক পরিত্যাগ করতে পারেন।

খোলাবেচা শ্রীধর নামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। বাজারে কলার খোলা বিক্রি করে তাঁর যা আয় হত তা ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আয়ের অর্ধভাগ দিয়ে তিনি মা গঙ্গার পূজা করতেন, এবং বাকি অর্ধাংশ দিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একবার তাঁর সেই অন্তরঙ্গ ভক্ত খোলাবেচা শ্রীধরের কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন, এবং তাঁকে তাঁর ঈপ্সিত যে কোনও ঐশ্বর্য দিতে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু শ্রীধর মহাপ্রভুকে বলেন যে, তাঁর সেই দীন-হীন অবস্থাতেই তিনি খুব সুখে আছেন, তাই জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। সেই

কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানিয়ে, তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী শ্রদ্ধা ও অপ্রতিহতা ভক্তি প্রার্থনা করেন। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব। তাঁরা যদি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারেন, তা হলে তাঁদের আর কিছুই চাওয়ার থাকে না। মুক্তি অথবা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার আনন্দ তাঁরা অবহেলা ভরে পরিত্যাগ করেন।

*নারদ-পঞ্চরাত্রে* বর্ণিত হয়েছে যে, যাঁর হৃদয়ে অল্প একটু ভক্তির উদয় হয়েছে, তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা পাঁচ রকমের মুক্তির আনন্দের কোন পরোয়া করেন না। ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তিজনিত যে সুখ তা শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করতে সাহস করে না। রানীর দাসীরা যেমন শ্রদ্ধা ও প্রণতি সহকারে রানীর অনুগামী হয়, ঠিক তেমনই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবদ্ভক্তির অনুগমন করে। অর্থাৎ, শুদ্ধ ভক্তের কখনও আনন্দের অভাব হয় না। তিনি ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু কামনা করেন না, আর যদি তাঁর কোন কামনা থেকেও থাকে, তা হলে তা না চাইতেই ভগবান সেগুলি চরিতার্থ করেন।

## শুদ্ধ ভক্তি সুদুর্লভ

পারমার্থিক জীবনের প্রাথমিক স্তরে আত্ম-উপলব্ধির জন্য তপশ্চর্যা, ত্যাগ আদি কৃচ্ছ্রসাধন করার বিধান আছে। কিন্তু এই সমস্ত পন্থার সাধক যদি জড় কামনা-বাসনা রহিতও হন, তবুও তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেন না। স্বাধীনভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাও আশাপ্রদ নয়, কারণ কৃষ্ণভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণ সহজেই ভুক্তি এমন কি মুক্তিও দান করেন, কিন্তু তিনি ভক্তি যাকে তাকে দান করতে চান না। ভক্তি কেবল শুদ্ধ ভক্তের কৃপার প্রভাবে লাভ হয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ১৯/১৫১) বলা হয়েছে— "শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই কেবল ভক্তিমার্গে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

ভক্তির সুদুর্লভতা *তন্ত্রশাস্ত্রেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শিব সতীকে বলছেন, "প্রিয়ে, জ্ঞানের বিভিন্ন পন্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে বিচক্ষণ দার্শনিক, তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে বহু পুণ্য অর্জন করে কেউ তার দ্বারা জড় সুখভোগ করতে পারেন, কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা কখনও তাঁকে ভগবদ্ভক্তি দান করতে পারে না, হাজার হাজার জন্মের প্রচেষ্টার ফলেও নয়।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অথবা মহাপুরুষদের উপদেশ শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল ভগবদ্ভক্তি

লাভ করা যায় না। জড় কামনা-বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৬/১৮) নারদ মুনিও যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর আর এক নাম মুকুন্দ, তিনি সর্বদাই পাণ্ডব ও যদুদের রক্ষা করেছেন। তিনি সর্বতোভাবে আপনার গুরুদেব ও উপদেষ্টা। তিনিই আপনার একমাত্র উপাস্য পরমেশ্বর ভগবান। তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতি পরায়ণ এবং তিনি আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্ত কর্মেরই পরিচালক। অধিক আর কি বলব, তিনি কখনও কখনও আপনার আদেশও পালন করে থাকেন, যেন তিনি আপনার বার্তাবহ দূত। হে রাজন! আপনি পরম সৌভাগ্যশালী, কারণ পরমেশ্বর ভগবান যেভাবে আপনাকে অনুগ্রহ করেন, তা কেউ স্বপ্নেও আশা করতে পারে না।" এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভগবান সহজেই মুক্তি দান করেন, কিন্তু তিনি ভক্তি দান করতে চান না। কারণ ভক্তির প্রভাবে ভগবান নিজেই ভক্তের কাছে বিক্রীত হয়ে যান।

## ভক্তির সান্দ্রানন্দ স্বরূপ

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার আনন্দকে যদি কোটি কোটি গুণ বর্ধিত করা যায়, তা হলেও ভগবদ্ভক্তির আনন্দের সমুদ্রের এক বিন্দুর সঙ্গেও তার তুলনা হয় না।

*হরিভক্তি-সুধোদয়* গ্রন্থে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের প্রসন্নতা মানসে প্রার্থনা করার সময় বলেন— "হে জগদীশ্বর ভগবান, আপনার সান্নিধ্যে আমি দিব্য সুখ অনুভব করছি, যেন আমি আনন্দের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি। এই আনন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দকে গোষ্পদের তুল্য মনে হচ্ছে।" তেমনই, শ্রীল শ্রীধর স্বামীর *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য *ভাবার্থ-দীপিকায়* বলা হয়েছে— "হে ভগবান, যে সমস্ত মহা ভাগ্যবানেরা তোমার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সন্তরণ করছেন, এবং নিরন্তর তোমার লীলামৃত আস্বাদন করছেন, তাঁরা জানেন যে, এই পরমানন্দের সঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলব্ধ সুখের কোন তুলনাই হয় না। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তির আনন্দ ব্যতীত অন্য সমস্ত আনন্দকে তৃণবৎ বিবেচনা করেন।"

## কৃষ্ণাকর্ষিণী

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আকর্ষণ করেন, কিন্তু ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে। ভক্তির চরম প্রতীক হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় মদনমোহন, অর্থাৎ তাঁর

রূপ এতই মনোহর যে, তা কোটি কোটি কন্দর্পকেও মোহিত করে। কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীর রূপ এতই চিত্তাকর্ষক যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করেন। তাই ভক্তরা তাঁকে মদনমোহনমোহিনী বলে সম্বোধন করেন।

ভগবদ্ভক্তি আচরণ করার অর্থ হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তাই বৃন্দাবনের ভক্তরা শ্রীমতী রাধারাণীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাতে তাঁদের ভক্তি সার্থক হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভক্তি কোন জড়-জাগতিক কর্ম নয়; তা সরাসরিভাবে রাধারাণীর পরিচালনাধীন। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যাঁরা মহাত্মা তাঁরা সরাসরিভাবে দৈবী প্রকৃতি অর্থাৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর আশ্রিত। সুতরাং সরাসরিভাবে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির পরিচালনাধীন হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/২০) এই সত্যকে স্বীকার করে বলেছেন, "হে উদ্ধব, ভক্তের প্রবল ভক্তি যেভাবে আমাকে আকর্ষণ করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদ অধ্যয়ন, তপ, ত্যাগ, দান, আদি পুণ্যকর্ম তা করতে পারে না।"

ভক্তের ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আকৃষ্ট হন তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/১০/৪৮-৪৯) নারদ মুনি বর্ণনা করেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যেভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের গুণগান করছিলেন, তা নারদ মুনি বর্ণনা করেছেন। ভক্ত সর্বদাই অন্য ভক্তের কার্যকলাপের প্রশংসা করেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজের গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করছিলেন, শুদ্ধ ভক্তের এটি একটি লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্ত কখনই নিজেকে মহান বলে মনে করেন না; তিনি সব সময়েই মনে করেন যে, অন্য ভক্তেরা তাঁর থেকে অনেক উন্নত। যুধিষ্ঠির মহারাজ মনে করেছিলেন, "প্রহ্লাদ মহারাজই ভগবানের যথার্থ ভক্ত, আমি কিছুই নই।" তিনি যখন এইভাবে ভাবছিলেন, তখন নারদ মুনি তাঁকে বললেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই জগতে তোমরা পাণ্ডবেরাই যথার্থ ভাগ্যবান। পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন এবং তোমাদের সঙ্গে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার করছেন। তিনি সর্বদাই, সর্ব অবস্থাতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তিনি যদিও অন্য সকলের কাছে আত্মগোপন করে থাকেন, তবুও তিনি তোমাদের সঙ্গে বসবাস করেন। অন্যরা বুঝতেই পারে না যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তিনি ভ্রাতৃবৎ বসবাস করেন। তিনি তোমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করেন, এবং কখনও আবার তোমাদের বার্তাবহ দূতও হন। তাই নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, এই জগতে তোমাদের থেকে ভাগ্যবান আর কেউ নেই।"

*ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন, অর্জুন তখন প্রার্থনা করেন—"হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার মাতুলপুত্র বলে মনে করতাম,

তাই নানাভাবে আমি তোমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছি। আমি তোমাকে 'হে কৃষ্ণ', 'হে সখে', বলে সম্বোধন করেছি। কিন্তু তুমি এতই মহৎ যে, তুমি যে পরমেশ্বর ভগবান তা আমাকে বুঝতে দাওনি।" সুতরাং এটিই হচ্ছে পাণ্ডবদের সৌভাগ্য; শ্রীকৃষ্ণ যদিও পরমেশ্বর ভগবান, সমগ্র বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর, তবুও তিনি পাণ্ডবদের ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে, তাঁদের সখ্য ও প্রীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের সঙ্গে বাস করতেন। ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যের এটিই প্রমাণ। তা পরমেশ্বর ভগবানকেও আকৃষ্ট করতে পারে। ভগবান মহান, কিন্তু ভক্তি ভগবানের থেকেও মহত্তর, কেন না তা তাঁকেও আকর্ষণ করে। যারা কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হয়নি, তারা কখনই ভগবৎ-সেবার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে না।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ভক্তির প্রথম পর্যায়

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে ভগবদ্ভক্তিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। এই বিভাগ তিনটি আবার কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত হয়েছে। সাধারণত সাধন-ভক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য, ভাবভক্তির চারটি বৈশিষ্ট্য এবং প্রেমভক্তির ছয়টি বৈশিষ্ট্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী পরবর্তী অধ্যায়ে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করবেন।

এই সম্পর্কে রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে রত মানুষেরা তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বলেছেন যে, ভক্তির সাধন পূর্বজীবনের সাধনার অনুবর্তীরূপে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। পূর্বজীবনে যোগাযোগ না থাকলে ভগবদ্ভক্তি সাধনে ব্রতী হওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি এই জীবনে কিছুটা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করে থাকেন, তাঁর সাধনা পূর্ণ না হলেও যতটুকু অনুশীলন তিনি করেছেন তা ব্যর্থ হবে না। পরবর্তী জীবনে তিনি যখন আবার ভক্তির অনুশীলন করা শুরু করবেন, তখন পূর্বজীবনে যে স্তরে তিনি শেষ করেছিলেন তারপর থেকে শুরু করবেন। এইভাবে ভক্তির সাধন নিরন্তর চলতে থাকে। কিন্তু কারও যদি এই রকম পূর্বলব্ধ সাধনা না থাকে এবং অকস্মাৎ কোন শুদ্ধ ভক্তের উপদেশে রুচি হওয়ার ফলে ভক্তিমার্গ অঙ্গীকার করেন, তবে তিনিও এই পথে উন্নতি সাধন করতে পারেন। *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রমুখ শাস্ত্রগ্রন্থের তত্ত্ব উপলব্ধি করার প্রতি যাঁদের স্বাভাবিক রুচি রয়েছে, তাঁরা মনোধর্মী দার্শনিক ও তার্কিকদের থেকে অনেক সহজে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করতে পারেন।

এই মন্তব্যের সমর্থনে প্রাচীন মনীষীদের উক্ত অনেক প্রমাণ আছে। সেই সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন, কোন মানুষ তাঁর যুক্তি ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর থেকেও অধিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কোন তার্কিক এসে তাঁর সেই মতবাদকে খণ্ডন করে অন্য আর একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এইভাবে তর্কের মাধ্যমে কখনই যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবদ্ভক্তির যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, এখানে তারই সাধারণ বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বে, ভগবদ্ভক্তির সাধন,

ভাব ও প্রেম—এই তিনটি বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে। এখন শ্রীল রূপ গোস্বামী সাধন-ভক্তির বর্ণনা করছেন।

সাধন বা অনুশীলনের অর্থ হচ্ছে কোন বিশেষ কার্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা। কতকগুলি ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান অর্জন করা হয়, এবং কতকগুলি ইন্দ্রিয় আবার চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে কার্যকরী করে। তাই সাধন বলতে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে কার্যকরীভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাকে বোঝানো হয়। এই সাধন কোন অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম গুণকে বিকশিত করার প্রক্রিয়া নয়, এই হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক প্রবণতার বিকাশ। যেমন, একটি শিশু হাঁটতে শেখে। এই যে হাঁটার যোগ্যতা, এটি স্বাভাবিকভাবেই শিশুটির মধ্যে ছিল। তাই একটু চেষ্টা বা সাধনা করার ফলেই সে স্বচ্ছন্দে হাঁটতে শুরু করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তি করার বৃত্তি প্রতিটি জীবের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। আদিবাসীদের মতো অসভ্য মানুষেরা যখন প্রকৃতিতে কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখে, তখন তারা তার প্রতি তাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম না জানিয়ে পারে না। তারা তখন বুঝতে পারে যে, কোন কিছু বিস্ময়জনক প্রদর্শন বা কার্যের পশ্চাতে কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু রয়েছে। তাই এই ভাবনা জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত জীবের মধ্যে যদিও সুপ্তভাবে রয়েছে, সমস্ত জীবের মধ্যেও তা দেখতে পাওয়া যায়। জীবের চেতনা যখন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, সেই শুদ্ধ চেতনের বৃত্তিকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তি।

শিশু যেমন অল্প একটু চেষ্টা করার ফলেই হাঁটতে শুরু করে, তেমনই কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধির মাধ্যমে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করার ফলে আমাদের সুপ্ত ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত হয়। যার হাঁটবার যোগ্যতা নেই, সে শত চেষ্টা করেও হাঁটতে পারে না। তেমনই, কেবল অনুশীলনের ফলেই কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সেই রকম কোন সাধন বা অনুশীলন নেই। কৃষ্ণভক্তি নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু জীবের স্বাভাবিক আন্তরিক বৃত্তি বিকশিত করার জন্য কতকগুলি সাধনের প্রক্রিয়া আছে, যা আচরণ করার ফলে তার সুপ্ত ভক্তি জাগরিত হয়। এই অভ্যাসের নামই হচ্ছে সাধন-ভক্তি।

মায়াশক্তির বশীভূত প্রতিটি জীবই উন্মাদ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—"সাধারণত বদ্ধ জীব উন্মাদ, কারণ সে সর্বদাই এমন সমস্ত কর্মে তৎপর, যা তার বন্ধন ও ক্লেশের কারণ।" আত্মা তার স্বরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ার ফলে সে অসৎ, অচেতন ও নিরানন্দ হয়ে পড়েছে। তার এই দুর্দশার কারণ হচ্ছে তার *বিকর্ম*। *বিকর্ম* মানে

হচ্ছে অনুচিত কর্ম। তাই, সাধন-ভক্তির অনুশীলন করা অবশ্য কর্তব্য—যার অর্থ হচ্ছে সকালে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-আরত্রিক করা, কতকগুলি জড় কার্যকলাপ বর্জন করা, শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করা এবং আরও অনেকগুলি বিধি-নিষেধ মেনে চলা, যা পরে একে একে আলোচনা করা হবে। এই সমস্ত অনুশীলনগুলি আমাদের উন্মাদ রোগ সারাতে সাহায্য করবে। মনস্তত্ত্ববিদের পরিচালনায় যেমন মানুষের মানসিক রোগের নিরাময় হয়, তেমনই সাধন-ভক্তি অনুশীলন করার ফলে বদ্ধ জীবের ভবরোগ নামক উন্মত্ততার নিরাময় হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/১/৩২) নারদ মুনি এই সাধন-ভক্তির উল্লেখ করে যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছেন—"হে রাজন্! যে কোন উপায়েই হোক মনকে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন রাখতে হবে।" এরই নাম কৃষ্ণভাবনামৃত। আচার্য বা সদ্‌গুরুর কর্তব্য হচ্ছে কিভাবে শিষ্যের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করা যায় তার ব্যবস্থা করা। এটিই হচ্ছে সাধন-ভক্তির প্রাথমিক স্তর।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই উদ্দেশ্যে আমাদের এক প্রামাণিক কার্যক্রম দিয়ে গেছেন, যা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের ওপর আশ্রিত। এই কীর্তন এমনই দিব্য শক্তিসম্পন্ন যে, তা সাধন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তৎক্ষণাৎ আসক্তি জন্মায়। এর ফলে সাধন-ভক্তির সূত্রপাত হয়। যে কোনও উপায়েই হোক না কেন, মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করতে হবে। সন্তপ্রবর অম্বরীষ মহারাজ অত্যন্ত দায়িত্বসম্পন্ন রাজা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করেছিলেন, এবং ঠিক তেমনভাবেই যে কোনও মানুষ তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্র করার সাধনা করার ফলে, অনায়াসে তাঁর স্বাভাবিক কৃষ্ণভাবনাকে পুনর্জাগরিত করতে পারেন।

এই সাধন-ভক্তিকেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে, বৈধী নামক সাধন-ভক্তিতে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা অথবা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন বিধির আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই সম্বন্ধে কোন তর্ক অথবা সেই আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য। সাধন-ভক্তির অপর স্তরটিকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। বৈধীভক্তি আচরণ করার ফলে যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জন্মায় এবং তাঁর প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রেমের প্রভাবে তাঁর সেবা করার প্রবৃত্তি জন্মায়, তাকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। যেমন, ভক্তকে প্রতিদিন খুব সকালে উঠে ভগবানের আরতি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে ভক্ত খুব সকালে উঠে ভগবানের আরতি করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে ভগবানের প্রতি তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হয়। তিনি যখন এইভাবে অনুরক্ত হন, তখন আপনা থেকেই তিনি ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সুন্দর করে সাজাতে চেষ্টা

করেন, বিভিন্ন রকমের পোশাক তৈরি করেন এবং কিভাবে আরও ভাল করে ভগবানের সেবা করা যায় তার পরিকল্পনা করেন। এই স্তরের ভক্তি যদিও সাধনের অন্তর্গত, এই ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগজাত। এইভাবে সাধন-ভক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—বৈধী এবং রাগানুগা।

বৈধীভক্তির ব্যাখ্যা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—"রাগ অথবা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে, যখন কেবল গুরুদেবের আদেশ অথবা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভগবৎ-সেবা হয়, সেই বাধ্যবাধকতামূলক ভগবৎ-সেবাকে বৈধীভক্তি বলা হয়।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/৫) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন মুমূর্ষু মহারাজ পরীক্ষিৎকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখনও এই বৈধীভক্তির তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর দর্শন লাভ করেন। তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃত্যুর পূর্বে কি করা কর্তব্য সেই বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। সেই সময় অনেক মুনি-ঋষি সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁকে উপযুক্ত উপদেশ দিতে পারেননি। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এসে তাঁকে নির্দেশ দিলেন, "হে রাজন! যদি আপনি নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চান, তা হলে এখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ, গুণ কীর্তন এবং লীলা স্মরণ করতে শুরু করুন।" কেউ যদি ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' শ্রবণ ও কীর্তন করতে শুরু করেন এবং সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তা হলে তাঁর আর মৃত্যুভয় থাকে না।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেব-দেবীর কথা শ্রবণ বা কীর্তন করার নির্দেশ দেননি। মায়াবাদীরা (নির্বিশেষবাদীরা) বলে যে, যে কোন দেব-দেবীর নাম কীর্তন করা যেতে পারে এবং তার ফল একই হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রামাণিক নির্দেশ হচ্ছে, কেবল পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণেরই নাম শ্রবণ ও কীর্তন করা কর্তব্য।

তাই শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে নির্দেশ দিয়েছেন, নির্ভয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে হলে, যে কোন উপায়ে হোক, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ, তাঁর গুণ কীর্তন এবং তাঁর লীলা স্মরণ করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *সর্বাত্মা*। *সর্বাত্মা* কথাটির অর্থ হচ্ছে 'সকলের পরম আত্মা।' শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি হচ্ছেন সেই পরম

নিয়ন্তা, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে সকলকে পরিচালিত করছেন। তাই, আমরা যদি কোনমতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হতে পারি, তা হলে তিনি আমাদের সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত করবেন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবানের ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না—*ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।* অন্যদের কিন্তু অবশ্যই বিনাশ হয়। বিনাশ হয় অর্থাৎ এই মনুষ্য-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ যদি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করে, তা হলে সে এই সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের মানুষেরা জানে না যে, প্রকৃতির নিয়মে তারা কোথায় প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে।

কেউ যদি মনুষ্যজন্ম পাওয়া সত্ত্বেও তার হৃদয়ের কৃষ্ণভাবনা বিকশিত না করে, তা হলে তাকে ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে প্রক্ষিপ্ত হতে হবে, যার ফলে তার আত্মস্বরূপ বিনষ্ট হবে। জীবদেহ বিভিন্ন রকমের, তাই পরবর্তী জন্মে সে একটি গাছ হয়ে জন্মাবে, না পশু হয়ে জন্মাবে, না পাখি হয়ে জন্মাবে, সেই সম্বন্ধে কোনই নিশ্চয়তা নেই। জীবের স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্তি পুনঃ প্রকাশিত করবার জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী পরামর্শ দিয়েছেন যে, কোন না কোনভাবে আমাদের মনকে দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন রাখতে হবে, এবং তার ফলে আমরা মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হতে পারব। মৃত্যুর পর যে আমাদের কি গতি হবে, সেই সম্বন্ধে আমাদের কোনই ধারণা নেই, কারণ তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হয়ে থাকি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কেবল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই আমরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হই, তা হলে আর বিভিন্ন যোনিতে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে পুনরাবর্তিত হওয়ার ভয় থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত অবশ্যই কৃষ্ণলোকে ফিরে যাবেন। *ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার আমাদের সেই আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

*পদ্ম-পুরাণেও* এই পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নিরন্তর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করা কর্তব্য। এইভাবে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করাকে ধ্যান বলা হয়। শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে যে, মনকে শ্রীবিষ্ণুতে একাগ্র করে ধ্যান করা কর্তব্য। *পদ্ম-পুরাণে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ধ্যানের মাধ্যমে মনকে শ্রীবিষ্ণুতে নিবেশিত করা উচিত, যাতে ক্ষণিকের জন্যও আমরা তাঁকে ভুলে না যাই। চেতনার এই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি।

আমাদের জীবনের কার্যকলাপকে এমনভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে আমরা সর্বক্ষণ শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি। এরই নাম কৃষ্ণভাবনামৃত। ধ্যান চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুকেই করা হোক, বা দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণকেই করা হোক, তা একই কথা। *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে—যেভাবেই হোক না কেন, সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করতে হবে। কোন পরিস্থিতিতেই যেন তাঁকে আমরা ভুলে

না যাই। সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধানের মধ্যে এটাই হচ্ছে মূল বিধান। যখন কোন কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তার সঙ্গে কিছু নিষেধও থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তখন তার সঙ্গে এই নিষেধটিও নির্দেশিত হচ্ছে, যেন কখনও আমরা তাঁকে ভুলে না যাই। সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণভাবে এই বিধি-নিষেধের অন্তর্গত।

এই বিধি সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের প্রতি প্রযোজ্য। বর্ণ চারটি, যথা — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আশ্রমও চারটি, যথা — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বনপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বিধিগুলি কেবল ব্রহ্মচারীদেরই পালনীয় নয়, সেগুলি সকলেরই আচরণীয়। কেউ ব্রহ্মচারী হোক বা সন্ন্যাসী হোক, কনিষ্ঠ সাধক হোক বা উত্তম সাধক হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। পরমেশ্বর ভগবানকে নিরন্তর স্মরণ এবং ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে ভুলে না যাওয়া — এই নির্দেশ অনুসরণ করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

যদি এই বিধিটি পালন করা হয়, তা হলে অন্য সমস্ত বিধি-নিষেধগুলিকে এই মুখ্য সিদ্ধান্তের সহকারী বা সেবক বলে বিবেচনা করা উচিত। বিধি-নিষেধ ও তাদের ফলসমূহ *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৫/২-৩) বর্ণিত হয়েছে। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমস মুনি মহারাজ নিমিকে উপদেশ দেন, "হে রাজন! ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মস্তক থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উদর থেকে বৈশ্য ও চরণ থেকে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস — এই আশ্রম চারটিও তাদের সঙ্গেই উদ্ভূত হয়েছে।"

এই বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ গুণ অনুসারে হয়ে থাকে। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান নিজেই গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন ভিন্ন ভিন্ন কার্য করে, তেমনই গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমেরও ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপ রয়েছে। এই সমস্ত কার্যকলাপের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, "ভগবানই পরম ভোক্তা।" সুতরাং বর্ণ-আশ্রম নির্বিশেষে সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করাই সকলের পরম কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে — "সকলেরই উচিত তাঁর কর্তব্যকর্ম করা, কিন্তু কর্তব্যকর্মের পূর্ণতা নির্ভর করে ভগবানকে কতটা সন্তুষ্ট করা গেছে তার উপরে।" এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে কর্ম করে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা উচিত, তা না হলে নিম্নতর পশুযোনিতে অধঃপতিত হতে হবে।

উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ভগবানের মস্তক থেকে উৎপন্ন হয়েছেন যে ব্রাহ্মণ, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে দিব্য বৈদিক মন্ত্র বা বাণীর প্রচার করা। ব্রাহ্মণ যেহেতু ভগবানের মুখ, তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে শব্দব্রহ্মের প্রচার করা এবং ভগবানের হয়ে ভোজন করা। বৈদিক বিধান হচ্ছে, ব্রাহ্মণ যখন ভোজন করেন, তখন তাঁর মাধ্যমে ভগবান ভোজন করেছেন বলে মনে করা উচিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ব্রাহ্মণ ভগবানের হয়ে ভোজন করার নাম করে সারাক্ষণ কেবল ভোজনই করতে থাকবে এবং সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ভগবানের বাণী প্রচার করার কাজ কিছুই করবে না। প্রকৃতপক্ষে, যিনি ভগবানের বাণী প্রচার করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। এই সত্য *ভগবদ্গীতাতেই* প্রতিপন্ন হয়েছে। এই ধরনের প্রচারকই হচ্ছেন যথার্থ ব্রাহ্মণ এবং তাই তাঁকে ভোজন করানোর মাধ্যমে সরাসরিভাবে ভগবানকে ভোজন করানো হয়।

তেমনই, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে 'মায়ার' আক্রমণ থেকে জন-সাধারণকে রক্ষা করা। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখনই দেখলেন যে, একজন শূদ্র গো-বধ করতে উদ্যত হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই শূদ্ররাজবেশী দুষ্ট কলিকে বিনাশ করার জন্য তরবারি কোষমুক্ত করেন। এটিই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য। রক্ষণ করবার জন্য হিংসার আবশ্যকতা আছে। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জনসাধারণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে হিংসা করার জন্য সরাসরিভাবে আদেশ দিয়েছিলেন।

বৈশ্যের কর্তব্য হচ্ছে কৃষি, গো-রক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা। শ্রমিক বা শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তারা, যাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের মতো উন্নত বুদ্ধিমত্তা নেই, এবং তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের শারীরিক কার্যক্ষমতা দিয়ে উচ্চতর বর্ণের লোকদের সাহায্য করা। এইভাবে এই বিধির মাধ্যমে সব কয়টি বর্ণের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকে এবং সকলেই পারমার্থিক প্রগতি সাধনে সমর্থ হয়। উপরোক্ত সহযোগিতার অভাবের ফলেই সমাজের পতন হয়। সেটিই কলহের যুগ কলির পরিস্থিতি। কেউই তার কর্তব্য করছে না, কিন্তু তারা সকলেই ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় বলে অভিমান করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মানুষদের কোন পদমর্যাদা নেই। তারা কৃষ্ণ-বহির্মুখ, কেননা তারা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত নয়। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমগ্র মানব-সমাজকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে গড়ে তোলা, যাতে সকলেই তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত করে সুখী হতে পারে এবং সমগ্র বিশ্বের যথার্থ মঙ্গল সাধন করতে পারে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করলে ভগবান তৃপ্ত হন, এবং তার ফলে সমাজ-জীবনের সমস্ত

আবশ্যকীয় বস্তুগুলি পর্যাপ্তরূপে সুলভে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে পালন করেন। সমস্ত সমাজ যদি স্বীয় কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হয় এবং কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়, তা হলে সেই সমাজের প্রতিটি সদস্যই যে পরম সুখ ও শান্তিতে তাদের জীবন যাপন করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। জীবনের সমস্ত অভাবগুলি তখন মিটে যাবে। সমস্ত পৃথিবী তখন বৈকুণ্ঠে পরিণত হবে। এমন কি, ভগবদ্ধামে না গিয়েও, কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ পালন করে এবং কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কর্তব্যসমূহ আচরণ করে, সমগ্র মানব-সমাজ সর্বতোভাবে সুখী হতে পারে।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২৭/৪৯) ভগবান বলেছেন, "হে উদ্ধব, সব মানুষই হয় শাস্ত্রসম্মত কার্যকলাপে, নয়তো জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত। এই কার্যকলাপের ফলে তারা যদি কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার আরাধনা করে, তা হলে তারা আপনা থেকেই ইহলোকে ও পরলোকে পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।" শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করলে সকলেরই সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই উত্তম যে, কাউকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী ইত্যাদি কোন উপাধিরই অন্তর্গত হতে হয় না। বর্ণাশ্রম বা বৃত্তি নির্বিশেষে যিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই সকলে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন। যিনি যে কাজ করছেন সেই কাজ করেই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে, তাঁর সমস্ত ফল শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করে তাঁর আরাধনা করতে পারেন। তা হলে সমস্ত পরিস্থিতির সমাধান হবে এবং জগতের সকলেই সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারবে। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* ভক্তির এই বিধিবিধানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "শাস্ত্রে ভগবানের প্রসন্নতার জন্য যে সমস্ত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে মহান আচার্যেরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের বিধি বলে মনে করেন। যদি কেউ সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে নিয়মিতভাবে এই নির্দেশ অনুসারে ভগবৎ-সেবার আচরণ করেন, তা হলে অচিরেই তিনি শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমময় সেবাভাব প্রাপ্ত হবেন।"

# তৃতীয় অধ্যায়

# ভক্তিযোগের অধিকারীর লক্ষণ

পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ মহাত্মার সঙ্গের প্রভাবে কারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিঞ্চিৎ রুচির উন্মেষ হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে কারও সকাম কর্ম ও জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি থাকলে, বিভিন্ন রকমের তপশ্চর্যা ও ত্যাগের প্রতি তার অনাসক্তি দেখা দেয়। যদি এই রকমের মানুষেরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য আসক্তি হয়, তা হলে তিনি ভক্তিযোগ আচরণ করার অধিকারী হন।

শুদ্ধ ভক্তের সংসর্গে কৃষ্ণভাবনার প্রতি এই রকম আকর্ষণ পরম সৌভাগ্যসূচক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন, '*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* (*চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১৯/১৫১)। অর্থাৎ কোন মহা ভাগ্যবান জীবই কেবল সদ্‌গুরু ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিরূপ লতার বীজ প্রাপ্ত হন। এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/৮) উদ্ধবকে বলছেন, "হে উদ্ধব, দুর্লভ সৌভাগ্যের প্রভাবেই শুধু মানুষ আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যদি সে সকাম কর্ম থেকে পূর্ণরূপে বিরক্ত না হয়, অথবা ভক্তির প্রতি পূর্ণরূপে আসক্ত না হয়, তা হলেও আমার এই সেবার প্রভাবে সে অচিরেই সুফল লাভ করে।"

ভগবদ্ভক্তদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম বা উত্তম ভক্তের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তিনি শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং তদনুকূল তর্কে নিপুণ এবং যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করতে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি লাভ করা, এবং তিনি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ এবং পরম আরাধ্য। উত্তম ভক্ত তিনিই হতে পারেন, যিনি সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ঐকান্তিক দৃঢ়তার সঙ্গে বিধি-নিষেধের অনুশীলন করেছেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাঁর সমস্ত আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। এইভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করে গুরু হওয়ার শিক্ষা লাভ করে, তিনি উত্তম ভক্ত বলে গণ্য হন। উত্তম ভক্ত কখনও পূর্বতন আচার্যদের সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হন না এবং সম্পূর্ণ যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করে দৃঢ় শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এখানে যে যুক্তি-তর্কের উল্লেখ করা হয়েছে, তা বৈদিক শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তি-তর্ক। উত্তম ভক্ত কখনই সময়ের অপব্যয়কারী শুষ্ক মনোধর্মের

প্রতি আকৃষ্ট হন না। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবদ্ভক্তিতে যাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা জন্মেছে, তিনিই উত্তম ভক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত বা মধ্যম অধিকারী ভক্তের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক করতে ততটা নিপুণ নন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে। অর্থাৎ, মধ্যম অধিকারী ভক্তের কৃষ্ণভক্তিই যে জীবনের পরম লক্ষ্য, সেই সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। তিনি কখনও কখনও শাস্ত্রের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করতে অসমর্থ হতে পারেন, কিন্তু তা হলেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করাই যে জীবনের পরম লক্ষ্য, সেই সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সংশয়ের উদয় হয় না।

তৃতীয় শ্রেণী বা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত হচ্ছেন তিনি, যাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয়নি, এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের প্রতিও যথার্থ শ্রদ্ধা নেই। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত শ্রদ্ধা-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমন্বিত দৃঢ় যুক্তির প্রভাবে বিচলিত হতে পারেন। মধ্যম ভক্তের মতো তিনিও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তর্ক করতে এবং প্রমাণ করতে পারেন না, কিন্তু মধ্যম অধিকারী ভক্তের মতো অবিচলিত শ্রদ্ধা তাঁর নেই। তাই তাঁকে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলা হয়।

কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত সম্বন্ধে আরও বিশদ বিবরণ *ভগবদ্গীতায়* রয়েছে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার ধরনের মানুষ তাঁদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভগবদ্ভক্তি আচরণ করতে শুরু করেন এবং ভগবৎ-মুখী হন। তিনি কোন মন্দিরে গিয়ে ভগবানের কাছে কষ্ট নিবারণ, অর্থপ্রাপ্তি অথবা জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা করেন। শুধুমাত্র ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত জ্ঞানও কনিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে তাঁরা মধ্যম অথবা উত্তম ভক্তে পরিণত হতে পারেন।

মহারাজ ধ্রুব কনিষ্ঠ ভক্তের অন্যতম উদাহরণ। তিনি তাঁর পিতার রাজ্য লাভ করতে ইচ্ছা করেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভক্তিযোগে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অবশেষে পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়ার পর, তিনি ভগবানের কাছে কোন লৌকিক বর প্রার্থনা করতে অস্বীকার করেন। তেমনই, সংকটের সময় গজেন্দ্র আত্মরক্ষা করার জন্য ভগবানকে ডাকেন, অবশেষে তিনিও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চার কুমারেরাও জ্ঞানী সন্তপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদেরও ঠিক তেমনই হয়েছিল। তাঁরা জিজ্ঞাসু ছিলেন এবং সূত গোস্বামীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করার ফলে তাঁরাও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। সুতরাং আত্ম-উন্নতি করার এটিই হচ্ছে পন্থা। যে অবস্থাতেই

# তৃতীয় অধ্যায়

# ভক্তিযোগের অধিকারীর লক্ষণ

পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ মহাত্মার সঙ্গের প্রভাবে কারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিঞ্চিৎ রুচির উন্মেষ হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে কারও সকাম কর্ম ও জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি থাকলে, বিভিন্ন রকমের তপশ্চর্যা ও ত্যাগের প্রতি তার অনাসক্তি দেখা দেয়। যদি এই রকমের মানুষেরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য আসক্তি হয়, তা হলে তিনি ভক্তিযোগ আচরণ করার অধিকারী হন।

শুদ্ধ ভক্তের সংসর্গে কৃষ্ণভাবনার প্রতি এই রকম আকর্ষণ পরম সৌভাগ্যসূচক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন, '*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* (*চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১৯/১৫১)। অর্থাৎ কোন মহা ভাগ্যবান জীবই কেবল সদ্‌গুরু ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিরূপ লতার বীজ প্রাপ্ত হন। এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/৮) উদ্ধবকে বলছেন, "হে উদ্ধব, দুর্লভ সৌভাগ্যের প্রভাবেই শুধু মানুষ আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যদি সে সকাম কর্ম থেকে পূর্ণরূপে বিরক্ত না হয়, অথবা ভক্তির প্রতি পূর্ণরূপে আসক্ত না হয়, তা হলেও আমার এই সেবার প্রভাবে সে অচিরেই সুফল লাভ করে।"

ভগবদ্ভক্তদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম বা উত্তম ভক্তের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তিনি শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং তদনুকূল তর্কে নিপুণ এবং যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করতে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি লাভ করা, এবং তিনি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ এবং পরম আরাধ্য। উত্তম ভক্ত তিনিই হতে পারেন, যিনি সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ঐকান্তিক দৃঢ়তার সঙ্গে বিধি-নিষেধের অনুশীলন করেছেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাঁর সমস্ত আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। এইভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করে গুরু হওয়ার শিক্ষা লাভ করে, তিনি উত্তম ভক্ত বলে গণ্য হন। উত্তম ভক্ত কখনও পূর্বতন আচার্যদের সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হন না এবং সম্পূর্ণ যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করে দৃঢ় শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এখানে যে যুক্তি-তর্কের উল্লেখ করা হয়েছে, তা বৈদিক শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তি-তর্ক। উত্তম ভক্ত কখনই সময়ের অপব্যয়কারী শুষ্ক মনোধর্মের

প্রতি আকৃষ্ট হন না। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবদ্ভক্তিতে যাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা জন্মেছে, তিনিই উত্তম ভক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত বা মধ্যম অধিকারী ভক্তের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক করতে ততটা নিপুণ নন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে। অর্থাৎ, মধ্যম অধিকারী ভক্তের কৃষ্ণভক্তিই যে জীবনের পরম লক্ষ্য, সেই সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। তিনি কখনও কখনও শাস্ত্রের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করতে অসমর্থ হতে পারেন, কিন্তু তা হলেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করাই যে জীবনের পরম লক্ষ্য, সেই সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সংশয়ের উদয় হয় না।

তৃতীয় শ্রেণী বা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত হচ্ছেন তিনি, যাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয়নি, এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের প্রতিও যথার্থ শ্রদ্ধা নেই। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত শ্রদ্ধা-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমন্বিত দৃঢ় যুক্তির প্রভাবে বিচলিত হতে পারেন। মধ্যম ভক্তের মতো তিনিও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তর্ক করতে এবং প্রমাণ করতে পারেন না, কিন্তু মধ্যম অধিকারী ভক্তের মতো অবিচলিত শ্রদ্ধা তাঁর নেই। তাই তাঁকে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলা হয়।

কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত সম্বন্ধে আরও বিশদ বিবরণ *ভগবদ্গীতায়* রয়েছে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার ধরনের মানুষ তাঁদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভগবদ্ভক্তি আচরণ করতে শুরু করেন এবং ভগবৎ-মুখী হন। তিনি কোন মন্দিরে গিয়ে ভগবানের কাছে কষ্ট নিবারণ, অর্থপ্রাপ্তি অথবা জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা করেন। শুধুমাত্র ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত জ্ঞানও কনিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে তাঁরা মধ্যম অথবা উত্তম ভক্তে পরিণত হতে পারেন।

মহারাজ ধ্রুব কনিষ্ঠ ভক্তের অন্যতম উদাহরণ। তিনি তাঁর পিতার রাজ্য লাভ করতে ইচ্ছা করেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভক্তিযোগে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অবশেষে পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়ার পর, তিনি ভগবানের কাছে কোন লৌকিক বর প্রার্থনা করতে অস্বীকার করেন। তেমনই, সংকটের সময় গজেন্দ্র আত্মরক্ষা করার জন্য ভগবানকে ডাকেন, অবশেষে তিনিও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চার কুমারেরাও জ্ঞানী সন্তপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদেরও ঠিক তেমনই হয়েছিল। তাঁরা জিজ্ঞাসু ছিলেন এবং সূত গোস্বামীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করার ফলে তাঁরাও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। সুতরাং আত্ম-উন্নতি করার এটিই হচ্ছে পন্থা। যে অবস্থাতেই

মানুষ থাকুক না কেন, তিনি যদি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার সৌভাগ্য লাভ করেন, তা হলে অচিরেই তিনি মধ্যম অধিকারী বা উত্তম অধিকারী ভক্তের পর্যায়ে উন্নীত হন।

এই চার রকমের ভক্তের বর্ণনা *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে করা হয়েছে; এদের সকলকেই পুণ্যাত্মা বলা হয়েছে। পুণ্যাত্মা না হলে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যিনি নিরন্তর পুণ্যকর্ম করছেন এবং যাঁর সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়েছে, তিনি ভক্তিভরে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন, অন্য কেউ পারে না। পুণ্যকর্মের ক্রম অনুসারে কনিষ্ঠ ভক্তদের আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। পুণ্যাত্মা না হলে আর্ত মানুষ নাস্তিক অথবা কমিউনিস্টে পরিণত হন। ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস জন্মায় না। তিনি মনে করেন যে, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস বর্জন করলেই তাঁর সব রকমের কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, এই চার রকম কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের আসক্তি কোন লৌকিক লাভের জন্য নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের আসক্তি কষ্ট নিবারণ বা ধনপ্রাপ্তি ইত্যাদি প্রতিদানের আশায় নয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, প্রথম থেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের আসক্তির কারণ প্রেম। অধিকন্তু, জ্ঞানচর্চা ও শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

*ভবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, বহু বহু জন্মের পরে কেউ যখন যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি যথাযথভাবে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের পরম কারণ বলে উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর শরণাগত হন। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলকে একমাত্র আশ্রয়রূপে উপলব্ধি করতে পারেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি তাঁর প্রেম প্রগাঢ় হতে থাকে। যদিও এই ধরনের জ্ঞানীভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তবুও আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তদেরও মহাত্মারূপে গণ্য করা হয়েছে, কারণ শান্তির অন্বেষণে তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন।

জ্ঞানী না হলে ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্তে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। যারা নির্বোধ বা যাদের জ্ঞান মায়ার প্রভাবে অপহৃত, তারা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি আসক্ত হয়। জ্ঞানী হচ্ছেন তিনি, যিনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাঁর জড় দেহটি তাঁর স্বরূপ নয়, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে তাঁর চিন্ময় আত্মা। যেহেতু তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাঁর যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম আত্মা, তাই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হওয়া উচিত, তাঁর দেহের সঙ্গে নয়। আর্ত ও অর্থার্থী দেহাত্মবুদ্ধি যুক্ত, কারণ দুঃখ

নিবৃত্তি ও ধনপ্রাপ্তির বাসনা দেহজাত। জিজ্ঞাসু পুরুষ অবশ্য আর্ত ও অর্থার্থী থেকে একটু উন্নত স্তরে রয়েছেন, কিন্তু তা হলেও তিনি প্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে অনন্য ভক্তির অভিলাষী জ্ঞানী পূর্ণরূপে জানেন যে, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম। তিনি এটিও জানেন যে, আত্মা অধীন ও অণুসদৃশ হওয়ার ফলে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই অনন্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এটিই হচ্ছে জ্ঞানীর সম্পর্ক।

এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত পুরুষই শুদ্ধ ভক্তিযোগের অধিকারী। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রহ্মভূত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হয়ে যখন কোন ব্যক্তি প্রসন্ন হন এবং সব রকমের প্রাকৃত উদ্বেগ থেকে মুক্ত হন, তখনই তিনি ভক্তিযোগে প্রবেশ করার অধিকারী হন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আনন্দের অনুভূতি তিন প্রকারের—জড় আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও ভগবদ্ভক্তির আনন্দ। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাকৃত বাসনা থাকে, ততক্ষণ ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না এবং ভক্তিপ্রসূত আনন্দ উপভোগ করা যায় না। বিষয় ভোগের বাসনা ও ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা উভয়ই প্রাকৃত। ভগবানের সঙ্গ ও ভগবানের সঙ্গে প্রেমের বিনিময়ে যে দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়, তার মহিমা নির্বিশেষবাদীরা জানে না, তাই ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াই হচ্ছে তাঁদের পরম প্রাপ্তি। এই বিচার বিষয় বাসনারই সূক্ষ্ম রূপ। প্রাকৃত জগতে প্রতিটি মানুষই সর্বোত্তম বা সর্বপ্রধান হবার চেষ্টা করছে। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সে তার জাতি, সমাজ ও তার দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার এই অভিলাষ যখন অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তখন সে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় বা ভগবান হতে চায়। এটিই হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সূক্ষ্ম প্রকাশ।

কিন্তু যথার্থ আত্মপ্রকাশ হচ্ছে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া, যার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। জীব অণুসদৃশ এবং কোন অবস্থাতেই যে সে ভগবান হতে পারবে না, সেটি সকলেরই জানা উচিত। সুতরাং যে মানুষ বৈষয়িক বা আধ্যাত্মিক স্তরে মহৎ থেকে মহত্তর হয়ে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করে, সে কখনই ভগবদ্ভক্তির মধুর রস আস্বাদন করতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই ভুক্তি অর্থাৎ জড় সুখভোগ এবং মুক্তি অর্থাৎ জড় ভোগ ত্যাগের বাসনাকে পিশাচী ভর করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুটিই ক্লেশদায়ক। ভুক্তির অর্থ হচ্ছে জড় সুখভোগ এবং মুক্তির অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়া এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এই বাসনাগুলিকে ভূতে পাওয়া বা পিশাচী ভর করার সঙ্গে

তুলনা করা হয়েছে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়সুখ অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তির দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা যায় না।

শুদ্ধ ভক্ত কখনই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন—"হে নন্দকুমার! অসীম ঐশ্বর্য, অসংখ্য অনুগামী ও অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী—এই বিষয়-সুখগুলির কোনটিই আমি চাই না, এমন কি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতেও আমি চাই না। আমার একমাত্র কামনা হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরে যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার অনন্য ভক্তি থাকে, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

শুদ্ধ ভক্তের চিত্ত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ইত্যাদির মহিমা কীর্তনে এতই আকৃষ্ট থাকে যে, তিনি মুক্তি লাভের কোন রকম আকাঙ্ক্ষা করেন না। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, "হে প্রাণপ্রিয় প্রভু! আমি যখন ভক্তিভরে তোমার সেবায় যুক্ত হই, তখন সর্বত্রই আমি তোমাকে দর্শন করতে পারি। আর মুক্তি তখন করজোড়ে আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার সেবা করার সুযোগের প্রতীক্ষা করে।" তাই শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য মহত্ত্বপূর্ণ নয়।

এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/৩৬) ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে উপদেশ দিয়েছেন—"হে মাতঃ! আমার শুদ্ধ ভক্ত আমার বিভিন্ন রূপ, আমার মাধুর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল ও আমার অবয়ব দর্শন করে মুগ্ধ হন। আমার হাস্য, আমার ক্রীড়া, আমার কটাক্ষ তাদের কাছে এত মধুর বলে মনে হয় যে, তাদের চিত্ত সর্বদাই আমার ভাবনায় মগ্ন থাকে, এবং তাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে আমার চরণে অর্পণ করে। যদিও তারা কোন রকম মোক্ষসুখ বা প্রাকৃত সুখ কামনা করে না, কিন্তু তবুও আমি তাদের আমার পরম ধামে আমার পার্ষদত্ব দান করি।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* এই প্রমাণের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তরা নিঃসংশয় হয় যে, ভগবানের সঙ্গ তারা অবশ্যই লাভ করবে। এই সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল অথবা তাঁর সেবার মধুরিমার প্রতি যিনি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং সেই আকর্ষণের ফলে যাঁর চিত্ত নিরন্তর দিব্য আনন্দে মগ্ন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি লাভেরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, যদিও সেই মুক্তি নির্বিশেষবাদীদের কাছে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ।

সেই একই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/৪/১৫) উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন—"হে প্রভু! যে সমস্ত মানুষ তোমার চরণ-কমলের প্রতি দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের কোনই বাসনা থাকে না। যদিও তাঁরা অনায়াসে এগুলির

মাধ্যমে সুখ লাভ করতে পারেন। এগুলির মাধ্যমে সুখভোগের সম্ভাবনা থাকলেও আমি এই সমস্ত ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে যে, তোমার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আমার যেন অনন্য ভক্তি থাকে।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২৫/৩৪) আর একটি শ্লোকেও ভগবান কপিলদেব বলেছেন, "হে মাতঃ! আমার সেবা করার ফলে যে সমস্ত ভক্তের হৃদয় দিব্য আনন্দে মগ্ন, তারা আমার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত থাকে, বিশেষ করে যারা সংকীর্তনের মাধ্যমে আমার নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি উপলব্ধি করার চেষ্টা করে এবং আমার মহিমা কীর্তন করে, তারা দিব্য পরমানন্দের সমুদ্রে মগ্ন থাকে, সেই সমস্ত ভাগ্যবান ভক্তরা কখনও আমার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করে না। আমার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, আমি যখন তাদের আমার ধামে আমার মতো পদ, আমার মতো ঐশ্বর্য, আমার সাহচর্য অথবা আমার মতো রূপ দান করতে চাই, তখন তারা তাও গ্রহণ করতে চায় না। আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়ার ফলে তারা যে দিব্য আনন্দে মগ্ন থাকে, তার কাছে এই সমস্ত মুক্তি অত্যন্ত নগণ্য হয়ে যায়।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৯/১০) ধ্রুব মহারাজও বলছেন, "হে পরম প্রিয় ভগবান! আপনার চরণকমলের ধ্যানে মগ্ন থাকার ফলে মানুষ যে দিব্য আনন্দ অনুভব করে, তার সঙ্গে নির্বিশেষবাদীদের ব্রহ্ম-সাযুজ্যের আনন্দের কোন তুলনা হয় না। আর যে সমস্ত সকাম কর্মী উচ্চতর স্বর্গলোকে যাওয়ার বাসনা করছে, তারা কিভাবে আপনাকে জানতে পারবে, ভক্তরা যে দিব্য আনন্দ উপভোগ করে, সেই আনন্দের স্বাদ তারা কোথা থেকে পাবে?"

## চতুর্থ অধ্যায়

# ভক্তির কাছে সব রকমের মুক্তি অতি তুচ্ছ

ভগবানের ভক্ত ভগবানের প্রতি যে কতটা অনুরক্ত হয়েছে, তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/২০/২৪) বর্ণিত মহারাজ পৃথুর উক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন, "হে প্রিয় প্রাণনাথ! মুক্তি লাভের পর যদি তোমার মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ আমি না পাই, তোমার শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উদ্‌গত হয় তোমার যে মহিমা, সেই পরম অমৃত আস্বাদন করার সুযোগ যদি আমি না পাই, তা হলে সেই মুক্তি আমি কখনই কামনা করি না। আমি তথাকথিত আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াস করি না। তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, আমি যেন লক্ষ কোটি জিহ্বা ও লক্ষ কোটি কর্ণ প্রাপ্ত হই, যাতে আমি নিরন্তর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত তোমার অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের মহিমা কীর্তন করতে পারি এবং আমার কর্ণকুহরের মাধ্যমে আমি যেন নিরন্তর সেই অমৃত আস্বাদন করতে পারি।"

নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, কিন্তু তাদের যদি স্বতন্ত্র সত্তা না থাকে, ব্যক্তিত্ব না থাকে, তা হলে তারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাকীর্তন করতে পারে না এবং শ্রবণ করতে পারে না। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করার এবং শ্রবণ করার কোন সুযোগ তাদের নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বিশেষ মুক্তির স্তর অতিক্রম করে ভগবদ্ভক্তির স্তরে প্রবেশ করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা আস্বাদন করা যায় না, এবং ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় না।

এই রকম আর একটি বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৪/৪৪) রয়েছে। পরীক্ষিৎ মহারাজকে শুকদেব গোস্বামী বলছেন, "মহারাজ ভরতের আত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এত আকুল ছিল যে, তিনি অনায়াসে এই সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য, সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন—এই সব কিছুর আসক্তি অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি এত সৌভাগ্যশালী ছিলেন যে, ঐশ্বর্যলক্ষ্মী তাঁকে সব কিছু দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোন রকম জড় ঐশ্বর্য

গ্রহণ করেননি।" শুকদেব গোস্বামী ভরত মহারাজের এই সমস্ত গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পরমেশ্বর ভগবান মধুসূদনের অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রতি যাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁর জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তির কথা তো দূরে থাক, তিনি বহু মহর্ষির ঈপ্সিত মুক্তি পর্যন্তও কামনা করেন না।"

বৃত্রাসুরেরও এই রকম একটি উক্তি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১১/২৫) রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানকে সম্বোধন করে বৃত্রাসুর বলছেন—"হে প্রিয় প্রভু! তোমার অপ্রাকৃত সেবা ত্যাগ করে আমি ধ্রুবলোকে উন্নীত হতে পারি অথবা আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করতে পারি, কিন্তু আমি এগুলি কিছুই চাই না। আমি যোগসিদ্ধিও চাই না, আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতেও চাই না। আমার একমাত্র কামনা হচ্ছে, আমি যেন তোমার সঙ্গ থেকে এবং তোমার সেবা থেকে কখনও বঞ্চিত না হই।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৭/২৮) মহাদেবেরও এই রকম একটি উক্তি আছে। সতীকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন—"প্রিয়ে সতী, যাঁরা নারায়ণের ভক্ত, তাঁরা কোন কিছুতেই ভীত হন না। তাঁরা যদি উচ্চলোকে উন্নীত হন, অথবা যদি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন, অথবা তাঁরা যদি নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হন, যে পরিবেশেই থাকুন না কেন, তাঁরা কোন কিছুতেই ভীত হন না। কারণ তাঁরা নারায়ণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে এই জড় জগতের যে কোন অবস্থাই অন্য যে কোন অবস্থার মতোই আনন্দময়।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৮/৭৪) দেবরাজ ইন্দ্রেরও এমন একটি উক্তি রয়েছে। ইন্দ্র তাঁর মাতা অদিতিকে সম্বোধন করে বলছেন, "হে মাতঃ, যে সমস্ত মানুষ সব রকম কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা জানেন তাঁদের যথার্থ স্বার্থ কি। এই ধরনের মানুষেরা যথার্থ মঙ্গল সাধন করছেন এবং জীবনের পরম সিদ্ধি লাভের পথে তাঁরা পরম দক্ষতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৬/২৫) প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, "হে দৈত্যকুলজাত আমার বন্ধুগণ, তোমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করতে পার, তা হলে তার থেকে দুষ্প্রাপ্য আর কিছু নেই। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তা হলে তোমাদের হৃদয়-অভ্যন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। পার্থিব উন্নতি সাধনের কি প্রয়োজন? প্রকৃতির নিয়মেই তা লাভ হয়। আর মুক্তির প্রয়াসেরই বা কি প্রয়োজন? যদি তোমরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করো, নিরন্তর তাঁর পাদপঙ্কজের অমৃত আস্বাদন করো, তখন আর এগুলির কোন প্রয়োজন থাকে না।" প্রহ্লাদ

মহারাজের এই উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যে ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার আনন্দে মগ্ন হয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যে সব রকমের জড় সিদ্ধির স্তর অতিক্রম করে গেছেন। এমন কি, তিনি পুণ্যকর্মের সমস্ত ফলও অতিক্রম করে গেছেন। তিনি যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, এমন কি মুক্তির স্তরও অতিক্রম করে গেছেন।

তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে (৭/৮/৪২) স্বর্গের দেবতারা যখন নৃসিংহদেবের বন্দনা করছিলেন, ইন্দ্র তখন বলেছিলেন, "হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং আপনি সমস্ত জীবের অধীশ্বর। তাই আপনি সব কিছুর প্রকৃত ঈশ্বর। বহুকাল ধরে আমাদের হৃদয় হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ভীত ছিল। কিন্তু আমাদের প্রতি আপনি এতই কৃপাপরবশ যে, তাকে হত্যা করে আপনি আমাদের হৃদয় থেকে সেই ভয় দূর করেছেন এবং আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, যাতে আমরা আপনাকে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করতে পারি। দৈত্যরা আমাদের থেকে যে সমস্ত সম্পদ অপহরণ করে নিয়েছিল, প্রেমভক্তি সহকারে আপনার সেবায় যুক্ত ভক্তের কাছে তার কোনই মূল্য নেই। ভক্তরা মুক্তিকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন, সুতরাং জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের কি কথা। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞফলের ভোক্তা আমরা নই। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, কেবল আপনারই শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়ে সব কিছু আপনাকে নিবেদন করা, কেন না আপনিই হচ্ছেন সব কিছুর পরম ভোক্তা।"

ইন্দ্রের এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত কেউই জড় ঐশ্বর্যের ভোক্তা নয়। সকলেরই একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানকে উৎসর্গ করা। তার ফলে তাঁরা আপনা থেকেই তার সুফল ভোগ করতে পারেন। এই বিষয়ে পুনরায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের খাদ্য সংগ্রহ করে তা রান্না করে, উদরকে উৎসর্গ করার তুলনা দেওয়া যেতে পারে। উদরকে খাবার দেওয়া হলে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গই সমানভাবে আহারের ফল ভোগ করতে পারে। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সাধন করা, তা হলে সকলেই আপনা থেকে তৃপ্ত হবে।

এই রকম আর একটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৮/৩/২০) রয়েছে, যেখানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে গজেন্দ্র বলছেন, "হে প্রিয় ভগবান! আপনার সেবায় যে দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। তাই আমি আপনার কাছে জড়-জাগতিক সুখ-সুবিধা প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু আমি জানি, যাঁরা শুদ্ধ ভক্ত, যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করে সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা সর্বদাই আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন, এবং সেই জন্যই তাঁরা

সর্বদাই আপনার দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করে পরম তৃপ্তি উপভোগ করেন। তাঁরা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, কোন কিছুর প্রার্থনাও করেন না।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (৯/৪/৬৭) পরমেশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ দুর্বাসাকে বলছেন, "আমার ভক্তরা ভক্তিযোগে আমার সেবায় যুক্ত হয়ে সর্বদাই তৃপ্ত, এবং তাই তারা পাঁচ প্রকার মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষা করে না। সেই পাঁচ প্রকার মুক্তি হচ্ছে—(১) সাযুজ্য মুক্তি, অর্থাৎ আমার সাথে এক হয়ে যাওয়া, (২) সালোক্য, বা আমার লোকে বাস করা, (৩) সার্ষ্টি, বা আমার মতো ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া, (৪) সারূপ্য, অর্থাৎ আমার রূপ লাভ করা, এবং (৫) সামীপ্য, অর্থাৎ আমার সঙ্গ লাভ করা। সুতরাং তারা যখন এই মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষা করে না, তখন তুমি সহজেই অনুমান করতে পার জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি এবং জড় মুক্তির প্রতি তারা কত নিস্পৃহ।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৬/৩৭) নাগপত্নীরা (কালীয় নাগের পত্নীরা) ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন, "হে পরম প্রিয় ভগবান! তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা অপূর্ব মহিমামণ্ডিত। যে মানুষ সেই ধূলিকণা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তিনি স্বর্গলোকের আকাঙ্ক্ষা করেন না, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য কামনা করেন না, যোগসিদ্ধি কামনা করেন না বা জড় জগতের বন্ধন-মুক্তির কামনা করেন না। অর্থাৎ যিনি আপনার চরণকমলের রেণু লাভ করেছেন, তিনি সব রকম সিদ্ধিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৭/২১) শ্রুতিরা অর্থাৎ মূর্তিমান বৈদিক মন্ত্ররা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন, "হে পরম প্রিয় ভগবান! দিব্যজ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। এই অত্যন্ত কঠিন জ্ঞান দান করার জন্যই আপনি আপনার স্বরূপে এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই জন্যই আপনার ভক্তরা পরমহংস আচার্যদের সঙ্গ লাভ করার জন্য গৃহসুখ ত্যাগ করেছেন। তাঁরা এখন ভক্তিযোগে সম্পূর্ণরূপে আপনার সেবায় যুক্ত হয়েছেন এবং তাই তাঁরা আর তথাকথিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না।"

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, আত্মজ্ঞান লাভ করার অর্থ হচ্ছে আত্মাকে জানা এবং পরমাত্মা বা ভগবানকে জানা। আত্মা ও পরমাত্মা গুণগতভাবে অভিন্ন এবং সেই জন্যই উভয়কে ব্রহ্ম বলে সম্বোধন করা হয়। সেই আত্মজ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত বড় বড় দার্শনিকেরা আত্মাকে জানার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেই জ্ঞান লাভের পথে তাঁরা মোটেই অগ্রসর হতে পারছেন না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র একজন এই জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন এবং এই রকম লক্ষ লক্ষ জ্ঞানলাভেচ্ছু মানুষের মধ্যে কেবল

দুই-একজন মাত্র যথাযথভাবে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আত্মজ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সহজলভ্য করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কৃষ্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হন, এবং ব্যক্তিগতভাবে অর্জুনের মতো পার্ষদকে এই জ্ঞান দান করেন, যাতে জনসাধারণ এই জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই শ্লোকে আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে সব রকম জড়-জাগতিক সুখভোগের স্পৃহা পরিত্যাগ করা। যারা নির্বিশেষবাদী তারা কেবল জড় পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়েই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করে দিব্য আনন্দে মগ্ন হন, তখন জড় বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্তি লাভ হয়।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/৩৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন — "প্রিয় উদ্ধব, যে সমস্ত ভক্ত সর্বতোভাবে আমার সেবার আস্বাদ গ্রহণ করেছে, তারা এত দৃঢ়ভাবে ভক্তিযোগ যুক্ত যে, তাদের আর কোন কামনা-বাসনা থাকে না। তাদের যদি চার প্রকার চিন্ময় ঐশ্বর্য প্রদান করা হয়, তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সুতরাং জড় জগতে তাদের কাম্য কি থাকতে পারে?" তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতের* আর এক জায়গায় (১১/১৪/১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "হে প্রিয় উদ্ধব, যার চিত্ত আমার চিন্তায় এবং আমার সেবায় মগ্ন, সে ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ ও সার্বভৌমপদ বা আট রকমের যোগসিদ্ধি ও মুক্তি পর্যন্ত কামনা করে না।" *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে, দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে মহাদেব দেবীকে বলছেন — "হে দেবী, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করেছেন এবং তাই তিনি আর কোন রকম বর লাভের, এমন কি মুক্তিরও প্রত্যাশী নন।"

*পদ্ম-পুরাণেও* কার্তিক ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার সময় এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করা হয়েছে। কার্তিক মাসে বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দামোদর রূপের উপাসনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দামোদর রূপ শ্রীকৃষ্ণের সেই বাল্যলীলার দ্যোতক, যখন তাঁর মা যশোদা তাঁকে বাঁধতে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণের চাঞ্চল্যে রুষ্ট হয়ে মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন, তাই তাঁর আর একটি নাম দামোদর। 'দাম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে দড়ি এবং মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদর দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন বলে তাঁর নাম দামোদর। কার্তিক মাসে ভগবান দামোদরকে প্রার্থনা করে বলা হয়, "হে প্রিয় প্রভু! আপনি হচ্ছেন সমস্ত বরদাতাদের ঈশ্বর।" ব্রহ্মা ও শিব আদি দেবতারা কখনও কখনও তাঁদের ভক্তদের বর দান করে থাকেন। যেমন শিব রাবণকে অনেক বর দান করেছিলেন, এবং ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে বর দান করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বরের উপর নির্ভরশীল। তাই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত বরদানকারীদের ঈশ্বর বলে সম্বোধন

করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে তাঁর ভক্তদের সব কিছু দিতে পারেন, কিন্তু তবুও তাঁর ভক্ত তাঁর কাছে কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না। "আমি জড়-জাগতিক সুখভোগ থেকে শুরু করে মোক্ষলাভ পর্যন্ত কোন বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি না। আমি শুধু আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি আপনার এই দামোদর রূপ সর্বক্ষণ দর্শন করতে পারি। আপনার রূপ এতই মাধুর্যমণ্ডিত ও চিত্তাকর্ষক যে, আপনার এই রূপ ছাড়া আমার মন আর কিছু চায় না।" এই প্রার্থনায় আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "হে প্রিয় প্রভু দামোদর! এক সময়ে আপনি যখন নন্দ মহারাজের প্রাঙ্গণে একটি চঞ্চল শিশুর মতো খেলা করতে করতে দধিভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলেন, এবং সেই জন্য মা যশোদা একটি দড়ি দিয়ে আপনাকে উদূখলের সঙ্গে বেঁধে রাখেন, তখন আপনি নন্দ মহারাজের অঙ্গনে বিরাজমান কুবেরের দুই পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীবকে উদ্ধার করেছিলেন। আমার একমাত্র প্রার্থনা, আপনি যেন আপনার কৃপাময়ী লীলা-বিলাসকালে আমাকেও সেইভাবে উদ্ধার করেন।"

এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত ঘটনাটি হচ্ছে যে, দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের দুই পুত্র তাদের পিতার ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়েছিল। এক সময়ে তারা স্বর্গের অপ্সরাদের সঙ্গে নগ্ন হয়ে একটি সরোবরে ক্রীড়া করছিল। মহামুনি নারদ তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুবেরের পুত্রদের এই অভদ্র আচরণ দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। নারদ মুনিকে দেখে অপ্সরারা তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা তাদের শরীর আচ্ছাদিত করেছিল, কিন্তু মদ্যপ কুবের-পুত্ররা নেশায় এত আচ্ছন্ন ছিল যে, নারদ মুনিকে দেখেও তারা কোন রকম লজ্জা অনুভব করল না। তাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে নারদ মুনি তাদের অভিশাপ দিলেন, "তোমরা সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গেছ, তাই কুবের-পুত্র হওয়ার পরিবর্তে তোমরা বৃক্ষ হয়ে জন্ম গ্রহণ কর।" নারদ মুনির দ্বারা এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে কুবের-পুত্রদের চেতনা হল, এবং দেবর্ষি নারদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। তখন নারদ তাদের বললেন, "দুটি অর্জুন বৃক্ষরূপে নন্দ মহারাজের অঙ্গনে তোমরা জন্মগ্রহণ করবে। নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে কৃষ্ণ যখন প্রকট হবেন, তখন তিনি তোমাদের উদ্ধার করবেন।" প্রকারান্তরে নারদ মুনির অভিশাপ বরে পরিণত হল, কারণ এই অভিশাপের ফলে কুবের পুত্রদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের সুযোগ পেল। কুবের-পুত্ররা তখন নন্দ মহারাজের অঙ্গনে যমলার্জুনরূপে জন্মগ্রহণ করল। ভক্ত নারদ মুনির বাণীর সত্যতা বজায় রাখার জন্য ভগবান দামোদর উদূখল দিয়ে সেই বৃক্ষ দুটিকে উৎপাটন করে তাদের উদ্ধার করেন। তার ফলে নলকূবর ও মণিগ্রীব ভগবানের দর্শন লাভ করে ভগবানের কৃপাভাজন হয়ে মহাভাগবতে পরিণত হলেন এবং উৎপাটিত বৃক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে তারা ভগবান শ্রীদামোদরের প্রার্থনা করতে লাগলেন।

*হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে* একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, "হে পরম প্রিয় পরমেশ্বর ভগবান! ধর্ম আচরণ করার জন্য আমি কোন বর প্রার্থনা করি না, আমি অর্থনৈতিক উন্নতিও কামনা করি না, আমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ চাই না এবং মোক্ষও কামনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে যে, আমি যেন চিরকাল আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত থাকতে পারি। কৃপা করে আপনি আমাকে সেই বর প্রদান করুন।"

*হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে* আর এক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে বর দান করতে চাইলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ কোন রকম জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা না করে কেবল তাঁর নিত্য সেবক হবার বর প্রার্থনা করেছিলেন। সেই সম্পর্কে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য দাস হনুমানের উদাহরণ দিয়েছিলেন। হনুমানও ভগবানের কাছ থেকে কোন প্রাকৃত বর প্রার্থনা না করার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবৎসেবা-পরায়ণ ছিলেন। এই আদর্শ গুণের জন্য আজও হনুমান সমস্ত ভক্তদের আরাধ্য। প্রহ্লাদ মহারাজও হনুমানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন। একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে হনুমান বলেছেন, "হে ভগবান! তুমি যদি চাও তা হলে আমাকে এই ভববন্ধন থেকে মুক্ত করতে পার, অথবা তোমাতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি দান করতে পার, কিন্তু আমি এগুলি কামনা করি না। তোমার সঙ্গে আমার যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক, মুক্তির ফলে সেই সম্পর্ক যদি শিথিল হয়ে যায়, তা হলে সেই মুক্তি আমি কামনা করি না।"

*নারদ-পঞ্চরাত্রে* এই রকম অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "হে ভগবান, আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের লেশমাত্র কামনা করি না, তোমার লোকে বাস করার 'সালোক্য মুক্তি' অথবা তোমার মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়ার 'সারূপ্য মুক্তি' ইত্যাদি কোন রকম মুক্তি আমি প্রার্থনা করি না। আমি কেবল প্রার্থনা করি, যেন নিত্যকাল আমি তোমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৪/৫) মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন, "হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি বুঝতে পারছি যে, বৃত্রাসুর ছিল মহাপাপী ও তার মনোবৃত্তি রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু তা হলেও কিভাবে তার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির এই রকম পূর্ণ বিকাশ হল? আমি শুনেছি যে, কঠোর তপস্যা করেও সিদ্ধযোগী ও পূর্ণজ্ঞানী মুক্ত পুরুষদেরও ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য সাধন করতে হয়। এই ধরনের ভগবদ্ভক্ত নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ। তাই আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, বৃত্রাসুর কিভাবে ভগবানের ভক্তপদ লাভ করল!"

উপরোক্ত শ্লোকের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে যে, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া অসংখ্য মুক্ত পুরুষের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ, কোটি

কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে কোন একজন ভাগ্যবান কেবল ভগবদ্ভক্ত হতে পারেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৮/২০) শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দেওয়ার সময় কুন্তীদেবী প্রার্থনা করছেন, "প্রভু! বড় বড় বিদ্বান ও পরমহংসরাও তোমার অপার মহিমা সম্বন্ধে অবগত হতে পারে না। নির্মলচিত্ত মুনিরাও যখন তোমাকে জানতে পারে না, তখন আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমার কীর্তি জানতে পারবে? আমরা কিভাবে তোমার মহিমা সম্বন্ধে অবগত হতে পারব?" এই শ্লোকে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে যে, মহান জ্ঞানী ও মুক্ত পুরুষেরাও ভগবানকে জানতে পারেন না। কুন্তীদেবীর মতো বিনয়ী ভক্তরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন স্ত্রী এবং স্বাভাবিকভাবে পুরুষদের থেকে অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন, কিন্তু তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/১০) 'আত্মারাম' নামক একটি শ্লোক অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। এই 'আত্মারাম' শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রাকৃত বন্ধন থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'আত্মারাম' মুক্ত পুরুষেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যগুণের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মুক্ত পুরুষদের জড় সুখভোগের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না, তাঁরা সব রকম জড় কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, কিন্তু তবুও তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ ও উপলব্ধি করার আকর্ষণ প্রতিহত করতে পারেন না। তার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা ও লীলা প্রাকৃত নয়। তা না হলে মুক্ত পুরুষেরা, যাঁদের 'আত্মারাম' বলা হয়, তাঁরা কেন এই লীলার প্রতি আকৃষ্ট হবেন? সেটি হচ্ছে এই শ্লোকের বক্তব্য।

মুক্তি পাঁচ রকমের, যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে—(১) সাযুজ্য, (২) সালোক্য, (৩) সারূপ্য, (৪) সার্ষ্টি, (৫) সামীপ্য। এই পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে ভক্ত কখনই 'সাযুজ্য' মুক্তি গ্রহণ করেন না। অন্য চার রকম মুক্তি যদিও ভক্তরা কামনা করেন না, কিন্তু সেগুলি ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল নয়। এই চার প্রকার মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষেরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অপ্রাকৃত জগতে গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যাঁরা ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছেন এবং এই চার রকমের মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁদের চিত্তেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের উদয় হতে পারে এবং তার ফলে তাঁরা কৃষ্ণলোকে উন্নীত হতে পারেন।

সুতরাং এই চার রকম মুক্ত পুরুষেরাও জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। প্রথমে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে পারেন,

কিন্তু পরিপক্ক অবস্থায় তাঁদের হৃদয়ে বৃন্দাবনের শুদ্ধ নির্মল কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, যা সুপ্ত অবস্থায় তাঁদের মধ্যে ছিল। অতএব শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তির অনুকূল হলে অন্য চার রকমের মুক্তি কদাচিৎ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কখনও সাযুজ্য মুক্তি কামনা করেন না।

নানা রকম ভগবদ্ভক্তের মধ্যে তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম, যিনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের 'স্বয়ংরূপ'-এর প্রতি আসক্ত। এই ধরনের ভক্তরা কখনও বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন না, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকার প্রতিও তাঁরা আকৃষ্ট নন। শ্রীল রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের গোকুল বা বৃন্দাবন-লীলার প্রতি আসক্ত, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বোত্তম ভক্ত।

ভগবদ্ভক্ত ভগবানের কোন বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, তিনি আর অন্য কোন রূপের প্রতি আসক্ত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রামভক্ত হনুমান জানতেন যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবান শ্রীনারায়ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু তবুও তিনি কেবল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবারই অভিলাষী ছিলেন। তার কারণ হচ্ছে ভগবানের বিশেষ রূপের প্রতি ভক্তের বিশিষ্ট রুচি। ভগবানের অনন্ত রূপ রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ হচ্ছে তাঁর 'স্বয়ংরূপ'। যদিও ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপের সমস্ত ভক্তরা সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু তবুও শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

## পঞ্চম অধ্যায়

# ভগবদ্ভক্তির পবিত্রতা

শ্রীল রূপ গোস্বামী পূর্বে বিস্তারিতভাবে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন তার সারমর্ম হচ্ছে—যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়ভোগ করার বাসনা অথবা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তির জগতে প্রবেশ করা যায় না। তারপর শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, ভগবদ্ভক্তি সব রকম বৈষয়িক বিচারের ঊর্ধ্বে এবং তা কোন রাষ্ট্র, জাতি, সমাজ অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি জীবেরই তাতে অধিকার রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, ভগবদ্ভক্তি জড়-জাগতিক স্তরের ঊর্ধ্বে অপ্রাকৃত স্তরের চিন্ময় বস্তু এবং তা কোন জড়-জাগতিক কারণের অধীন নয়। কোন রকম লাভের আশা না করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হয় এবং কোন রকম প্রাকৃত পরিস্থিতি তাকে প্রতিহত করতে পারে না। কোন রকম ভেদভাব ব্যতীত সকলেরই তাতে অধিকার আছে এবং তা হচ্ছে প্রতিটি জীবেরই স্বাভাবিক বৃত্তি।

মধ্যযুগে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর, এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত মানুষ নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামী জাতি বলে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকে। তারা দাবি করতে থাকে যে, ভগবদ্ভক্তির সাধন ও প্রচারের অধিকার কেবল তাদেরই রয়েছে। এইভাবে কিছুদিন ধরে তারা তাদের কৃত্রিম একাধিপত্য চালাতে থাকে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাদের সেই বিচারকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। সেই জন্য প্রথম দিকে তাঁকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়, কিন্তু অবশেষে তিনি সফল হন এবং এখন যথাযথভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে যে, ভক্তির অধিকার কোন বিশেষ জাতির মধ্যে সীমিত নয়। আর তা ছাড়া, যিনি ভক্তিমার্গে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই সর্বোত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির আন্দোলনে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সংগ্রাম সার্থক হয়েছে।

তাঁর সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আজ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে তথা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও প্রান্ত থেকে, যে কোনও জীব বৈষ্ণব হওয়ার সুযোগ লাভ করছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং তাই তাঁরা

ইতিমধ্যেই জড় জগতের সর্বোত্তম গুণ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। পাশ্চাত্য জগতে আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর আজ্ঞায় আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এই আন্দোলনে যোগদান করার সুযোগ দিচ্ছি। তথাকথিত কিছু ব্রাহ্মণ বলে যে, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হলে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে উন্নত স্তরের বৈষ্ণব হওয়া যায় না। এই সমস্ত মতবাদ আমরা স্বীকার করি না, কারণ এই ধরনের বিচার শ্রীল রূপ গোস্বামী অনুমোদন করেননি এবং বৈদিক শাস্ত্রেও তা অনুমোদন করা হয়নি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভক্তিযোগ অবলম্বন করে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করার অধিকার প্রতিটি জীবেরই রয়েছে। সেই সম্বন্ধে তিনি শাস্ত্র থেকে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। তার মধ্যে *পদ্ম-পুরাণের* একটি শ্লোক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেখানে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দিলীপকে বলেছেন, "হে রাজন, মাঘ মাসের সকালে স্নান করার অধিকার যেমন সকলেরই রয়েছে, ঠিক তেমনই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার অধিকার সকলেরই আছে।" যেমন *স্কন্দ-পুরাণের* কাশী খণ্ডেও এই তথ্যের প্রমাণ প্রদর্শন করে বলা হয়েছে, "ময়ূরধ্বজ নামক দেশে শূদ্রদের থেকেও নীচ অন্ত্যজ কুলোদ্ভূত মানুষেরাও দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন, এবং দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ও কণ্ঠিমালায় ভূষিত হন। এইভাবে যখন বৈষ্ণবসাজে সজ্জিত হয়ে তাঁরা জপমালায় জপ করেন, তখন মনে হয় তাঁরা যেন বৈকুণ্ঠলোক থেকে এসেছেন। অর্থাৎ, তখন তাঁদের দেখেই বোঝা যায় যে, তাঁরা ইতিমধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণত্বের স্তর অতিক্রম করেছেন।"

এইভাবে বৈষ্ণব স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীও এই বিচারের সমর্থন করেছেন। তাঁর রচিত *হরিভক্তি-বিলাস* নামক গ্রন্থ হচ্ছে বৈষ্ণব সমাজের পথপ্রদর্শক। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পারার মিশ্রণে কাঁসা যেমন সোনা হয়ে যায়, ঠিক তেমনই কেউ যখন যথাযথভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন, তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণত্বে পরিণত হন। যথাযথ পরম্পরার ধারায় সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে যে কেউ বৈষ্ণব হতে পারেন এবং তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণত্বের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী সাবধান করে দিয়েছেন যে, কেউ যেন সদ্গুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েই মনে না করেন যে, এই দীক্ষা গ্রহণের ফলে তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদিত হয়েছে। দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পরেও সকলকেই খুব সাবধানতার সঙ্গে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করতে হয়। সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা

নেওয়ার পর যদি কেউ যথাযথভাবে বিধি-নিষেধগুলির অনুশীলন না করেন, তা হলে আবার তাঁর অধঃপতন হবে। সকলকেই খুব সাবধানতার সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ এবং তাঁর অংশ হওয়ার ফলে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে, পূর্ণ পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করি, তা হলে আবার আমরা অধঃপতিত হব। পক্ষান্তরে বলা যায়, কেবল দীক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষ উন্নত ব্রাহ্মণে পরিণত হয় না, ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করার ফলে এবং গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুশীলন করার ফলে যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, যদি কেউ নিয়মিতভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে তাঁর অধঃপতনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। দৈবাৎ যদি কখনও অধঃপতন হয়ও, তা হলে বৈষ্ণবকে সেই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। ভক্তিমার্গ থেকে যদি কারও অধঃপতন হয়, তা হলে তাঁকে সেই ভুল সংশোধন করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি পালন করার ফলেই তিনি আবার ভক্তিমার্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। এটিই হচ্ছে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য।

চিন্ময় স্তরে চেতনাকে উন্নীত করার তিনটি পন্থা রয়েছে। সেই পন্থাগুলি হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা, জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। যিনি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে কর্ম অথবা জ্ঞানের লেশ মাত্র নেই। ভক্তিতে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা অথবা আচার-অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা নেই।

এই সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে একটি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। একাদশ স্কন্ধে (১১/২১/২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন, "দোষ ও গুণের নির্ণয় এইভাবে করা যায়—ভক্তিযোগী পুরুষ কখনও সকাম কর্ম অথবা মনোধর্মের আশ্রয় নেন না। আচার্য ও শাস্ত্রের বিধিবিধান অনুসরণ করে ভক্তিমার্গে নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়াই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ।"

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৭) অন্য আর এক জায়গাতে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলেছেন— "যদি কেউ তাঁর স্বধর্ম ত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে তাতে তাঁর কোন দোষ হয় না, এবং সর্ব অবস্থাতেই তিনি নিরাপদ থাকেন। এমন কি, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সময় যদি অসৎ সঙ্গের প্রভাবে তাঁর অধঃপতন হয়

অথবা ভক্তি সাধন হওয়ার পূর্বেই যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তা হলেও তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণভাবনা-বিহীন বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে তাঁর স্বধর্ম অনুষ্ঠান করেন, তা হলেও তিনি মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন না।" অর্থাৎ, যে সমস্ত বদ্ধ জীব জানে না যে, সকাম কর্মের দ্বারা ভববন্ধন কখনও দূর হয় না, তারাই উন্মত্তের মতো ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টায় মগ্ন থাকে, তাদের বারবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধে ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন—"সকাম কর্মী জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয়ে ভগবান বাসুদেবের প্রতি প্রেমভাবের উদয় হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দৃঢ় বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে পারে না।" যে সমস্ত মানুষ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করেন, কিন্তু ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হতে পারেননি, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মনুষ্য-জীবনের পরম সৌভাগ্য হেলায় হারাচ্ছেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১১/৩২) এই সত্য প্রতিপন্ন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—"হে উদ্ধব! যে মানুষ অন্য সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করে পূর্ণরূপে আমার শরণাগত হয় এবং আমার আজ্ঞা পালন করে, সে-ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।" পরমেশ্বর ভগবানের এই উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যে সমস্ত মানুষ দাতব্য, নৈতিক, পরহিতবাদী, রাজনৈতিক ও সমাজ-কল্যাণ কার্যকলাপে আসক্ত, জড়-জাগতিক বিচারে তাদের খুব ভাল মানুষ বলে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতাদি* প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, যে মানুষ ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কর্ম করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই সিদ্ধান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৪১) আরও দৃঢ়তাপূর্বক প্রতিপন্ন হয়েছে। করভাজন মুনি মহারাজ নিমিকে বলেছেন—"হে রাজন! যে মানুষ বর্ণাশ্রম বিহিত সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে একমাত্র শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি ও পিতৃবর্গের কাছে আর ঋণী থাকেন না, এবং তাঁদের প্রতি তাঁর কোন কর্তব্য থাকে না। তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর আর পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় না। কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে তিনি সব রকম দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন।" এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে, জন্মের সময় থেকেই মানুষ অনেকের কাছে ঋণী থাকেন। তাঁরা ঋষিদের কাছে ঋণী থাকেন, কেন না তাঁদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে তাঁরা জ্ঞান অর্জন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ব্যাসদেব রচিত গ্রন্থ থেকে আমরা জ্ঞান লাভ করছি। ব্যাসদেব আমাদের জন্য সমস্ত *বেদ* লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করার আগে বৈদিক জ্ঞান শ্রৌতপন্থায় প্রবাহিত হত। অর্থাৎ, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ

থেকে বৈদিক জ্ঞান শ্রবণ করে শিষ্য সেই জ্ঞান লাভ করতেন। গ্রন্থপাঠ করার প্রচলন তখন ছিল না। পরবর্তীকালে ব্যাসদেব বিবেচনা করলেন যে, কলিযুগের মানুষ যেহেতু অত্যন্ত অল্প মেধাসম্পন্ন হবে এবং কোন কিছুই মনে রাখতে পারবে না, তাই তিনি কৃপা করে এই যুগের মানুষদের জন্য *পুরাণ*, *বেদান্ত*, *মহাভারত* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* শাস্ত্র গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

শঙ্করাচার্য, গৌতম মুনি, নারদ মুনি আদি বহু ঋষি আছেন, যাঁদের প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কেন না তাঁদের জ্ঞান আমরা আহরণ করি। তেমনই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ কোন বিশেষ পরিবারে আমরা জন্মগ্রহণ করি, উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের সম্পত্তি লাভ করি এবং নানা রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের উদ্দেশ্যে পিণ্ড (ভগবানের প্রসাদ) দান করতে হয়। তেমনই, আমরা জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ, আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমন কি গাভী কুকুর আদি পশুদের কাছেও কৃতজ্ঞ থাকি, কারণ তাদের কাছ থেকে আমরা নানা রকম সেবা উপভোগ করি।

এইভাবে আমরা দেবতাদের কাছে, ঋষিদের কাছে, পিতৃবর্গের কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে, পশুদের কাছে এবং সমগ্র মানব সমাজের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে; তাঁদের সেবা করে সেই সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু যদি কেউ এই সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে অনন্যভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হন, এবং কারও প্রতি তাঁর তখন আর কোন কর্তব্যের বন্ধন থাকে না।

*ভগবদ্গীতাতেও* আশ্বাস প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "হে অর্জুন! সব রকম জড়-জাগতিক ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। তা হলে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, সেই জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না।" কেউ মনে করতে পারে যে, যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে শরণাগত হচ্ছেন, তাই তিনি তাঁর অন্যান্য কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন না। কিন্তু ভগবান বারংবার বলছেন, "ইতস্তত করো না। মনে করো না যে, যেহেতু তুমি অন্যান্য কর্তব্যগুলি ত্যাগ করেছ, তাই তোমার জীবনে কিছু ত্রুটি থেকে যাবে। তুমি সেই রকম মনে করো না। আমি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব।" *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এটিই প্রতিশ্রুতি।

*অগস্ত্য-সংহিতাতেও* বলা হয়েছে, "মুক্ত পুরুষদের যেমন শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করতে হয় না, তেমন, যে-মানুষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁকে আর বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অনুশীলন

করতে হয় না।” পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বা কৃষ্ণচন্দ্রের ভক্তরা ইতিমধ্যেই সব রকমের জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন, এবং তাঁদের আর শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অনুশীলন করতে হয় না।

তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে করভাজন মুনি মহারাজ নিমিকে বলছেন, “হে রাজন! যিনি অন্য সমস্ত দেব-দেবীদের পূজা পরিত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ভজন করেন, তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তিনি যদি প্রমাদবশত কোন নিষিদ্ধ কর্মও করে ফেলেন, তা হলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। কারণ তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতি করুণার বশবর্তী হয়ে তাঁর হৃদয়াভ্যন্তর থেকে সেই ভুল সংশোধন করে দেন।” *ভগবদ্গীতার* বহু শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে ভক্তবৎসল অর্থাৎ তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ, এবং তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কোন কারণেই তাঁর ভক্তের পতন হতে পারে না। তিনি সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করেন।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# ভক্তিযোগ সাধনের বিধি

শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর অগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবদের ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রদর্শন করবার জন্য *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থ সংকলন করে বৈষ্ণবদের আচরণীয় অনেক বিধি-বিধানের বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যসূচক, এবং তিনি এখানে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উল্লেখ করবেন, যাতে আমরা লাভবান হতে পারি। শ্রীল রূপ গোস্বামীর এই ভক্তির তাৎপর্য হচ্ছে যে, তিনি বিশদীকরণ না করে মূল সিদ্ধান্তগুলি প্রতিপাদন করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি মুখ্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে, গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ঠিক কিভাবে গুরুর আজ্ঞা পালন করা উচিত, তা হচ্ছে সেই সিদ্ধান্তের বিশদ বিবরণ। যেমন, কেউ তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করছেন, কিন্তু তাঁর গুরুর সেই আদেশ অন্য কোন গুরুর আদেশের থেকে ভিন্ন হতে পারে। এগুলিকে বলা হয় বিশদ বিবরণ। কিন্তু মূলতত্ত্ব—সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক, যদিও তার বিশদ বিবরণ ভিন্ন হতে পারে। শ্রীল রূপ গোস্বামী এখানে সেই সমস্ত তথ্য বিশদভাবে বর্ণনা করতে চান না। তিনি কেবল আমাদের সামনে সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করতে চান।

মূলতত্ত্বকে তিনি নিম্নলিখিত অঙ্গে বিভক্ত করেছেন—(১) সদ্গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করা। (২) গুরুদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে কিভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে হয়, সেই সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা। (৩) শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করা। (৪) গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। (৫) কিভাবে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে ঐকান্তিকভাবে গুরুদেবের কাছে অনুসন্ধান করা। (৬) পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কোন জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা (অর্থাৎ আমরা যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হই, তখন আমাদের যে কোন প্রিয় বস্তু ত্যাগ করতে এবং কোন অপ্রিয় নিয়ম অঙ্গীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হয়)। (৭) দ্বারকা, বৃন্দাবন আদি ধামে বাস করা। (৮) প্রাকৃত জগৎ থেকে কেবল যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু গ্রহণ করা। (৯) একাদশী ব্রত পালন করা। (১০) আমলকী, অশ্বত্থ আদি পবিত্র বৃক্ষের পূজা করা।

উপরোক্ত এই দশটি অঙ্গ অনুশীলন না করলে সাধন ভক্তির মার্গে উন্নতি লাভ করা যায় না। শ্রীরূপ গোস্বামী ২০টি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের প্রত্যেকটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০টির মধ্যে প্রথম তিনটি—অর্থাৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করা, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া এবং শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর সেবা করা—এই তিনটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

তার পরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি হচ্ছে—(১) বৈষ্ণব তিলকে অঙ্গ ভূষিত করা। (তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৈষ্ণবের অঙ্গে তিলক-চিহ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ মানুষের হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন, বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যাঁকে দেখামাত্রই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। তাই মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বৈষ্ণবের তিলক ধারণ করা কর্তব্য।) (২) তিলক ধারণ করার সাথে সাথে শরীরে 'হরেকৃষ্ণ' আদি নাম লেখা। (৩) শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবের প্রসাদী ফুল ও মালা ধারণ করা। (৪) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে নৃত্য করা। (৫) ভগবানের শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করা মাত্রই দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করা। (৬) ভগবানের শ্রীমন্দিরে দণ্ডায়মান থাকা। (৭) শোভাযাত্রা সহকারে যখন ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তৎক্ষণাৎ সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করা। (এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে, বিশেষ করে সেখানকার বিষ্ণু মন্দিরে মূল বিগ্রহ ছাড়াও একটি ছোট বিগ্রহ থাকে, যাকে বলা হয় 'বিজয়-বিগ্রহ'। এই বিজয়-বিগ্রহকে শোভাযাত্রা সহকারে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কোন কোন মন্দিরে প্রচলিত প্রথা হচ্ছে, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত সিংহাসনে বা পালকিতে করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে শোভাযাত্রা সহকারে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীবিগ্রহের উপর অপূর্ব সুন্দর ছত্র ধারণ করা হয় এবং সেই শোভাযাত্রায় নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। শ্রীবিগ্রহকে যখন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ভক্তরা তাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভগবানকে নানা রকম ভোগ নিবেদন করেন, এবং সকলেই সেই শোভাযাত্রায় ভগবানের অনুগামী হন। সেই দৃশ্য অতীব মনোরম। শ্রীবিগ্রহ যখন বেরিয়ে আসেন, তখন মন্দিরের সেবকেরা ভগবানকে সেই দিনের কার্যকলাপের বিবরণ শোনান। তাঁরা ভগবানকে বলেন যে, কত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে। তার ফলে সকলেই অনুভব করতে পারেন যে, মন্দিরের মালিক হচ্ছেন ভগবান, এবং মন্দিরের সমস্ত পূজারী ও কর্মচারী হচ্ছেন তাঁর সেবক। এই প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন এবং আজও এই প্রথা প্রচলিত আছে। তাই এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যখন শোভাযাত্রায় বের হন, তখন সেই শোভাযাত্রায় তাঁর অনুগামী হওয়া উচিত।) (৮) প্রতিদিন

সকালে ও সন্ধ্যায় অন্তত একবার অথবা দুবার ভগবানের শ্রীমন্দিরে যাওয়া ভক্তের কর্তব্য। (বৃন্দাবনে ভগবানের ভক্তরা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এই প্রথা অনুশীলন করেন। বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তরা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় বিভিন্ন মন্দিরে ভগবানকে দর্শন করতে যান। তাই সেই সময় শহরের সর্বত্র খুব ভিড় থাকে। বৃন্দাবনে প্রায় ৫০০০ মন্দির আছে। অবশ্যই সব কয়টি মন্দিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী গোস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত অন্তত দশ-বারোটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল মন্দিরগুলিতে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে যাওয়া উচিত।) (৯) অন্ততপক্ষে তিনবার ভগবানের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা উচিত (প্রত্যেক মন্দিরেই পরিক্রমা মার্গ থাকে। ভক্ত তার সংকল্প অনুসারে দশ বার বা পনের বার বা আরও অধিক পরিক্রমা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদ গোস্বামীরা প্রতিদিন গোবর্ধন পর্বত প্রদক্ষিণ করতেন।) এবং সমগ্র বৃন্দাবন ধামও পরিক্রমা করা উচিত। (১০) মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ বিধিপূর্বক অর্চন করা উচিত। (আরতি, ভোগ, শৃঙ্গার ইত্যাদির দ্বারা নিয়মিত ভগবানের আরাধনা করা উচিত।) (১১) পরিচর্যা অর্থাৎ ভগবানের তৈজসাদি পরিষ্কার করা, অঙ্গন আদি মার্জন করা, শ্রীবিগ্রহ বেশভূষাদির দ্বারা শোভিত করা ইত্যাদি। (১২) গীত অর্থাৎ একাকী ভগবানের যশকীর্তন করা। (১৩) সংকীর্তন অর্থাৎ অনেক ভক্ত মিলিত হয়ে কীর্তন অথবা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির উচ্চ কীর্তন করা। (১৪) জপ অর্থাৎ মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করা। (১৫) বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে বাক্য এবং মনের দ্বারা নিজ ভাব নিবেদন করা। (১৬) স্তব পাঠ করা। (১৭) ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ আস্বাদন করা। (১৮) পাদ্য অর্থাৎ ভগবানের পাদোদক আস্বাদন করা। (১৯) ভগবানকে নিবেদিত ধূপ, মাল্য ইত্যাদির সুগন্ধ আঘ্রাণ করা। (২০) ভগবানের শ্রীমূর্তি স্পর্শ করা। (২১) ভক্তিভরে ভগবানের শ্রীমূর্তি দর্শন করা। (২২) নির্দিষ্ট সময়ে ভগবানের আরতি করা। (২৩) *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি শ্রবণ করা। (২৪) ভগবানের কৃপা-ভিক্ষা করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। (২৫) স্মরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ গুণ, লীলা ইত্যাদি স্মরণ করা। (২৬) ধ্যান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করা। (২৭) দাস্য ভাবযুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করা। (২৮) সখ্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং 'শ্রীকৃষ্ণ আমার বন্ধু' —এই ধারণা পোষণ করা। (২৯) আত্মনিবেদন অর্থাৎ সমস্ত কর্ম শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করা। (৩০) প্রিয়োপকরণ অর্থাৎ যে বস্তু সাধারণত লোকে উত্তম বলে এবং যা নিজের প্রিয়, সেই রকম বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা। (৩১) শ্রীকৃষ্ণের জন্য

সব রকমের ঝুঁকি নিতে ও চেষ্টা করতে প্রস্তুত থাকা। (৩২) সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের শরণাগত থাকা। (৩৩) শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় তুলসীর সেবা করা। (৩৪) নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ করা। (৩৫) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মথুরা বা বৃন্দাবনের মতো দিব্য ধামে বাস করা। (৩৬) শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের সেবা করা। (৩৭) সাধ্য অনুসারে ভগবানের সেবাসূচক মহোৎসব অনুষ্ঠান করা। (৩৮) বিশেষভাবে ঊর্জাব্রত অর্থাৎ কার্তিকব্রত পালনে সচেষ্ট হওয়া। (৩৯) জন্মযাত্রা—ভগবানের আবির্ভাব তিথি পালন এবং সেই তিথিতে উৎসব করা। (৪০) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় শ্রদ্ধা এবং বিশেষভাবে প্রীতি প্রদর্শন করা। (৪১) রসিক ভক্তের সঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ আস্বাদন, অর্থাৎ প্রীতি সহকারে আলোচনা করা। (৪২) স্বজাতীয় ও উচ্চ অধিকার-বিশিষ্ট স্নিগ্ধ সাধুর সঙ্গ করা। (৪৩) শ্রীহরির নাম সংকীর্তন করা এবং (৪৪) শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস করা।

এইভাবে ভক্তির ৬৪টি অঙ্গ নির্ধারিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম দশটি হচ্ছে ভক্তির প্রারম্ভিক অঙ্গ। তার পরের দশটি মাধ্যমিক বিধি এবং তারপর আরও চুয়াল্লিশটি অতিরিক্ত অঙ্গ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এইভাবে সাধন-ভক্তি অনুশীলনের ৬৪টি অঙ্গ নিরূপিত হয়েছে। এই ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে পাঁচটি—তুলসীতে জলসেচন, *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ, ভক্তসঙ্গ, সংকীর্তন ও মথুরাবাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভক্তির এই ৬৪টি অঙ্গের দ্বারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কার্যকলাপকে সার্থক করা উচিত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তির বিধি হচ্ছে সব কয়টি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। কিভাবে তা করা সম্ভব, তা নিরূপিত হয়েছে এই ৬৪টি সাধনার মাধ্যমে। এখন শ্রীল রূপ গোস্বামী নানা শাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে এই ভক্ত্যঙ্গগুলির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন।

# সপ্তম অধ্যায়

# ভগবদ্ভক্তির শাস্ত্র-প্রমাণ

## শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়

*শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৩/২১) ঋষি প্রবুদ্ধ মহারাজ নিমিকে বলছেন, "হে রাজন! নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, প্রাকৃত জগতে সুখের লেশমাত্রও নেই। এই দুঃখময় স্থানে সুখের প্রতীতি কেবল ভ্রমমাত্র। যে মানুষ যথার্থ সুখ লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাকে অবশ্যই একজন সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করতে হবে এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। যথার্থ সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি স্বয়ং যুক্তি ও তর্কের দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নিস্নাত এবং যিনি অপরকে সেই সিদ্ধান্তে প্রত্যয় উৎপাদন করতে সমর্থ। যিনি সব রকম জাগতিক কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, সেই মহাপুরুষই যথার্থ সদ্‌গুরু। পরমানন্দ লাভ করাই হচ্ছে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে, শাস্ত্র সম্বন্ধে যার কোন রকম জ্ঞান নেই, যে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করে না, যার চরিত্র সন্দেহজনক, যে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে না, অথবা যে ষড় রিপুর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি, সেই রকম কোন মহামূর্খকে গুরু বলে বরণ করা উচিত নয়। জড় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের ছয়টি মাধ্যম হচ্ছে জিহ্বা, উপস্থ, উদর, ক্রোধ, মন ও বাক্য। ইন্দ্রিয়ের এই ছয়টি বেগ যিনি দমন করতে সমর্থ, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ গুরু এবং তিনি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করতে পারেন। এই ধরনের সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের প্রামাণিক পন্থা। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করেছেন যে ভাগ্যবান, তিনি নিশ্চিতভাবে এই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

## সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ

ঋষি প্রবুদ্ধ মহারাজ নিমিকে আরও বলেন, "হে রাজন! শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে কেবল গুরুরূপেই স্বীকার করবেন না, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি

পরমাত্মারূপে দর্শন করা উচিত। অর্থাৎ, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করা, কেন না তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য প্রকাশ।" সমস্ত শাস্ত্রে এই কথা বলা হয়েছে, এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সেইভাবে শ্রীগুরুদেবকে গ্রহণ করা। গভীর নিষ্ঠা সহকারে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা উচিত এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ ও কীর্তনরূপ ধর্মপন্থা অবলম্বন করার ফলে ভগবৎ-সেবা ও ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়।

শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকা। তা হলে তার পক্ষে দিব্যজ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত সুলভ হবে। *বেদে* তা প্রমাণিত হয়েছে, এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী তা পুনরায় বিশ্লেষণ করবেন। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি অবিচলিতভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁর হৃদয়ে সমস্ত তত্ত্ব আপনা থেকেই অনায়াসে স্ফুরিত হয়।

## শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা

শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/১৭/২৭) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "প্রিয় উদ্ধব! শ্রীগুরুদেবকে কেবল আমার প্রতিনিধি বলেই মনে করা উচিত নয়, পরন্তু তাঁকে আমার স্বরূপ বলে জানবে। কখনও তাঁকে অবজ্ঞা করবে না এবং তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করবে না। একজন সাধারণ মানুষের প্রতি মানুষ যেমন ঈর্ষাপরায়ণ হয়, গুরুদেবের প্রতি কখনও সেইভাবে ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। গুরুতে সর্বদেবতার অধিষ্ঠান বলে জানবে, এবং তাই গুরুদেবকে সেবা করার ফলে সমস্ত দেবতাদের সেবা করা হয়।"

## মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ

*স্কন্দ-পুরাণে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে পূর্বতন আচার্য ও মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কারণ তাঁদের অনুসরণ করার ফলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং তখন আর বিভ্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

*ব্রহ্মযামল* শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "কেউ যদি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ না করে মহান ভক্ত হওয়ার অভিনয় করে, তা হলে সে কখনও ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করতে পারে না। পক্ষান্তরে, সে কেবল ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী সাধক-ভক্তদের সাধন-মার্গে উৎপাতের সৃষ্টি করে।" যারা নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করে না, তাদের সাধারণত সহজিয়া বলা হয়, অর্থাৎ যারা মনে

করে যে, সব কিছুই অত্যন্ত সস্তা, এবং তারা তাদের মনগড়া সমস্ত ধারণার সৃষ্টি করে এবং তারা কখনও শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে না। এই সমস্ত মানুষেরা ভগবদ্ভক্তির পথে কেবল উৎপাতই সৃষ্টি করে।

এই বিষয়ে শাস্ত্র অবজ্ঞাকারী অভক্তরা তর্ক করতে পারে। তার একটি দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ দর্শনে পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ অতি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দর্শন বৈদিক-সিদ্ধান্তের অনুগামী ছিল না এবং তাই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজ অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম সমস্ত ভারতবর্ষে ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে প্রচারিত হয়, কিন্তু মহান আচার্য শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর এই বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে যা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ, ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যদিও শাস্ত্রনির্দেশ অনুসরণ করে না, তবুও তারা দাবি করে, বুদ্ধদেবের অনেক ভক্ত তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি প্রদর্শন করে, এবং তাই তাদের ভক্ত বলেই গণ্য করা উচিত। এর উত্তরে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, বুদ্ধদেবের অনুগামীরা ভক্ত পর্যায়ভুক্ত নয়। বুদ্ধদেব যদিও ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, কিন্তু তাঁর অনুগামীরা বৈদিক তত্ত্বদর্শন-বিহীন হওয়ার ফলে পরমার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞান। বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। তাই যে সমস্ত ধর্ম পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে না, সেগুলি ধর্ম নয়, সেগুলি হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ। নাস্তিকতার অর্থ, বেদের প্রামাণিকত্ব অস্বীকার করা এবং যে সমস্ত মহান আচার্য জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষাদান করেন তাঁদের অবজ্ঞা করা।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* বুদ্ধদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু সেই *শ্রীমদ্ভাগবতেই* আবার বলা হয়েছে যে, নাস্তিক মানুষদের মোহিত করবার জন্য বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তাঁর শিক্ষা কেবল নাস্তিকদের বিমোহিত করার জন্যই, পরমার্থ সাধনে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী মানুষদের জন্য নয়। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীকৃষ্ণ কেন তা হলে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করলেন?" তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, *বেদের* নামে তখন যে অসংখ্য পশু বলি হচ্ছিল, তা বন্ধ করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান *বেদের* নিন্দা করে তথাকথিত অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণেরা বেদবিহিত যজ্ঞের নাম করে অসংখ্য পশু হত্যা করছিল এবং পশুর মাংস আহার করছিল। তাই বুদ্ধদেব সেই সমস্ত অধঃপতিত মানুষদের এইভাবে *বেদের* নামে পাশবিক আচরণ থেকে রক্ষা করার জন্য অবতরণ করেছিলেন। আর তা ছাড়া নাস্তিকদের জন্য তিনি নাস্তিক্যবাদ

প্রচার করেছিলেন, যাতে তারা তাঁর অনুগামী হয় এবং তার ফলে পরোক্ষভাবে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়।

## সৎ-ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

*নারদীয়-পুরাণে* বলা হয়েছে, "কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তা হলে তার অভিলষিত সর্ব অর্থ অচিরেই সিদ্ধ হয়।"

## কৃষ্ণার্থে ভোগাদি ত্যাগ

*পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যে মানুষ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অঙ্গীকার করেছেন, তাঁর জন্য বিষ্ণুলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রতীক্ষা করছে।"

## পুণ্যভূমিতে বাস

*স্কন্দ-পুরাণে* বলা হয়েছে, কেউ যদি এক বছর, ছয় মাস, এক মাস অথবা এক পক্ষও দ্বারকাতে বাস করেন, তা হলে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন এবং ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করে সারূপ্য মুক্তি (নারায়ণের মতো চতুর্ভুজ রূপ) প্রাপ্ত হন।

*ব্রহ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "ভগবান জগন্নাথের আশি বর্গমাইল ব্যাপী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। স্বর্গের দেবতারাও জগন্নাথপুরীর অধিবাসীদের বৈকুণ্ঠবাসীদের মতো চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করেন।"

নৈমিষারণ্যে সমস্ত মহর্ষিরা যখন সমবেত হয়েছিলেন, শ্রীল সূত গোস্বামী তখন *শ্রীমদ্ভাগবত* শোনাচ্ছিলেন এবং সেখানে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়, "গঙ্গার জল সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর সৌরভ বহন করছে এবং এইভাবে গঙ্গার জল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করে প্রবাহিত হচ্ছে। যেখানেই গঙ্গার জল প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে সব কিছুই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র হয়ে যায়।"

## আবশ্যকতা অনুসারে গ্রহণ

*নারদীয়-পুরাণে* বলা হয়েছে, "ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহীর পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়।" অর্থাৎ ভক্তির বিধানের উপেক্ষা করা উচিত নয়। যা তিনি সহজভাবে পালন করতে সমর্থ নন, সেই সমস্ত বিধান গ্রহণ করা উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভক্তের

উচিত প্রতিদিন জপমালায় লক্ষ নাম জপ করা। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী তিনি কম সংখ্যক নাম জপ করতে পারেন। সাধারণত আমি আমার শিষ্যদের অন্ততপক্ষে পঁচিশ হাজার নাম জপ করার নির্দেশ দিয়েছি, এবং এই পঁচিশ হাজার নাম তাদের অবশ্যই জপ করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি পঁচিশ হাজার নাম জপ করতেও না পারে, তা হলে অবশ্যই তাকে সেই জপ পরের দিন পূর্ণ করতে হবে। এই নির্দেশ অনুসরণে সকলকে অবশ্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। যদি কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে তা না করে, তা হলে সে প্রমাদগ্রস্ত হবে। ভগবৎ-সেবার পথে এটি একটি মস্ত বড় অপরাধ। আমরা যদি অপরাধমুক্ত না হই, তা হলে আমরা ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করতে পারব না। নিজের যোগ্যতা অনুসারে নিয়ম করে যদি অবিচলিতভাবে তা পালন করা হয়, তাও ভাল। তার ফলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়।

## একাদশী ব্রত পালন

*ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে* বলা হয়েছে যে, একাদশীর দিন উপবাস করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে আত্যন্তিক পুণ্য লাভ করা যায়। একাদশীর দিন উপবাস করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা ও প্রেমপরায়ণ হওয়া। একাদশীর দিন উপবাস করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, শারীরিক আবশ্যকতাগুলি খর্ব করে ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং অন্যভাবে ভগবানের সেবা করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। উপবাসের দিন নিরন্তর গোবিন্দের লীলা স্মরণ এবং তাঁর দিব্য নাম শ্রবণ করাই হচ্ছে সর্বোত্তম।

## অশ্বত্থ আদি বৃক্ষকে সম্মান প্রদর্শন

*স্কন্দ-পুরাণে* বলা হয়েছে যে, তুলসী ও আমলকী বৃক্ষে জল সেচন করা উচিত। গাভী ও ব্রাহ্মণদের সম্মান ও পূজা করা উচিত এবং শ্রদ্ধা সহকারে বৈষ্ণবদের দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করা উচিত এবং তাঁদের ধ্যান করা উচিত। এই সমস্ত আচরণ ভক্তকে তাঁর প্রাকৃত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

## অভক্ত সঙ্গত্যাগ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একবার তাঁর এক গৃহস্থ ভক্ত বৈষ্ণব-আচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন যে, বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষণ অভক্ত সঙ্গ থেকে দূরে থাকা। তারপর তিনি বিশ্লেষণ করেন যে, অভক্ত দুই রকমের। এক শ্রেণীর অভক্ত হচ্ছে কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং অপর শ্রেণী হচ্ছে বিষয়ী।

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী হচ্ছে অবৈষ্ণব, এবং কখনই তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়।

*কাত্যায়ন-সংহিতায়* বলা হয়েছে যে, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে লোহার খাঁচায় থাকাও বরং ভাল, কিন্তু কৃষ্ণবিদ্বেষী অভক্তের সঙ্গ করা উচিত নয়। তেমনই *বিষ্ণু-রহস্যে* বলা হয়েছে যে, বিষয়-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা দেব-দেবীর উপাসকদের সহবাস করার থেকে সর্প, ব্যাঘ্র অথবা কুমিরকে আলিঙ্গন করা অনেক ভাল।

শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য নানা দেব-দেবীর উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। যেমন, সুন্দরী স্ত্রী লাভের জন্য পার্বতীর এবং বিদ্যালাভের জন্য সরস্বতীর আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* নানা রকম কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করার উল্লেখ রয়েছে। এই সমস্ত উপাসকদের যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেই সমস্ত দেব-দেবীদের মহান ভক্ত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে অভক্ত। কোন অবস্থাতেই তাদের ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়।

মায়াবাদীরা বলে, যে কোনও রূপের উপাসনা করা যায়, কেন না চরমে লক্ষ্য একই। যে কোনও রূপে উপাসনা করলেই পরিণামে ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীদের উপাসকেরা অবশেষে দেব-দেবীদের লোকে উন্নীত হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বৈকুণ্ঠলোকে প্রবিষ্ট হন। দেব-উপাসকদের *গীতায়* যথেষ্ট নিন্দা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, অত্যধিক কামনা-বাসনার ফলে যাদের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছে, তারাই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। তাই *বিষ্ণু-রহস্যে* এই সমস্ত দেব-দেবীর উপাসকদের ঘোর ভর্ৎসনা করে বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত দেব-উপাসকদের সঙ্গে সঙ্গ করার থেকে বরং ভয়ঙ্কর জন্তুদের সঙ্গে থাকাও ভাল।

## অযোগ্য শিষ্য গ্রহণ না করা, বড় মন্দির নির্মাণের প্রয়াস না করা এবং বহু গ্রন্থ পাঠ না করা

আর একটি নিয়ম হচ্ছে যে, বহু শিষ্য গ্রহণ করলেও করা যেতে পারে, কিন্তু কখনই এই রকম আচরণ করা উচিত নয়, যার ফলে কোন কাজের জন্য অথবা কৃপা লাভের জন্য কোন শিষ্যের অধীন হয়ে পড়তে হয়। নতুন মন্দির নির্মাণ করার জন্য অধিক উদ্যম করাও উচিত নয় এবং ভক্তিবর্ধক গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন রকম পুস্তক পাঠ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি যত্ন সহকারে *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা* ও এই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*

গ্রন্থ পাঠ করেন, তা হলেই তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তখন আর অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করার কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে (৭/১৩/৮) শ্রীনারদ মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করার সময়, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলেন যে, অযোগ্য ব্যক্তিদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করা সন্ন্যাসীদের উচিত নয়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে, সবার আগে পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে, শিষ্য হওয়ার অভিলাষী ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তি লাভে প্রয়াসী কি না। তা যদি না হয়, তা হলে তাকে শিষ্যত্বে বরণ করা উচিত নয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা এতই অসীম যে, তিনি সমস্ত সদ্‌গুরুদের সর্বত্র কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় সন্ন্যাসীরাও সর্বত্র কৃষ্ণভাবনার অমৃতবাণী প্রচার করেন এবং যদি কেউ ঐকান্তিকভাবে শিষ্য হতে ইচ্ছুক হয়, তা হলে সন্ন্যাসী তাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন।

শিষ্যসংখ্যা না বাড়ালে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার হওয়া সম্ভব নয়, তাই কখনও কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী সন্ন্যাসীরা বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এমন অনেক মানুষকে শিষ্যত্বে বরণ করেন, যারা শিষ্য হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেনি। এই ধরনের সদ্‌গুরুর কৃপায় ধীরে ধীরে অযোগ্য শিষ্য ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভ করে। কিন্তু কেউ যদি কেবল মিথ্যা সম্মান লাভের জন্য, যশ বৃদ্ধির জন্য শিষ্য সংখ্যা বাড়ায়, তবে সে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনাময় অমৃতময় মার্গ থেকে অধঃপতিত হবে।

তেমনই, আবার নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করে বিভিন্ন জায়গায় ভাষণ দিয়ে নাম কেনার জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করা সদ্‌গুরুর উচিত নয়। এই সমস্ত রোগ বর্জন করা উচিত। আরও বলা হয়েছে যে, মন্দির বানাতে সন্ন্যাসীদের উৎসাহী হওয়া উচিত নয়। আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বিভিন্ন আচার্যরা মন্দির তৈরি করতে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু কেউ যদি মন্দির তৈরি করার কাজে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেন, তা হলে অনুৎসাহী আচার্য সেই সেবককে বহু ব্যয়সাধ্য মন্দির নির্মাণ করতে অনুমতি দেন। মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ শ্রীল রূপ গোস্বামীর সেবা করতে চেয়েছিলেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁকে বহু ব্যয়সাধ্য বিশাল গোবিন্দজীর মন্দির নির্মাণ করতে আদেশ দেন।

সুতরাং স্বয়ং মন্দির তৈরি করার দায়িত্ব সদ্‌গুরুর গ্রহণ করা উচিত নয়, কিন্তু কোন বিত্তশালী মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর অর্থ ব্যয় করতে চান,

তখন শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতো আচার্য তাঁর সেই অর্থ ভগবানের সুন্দর মন্দির নির্মাণের সেবায় উপযোগ করতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশত, কখনও কখনও গুরু হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিরাও ধনাঢ্য পুরুষদের কাছ থেকে মন্দির নির্মাণ করবার জন্য অর্থভিক্ষা করে। অযোগ্য গুরু এই ধন বাস্তবিক প্রচারকার্যে প্রয়োগ না করে কেবল আরামে থাকবার জন্য বড় বড় মন্দির তৈরি করে, সেটি মস্ত বড় অপরাধ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তথাকথিত পারমার্থিক উন্নতির নামে মন্দির বানাতে উৎসাহী হওয়া সদ্‌গুরুর উচিত নয়। তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের বাণী প্রচার করা। এই সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, গুরুর কর্তব্য হচ্ছে গ্রন্থ প্রকাশ করা। কারও যদি টাকা থাকে, তা হলে ব্যয়সাপেক্ষ মন্দির না বানিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে সেই অর্থ ব্যয় করা উচিত।

## নিষ্কপট ব্যবহার এবং লাভ ও ক্ষতিতে সমভাবাপন্ন

*পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে জাগতিক লাভ বা ক্ষতিতে কখনও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ভোজন ও আচ্ছাদন সাধনকারী বস্তুর অপ্রাপ্তিতে বা প্রাপ্ত বস্তুর বিনাশে বিহ্বলচিত্ত না হয়ে কেবল ভগবানকেই স্মরণ করা উচিত।" অর্থাৎ প্রতিটি বদ্ধ জীবই সর্বক্ষণ জড়-জাগতিক কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন; এই সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়া উচিত। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রধান সিদ্ধান্ত হচ্ছে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা। প্রাপ্ত বস্তুর বিনাশে বিচলিত না হয়ে মনকে সর্বক্ষণ ভগবানের চরণারবিন্দে নিবদ্ধ রাখাই কর্তব্য।

কখনই শোক ও মোহের দ্বারা বশীভূত হওয়া ভক্তের উচিত নয়। *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "শোক ও মোহের দ্বারা যাদের চিত্ত বিমোহিত হয়েছে, তাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ কখনই প্রকাশিত হন না।"

## অন্য দেবতাদের অবজ্ঞা

অন্য দেব-দেবীদের অসম্মান করা উচিত নয়। দেবতাদের ভক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বৈষ্ণব যদিও শিব বা ব্রহ্মার ভক্ত নন, কিন্তু তবুও তাঁদের মতো মহান দেবতাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর কর্তব্য। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে একটি পিপীলিকাকে পর্যন্ত সম্মান করা উচিত, সুতরাং শিব-ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষদের কি কথা।

*পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা হরি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের ঈশ্বর এবং তাই সর্ব অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন আরাধ্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতাদের অবজ্ঞা করতে হবে।"

## কোন জীবকে ক্লেশ না দেওয়া

*মহাভারতে* বলা হয়েছে—"যে মানুষ অন্য কোন জীবকে উত্ত্যক্ত করে না অথবা ক্লেশ দেয় না, যিনি সকলকে পুত্রবৎ দর্শন করেন, যাঁর হৃদয় নির্মল, তিনি অচিরেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করেন।"

আজকের তথাকথিত সভ্য-সমাজে কখনও কখনও পশুহিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়, কিন্তু কসাইখানাগুলিতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ পশু হত্যা হচ্ছে। বৈষ্ণবের মনোভাব সেই রকম নয়। বৈষ্ণব কখনও পশুহত্যা বরদাস্ত করেন না এবং তিনি কখনই কাউকে কোন রকম ক্লেশ দেন না।

## অষ্টম অধ্যায়

# বর্জনীয় অপরাধ

বৈদিক শাস্ত্রে ৩২টি সেবা অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—(১) গাড়িতে করে বা পালকিতে করে অথবা জুতো পায়ে দিয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (২) পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার জন্য জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা ইত্যাদি মহোৎসব পালনে অবহেলা করা উচিত নয়। (৩) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করতে অবহেলা করা উচিত নয়। (৪) খাওয়ার পর হাত-পা না ধুয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (৫) দূষিত অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরিবারে কারও মৃত্যু হওয়ার পর সমস্ত পরিবারই কিছুদিনের জন্য অশুচি হয়ে যায়। ব্রাহ্মণদের জন্য এই অশৌচ অবস্থা বারো দিন থাকে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের জন্য পনের দিন এবং শূদ্রদের জন্য ত্রিশ দিন।) (৬) এক হাতে দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত নয়। (৭) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পরিক্রমা করা উচিত নয়। মন্দির পরিক্রমা করার বিধি হচ্ছে, ভগবানের শ্রীমূর্তিকে দক্ষিণ দিকে রেখে প্রদক্ষিণ করা। প্রতিদিন অন্তত তিনবার মন্দির পরিক্রমা করা উচিত। (৮) শ্রীবিগ্রহের সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়। (৯) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে হাত দিয়ে হাঁটু, কনুই অথবা পায়ের গোড়ালি ধরে বসা উচিত নয়। (১০) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের সামনে শোয়া উচিত নয়। (১১) ভগবানের সামনে প্রসাদ খাওয়া উচিত নয়। (১২) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। (১৩) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে জোরে জোরে কথা বলা উচিত নয়। (১৪) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অপরের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। (১৫) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ক্রন্দন বা চিৎকার করা উচিত নয়। (১৬) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ঝগড়া করা উচিত নয়। (১৭) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে কাউকে তিরস্কার করা উচিত নয়। (১৮) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করা উচিত নয়। (১৯) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে কাউকে কঠোর বচন বলা উচিত নয়। (২০) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে চর্ম ধারণ করা উচিত নয় অর্থাৎ চর্মনির্মিত বস্ত্র পরিধান করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে যাওয়া উচিত নয়। (২১) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্য কারও স্তুতি বা প্রশংসা করা উচিত

নয়। (২২) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে খারাপ কথা বলা উচিত নয়। (২৩) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বায়ু ত্যাগ করা উচিত নয়। (২৪) ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের পূজা করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। (*ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত যদি তাঁকে একটু ফল, ফুল, পাতা ও জল দিয়েও তাঁর পূজা করেন, তা হলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। এই বিধান ভগবান সকলের জন্যই দিয়েছেন, এমন কি সব চাইতে দরিদ্র মানুষও এইভাবে তাঁর পূজা করতে পারেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, খুব সুন্দরভাবে বহু অর্থ ব্যয়ে ভগবানের পূজা করার সামর্থ্য যাঁর রয়েছে, তিনিও কেবলমাত্র একটু জল আর পাতা দিয়ে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করবেন। তার যদি সামর্থ্য থাকে, তা হলে ফুল, অলঙ্কার ও সুন্দর পোশাকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে সাজিয়ে নানা রকম উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য তাঁকে নিবেদন করে মহাসমারোহে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এমন নয় যে, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সমস্ত অর্থ ব্যয় করে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কেবল একটু জল আর পাতা অর্পণ করবেন।) (২৫) শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়। (২৬) ঋতু অনুসারে টাটকা ফল ও শস্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত। (২৭) খাবার প্রস্তুত হওয়ার পর তা ভগবানকে নিবেদন না করে কাউকে দেওয়া উচিত নয়। (২৮) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দিকে পিছন ফিরে বসা উচিত নয়। (২৯) নিঃশব্দে গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত নয়, অর্থাৎ গুরুদেবকে দণ্ডবৎ করার সময় উচ্চৈঃস্বরে 'গুরু-প্রণতি' উচ্চারণ করা উচিত। (৩০) গুরুদেবের সান্নিধ্যে এলে তাঁর গুণকীর্তন করতে অবহেলা করা উচিত নয়। (৩১) গুরুদেবের সামনে নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়। (৩২) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্যান্য দেব-দেবীর নিন্দা করা উচিত নয়।

এই ৩২টি হচ্ছে সেবা-অপরাধ। এ ছাড়াও কয়েকটি অপরাধের কথা *বরাহ-পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে—(১) অন্ধকার ঘরে শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করা উচিত নয়। (২) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনার বিধি-বিধানগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে অবহেলা করা উচিত নয়। (৩) কোন রকম শব্দ না করে, অর্থাৎ আগমনবার্তা না জানিয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (৪) কুকুর অথবা নিম্নস্তরের কোন পশু যে খাদ্যদ্রব্য দেখেছে, তা ভগবানকে নিবেদন করা উচিত নয়। (৫) পূজার সময় নীরবতা ভঙ্গ করা উচিত নয়। (৬) পূজা করার সময় মূত্রত্যাগ অথবা বায়ুত্যাগ করা উচিত নয়। (৭) পুষ্প অর্পণ না করে ধূপ নিবেদন করা উচিত নয়। (৮) সুগন্ধ-বিহীন পুষ্প ভগবানকে নিবেদন করা উচিত নয়। (৯) প্রতিদিন ভাল করে দন্তধাবন করতে অবহেলা করা উচিত নয়। (১০) মৈথুনের পর মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (১১) রজঃস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করা

উচিত নয়। (১২) মৃতদেহ স্পর্শ করার পর মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (১৩) লাল অথবা নীল রঙের কাপড় পরিধান করে অথবা অপরিষ্কার কাপড় পরিধান করে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (১৪) মৃতদেহ দর্শন করার পর ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (১৫) মন্দিরে বায়ুত্যাগ করা উচিত নয়। (১৬) মন্দিরে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। (১৭) শ্মশানে যাওয়ার পর মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (১৮) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ঢেকুর তোলা উচিত নয়। অর্থাৎ, ভালভাবে খাদ্য হজম না করে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। (১৯) গাঁজা খাওয়া উচিত নয়। (২০) আফিং আদি মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। (২১) শরীরে তৈল মেখে মন্দিরে প্রবেশ অথবা ভগবানের শ্রীমূর্তি স্পর্শ করা উচিত নয়। (২২) যে সমস্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব নিরূপিত হচ্ছে, সেই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (২৩) কোন বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারী শাস্ত্রের প্রবর্তন করা উচিত নয়। (২৪) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে পান খাওয়া উচিত নয়। (২৫) অপরিষ্কার পাত্রে রাখা ফুল ভগবানকে নিবেদন করা উচিত নয়। (২৬) আসন ছাড়া মাটিতে বসে ভগবানের অর্চনা করা উচিত নয়। (২৭) স্নান সম্পূর্ণ না হলে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করা উচিত নয়। (২৮) কপালে ত্রিরেখা-বিশিষ্ট তিলক ধারণ করা উচিত নয়। (২৯) হাত ও পা না ধুয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

অন্য নিয়মগুলি হচ্ছে, অবৈষ্ণবের তৈরি খাবার ভগবানকে নিবেদন করা উচিত নয়। অভক্তের সম্মুখে পূজা করা উচিত নয়। অবৈষ্ণব দর্শন করে ভগবানের পূজা করা উচিত নয়। ভক্তি-বিঘ্নবিনাশন গণপতির পূজা করে ভগবানের আরাধনা শুরু করা উচিত। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, গণপতি শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন। তাই, তাঁর পূজা করলে ভক্তিপথের সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত হয়। অতএব, ভক্তদের উচিত গণপতির পূজা করা। নখ ও আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করা হয়েছে যে জল, সেই জল দিয়ে ভগবানের স্নান করানো উচিত নয়। ঘর্মাক্ত কলেবরে ভগবানের পূজা করা উচিত নয়। এই রকম বহু বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন, ভগবানকে নিবেদিত ফুল চরণ দ্বারা উল্লঙ্ঘন অথবা মর্দন করা উচিত নয়, অথবা ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করা উচিত নয়, ইত্যাদি। ভগবদ্ভক্তি সাধনে এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন অপরাধ, এবং খুব সাবধানতার সঙ্গে এই অপরাধগুলি বর্জন করা উচিত।

*পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে যে, সারা জীবন ধরে পাপ করেছে যে মানুষ, সে-ও যদি তাঁর শরণাগত হয়, তা হলে তিনি তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। সুতরাং ভগবানের শরণাগত মানুষ সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেউ

যদি স্বয়ং ভগবানের চরণেও অপরাধ করে থাকে, তা হলে *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—এই মহামন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করার পর, সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করার ফলে সব রকমের পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের নামের চরণে অপরাধ করে, তা হলে তা থেকে কোনমতেই উদ্ধার পাওয়া যায় না।

ভগবানের দিব্য নামের প্রতি অপরাধগুলি হচ্ছে—(১) যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের নিন্দা করা। (২) শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান অথবা তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা। (কখনও কখনও নাস্তিকেরা মনে করে, যে কোন দেবতাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যথার্থ ভক্ত জানেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও ভগবান বিষ্ণুর সমান অথবা তাঁর থেকে স্বতন্ত্র হতে পারেন না। তাই, কেউ যদি মনে করে যে, 'দুর্গা' 'দুর্গা' অথবা 'কালী' 'কালী' উচ্চারণ করা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের' উচ্চারণের সমান, তা হলে সেটি মস্ত বড় অপরাধ। (৩) গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা। (৪) বৈদিক শাস্ত্র অথবা বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা। (৫) 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক বলে মনে করা। (৬) ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা। (৭) নামের বলে পাপ আচরণ করা। (ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে সব রকমের পাপ বিনষ্ট হয়—কিন্তু কেউ যেন মনে না করে যে, সে পাপ করতে থাকবে এবং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে সেই পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই ধরনের বিপজ্জনক মনোভাব অত্যন্ত অপরাধজনক এবং এই মনোভাব থেকে মুক্ত হতে হবে।) (৮) 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পুণ্যকর্ম বলে মনে করা। (৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা উপদেশ করা। (ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভগবানের দিব্য নামের অপ্রাকৃত মহিমা সম্বন্ধে প্রথমেই তাকে কিছু বলা উচিত নয়। যে সমস্ত মানুষ অত্যন্ত পাপী, তারা ভগবানের নামের অপ্রাকৃত মহিমা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, এবং সেই সম্বন্ধে তাদের কিছু না বলাই ভাল।) (১০) ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তার অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরেও বিষয়াসক্তি বজায় রাখা।

প্রতিটি বৈষ্ণব ভক্তেরই কর্তব্য হচ্ছে, ঈপ্সিত সিদ্ধি লাভ করার জন্য এই সমস্ত অপরাধগুলি থেকে মুক্ত হওয়া।

## নবম অধ্যায়

# ভক্তির অঙ্গগুলির বিশদ বিবেচনা

### নিন্দা

ভগবানের ও তাঁর ভক্তের নিন্দা কখনই সহ্য করা উচিত নয়। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে (১০/৭৪/৪০) শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন, "হে রাজন! যদি কোন মানুষ ভগবান ও ভক্তের নিন্দা শুনে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে না যায়, তা হলে তার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হয়।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *শিক্ষাষ্টকের* একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা / অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।* অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, "তৃণের থেকেও নম্র এবং একটি গাছের থেকেও বেশি সহনশীল হয়ে, নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে, অপরকে সম্মান প্রদর্শন করা।" ভক্তরূপে এত দীন ও বিনম্র হওয়া সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শুনলেন যে, পাষণ্ডী জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করেছে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে তাদের নিধন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আচরণ অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। এর থেকে বোঝা যায় যে, ভক্ত নিজের সম্বন্ধে সর্বদাই নিরভিমান, সহিষ্ণু ও বিনীত হতে পারেন, কিন্তু যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর ভক্তের কোন রকম অবমাননা হয়, তখন তিনি তা সহ্য করেন না।

এই রকম অপমানের তিন রকম প্রতিকার হতে পারে। কেউ যদি বাণীর দ্বারা নিন্দা করে তা হলে ভক্তকে এতই দক্ষ হওয়া উচিত যে, তিনি প্রতিপক্ষকে তর্কের দ্বারা নিরস্ত করতে পারেন। যদি তা না পারেন, তা হলে দীনভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা শোনার থেকে বরং আত্মহত্যা করা ভাল। যদি তাও সম্ভব না হয়, তা হলে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত। যদি এই তিনটি আচারের কোনটিই তিনি পালন না করতে পারেন, তা হলে ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে তাঁর পতন হয়।

### তিলক ও তুলসীমালা ধারণ

*পদ্ম-পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে, কিভাবে তিলক ও কণ্ঠিমালার দ্বারা বৈষ্ণব-শরীর বিভূষিত হওয়া উচিত। "যিনি কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করেন, যাঁর শরীরে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই বিষ্ণুচিহ্ন সহ দ্বাদশ অঙ্গে বিষ্ণুমন্দির অঙ্কিত

হয়, যিনি মস্তকে বৈষ্ণব তিলক ধারণ করেন, তিনিই এই জগতে বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবদের উপস্থিতির ফলে জগৎ পবিত্র হয়। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, সেই স্থান বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়।"

*স্কন্দ-পুরাণেও* এইভাবে বলা হয়েছে, "যিনি তিলক অথবা গোপীচন্দনের দ্বারা বিভূষিত হয়ে সমস্ত শরীরে ভগবানের নাম ধারণ করেন এবং যাঁর কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে তুলসীমালা থাকে, সেই বৈষ্ণবদের কাছে যমদূত আসতে পারে না।" যমদূতেরা হচ্ছে পাপীদের দণ্ডদাতা ও মৃত্যুর দেবতা যমরাজের অনুচর। বৈষ্ণবেরা কখনও এই ধরনের যমদূতদের আয়ত্তাধীন নন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অজামিল উদ্ধার পর্বে বলা হয়েছে যে, যমরাজ তাঁর দূতদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, কখনও বৈষ্ণবদের কাছে না যেতে। বৈষ্ণবেরা যমরাজের নিয়ন্ত্রণাধীন নন।

*পদ্ম-পুরাণেও* বলা হয়েছে, "যে মানুষের শরীর চন্দন ও ভগবানের দিব্য নামের দ্বারা বিভূষিত, তিনি সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করার জন্য কৃষ্ণলোকে প্রবিষ্ট হন।"

## পুষ্পমাল্য ধারণ

*শ্রীমদ্ভাগবতের* পরবর্তী নির্দেশটি হচ্ছে যে, ভগবানকে নিবেদিত পুষ্পমাল্য ধারণ করা উচিত। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৬/৪৬) উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "হে গোবিন্দ! তোমার ব্যবহৃত ফুলমালা, গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও অলঙ্কার আমি গ্রহণ করি, এবং কেবল তোমার উচ্ছিষ্ট ভোগ করি, কেন না আমি হচ্ছি তোমার নিত্য দাস। তাই আমি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মায়ার দ্বারা আমি আক্রান্ত হব না।" এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে, যে মানুষ গোপীচন্দন অর্থাৎ চন্দনের তিলক ধারণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্মাল্য ধারণ করেন, তিনি কখনও মায়ার দ্বারা বশীভূত হন না। মৃত্যুকালে যমদূতেরা তাঁদের কাছে আসতে পারে না। এমন কি, কেউ যদি সব রকম বৈষ্ণব আচারগুলি পালন না করেও কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন, তা হলেও তিনি অচিরেই বৈষ্ণবত্ব লাভ করবেন।

তেমনই, *স্কন্দ পুরাণেও* ব্রহ্মা নারদকে বলছেন, "হে নারদ! যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মালা কণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি সব রকম পাপ ও রোগ থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হন।"

## শ্রীমূর্তির সম্মুখে নৃত্য

*দ্বারকা-মাহাত্ম্যে* শ্রীমূর্তির সম্মুখে নৃত্য করার মহিমা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "যে মানুষ প্রসন্ন চিত্তে ভক্তিপূর্বক আমার সামনে নৃত্য করতে করতে শরীরের ভঙ্গিমার দ্বারা অন্তরের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করেন, তাঁর কোটি কোটি

জন্মের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।" এই গ্রন্থেই দেবর্ষি নারদ বলেছেন, "দিব্য ভাব প্রকাশ করে যিনি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য করেন এবং করতালি দেন, তাঁর শরীর থেকে পাতকরূপী সমস্ত পক্ষী উড়ে চলে যায়।" তালি দিলে যেমন পাখিরা উড়ে যায়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য করলে এবং করতালি দিলে শরীর থেকে পাতকরূপী সমস্ত পক্ষীকে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

## শ্রীবিগ্রহকে সম্মান সহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম

*নারদীয়-পুরাণে* শ্রীবিগ্রহকে সম্মান প্রদর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "যিনি প্রভূত পুণ্যকর্ম আচরণ করেছেন এবং যে মানুষ কেবল শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি জানিয়েছেন, তাঁরা সম-পর্যায়ভুক্ত নন।" যে মানুষ বহু যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন, তিনি পুণ্যফল লাভ করবেন। কিন্তু সেই সমস্ত পুণ্যের ফল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাকে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, কিন্তু যে মানুষ কেবল একবার শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রণতি নিবেদন করেছেন, তাঁকে আর কখনও এই জগতে ফিরে আসতে হবে না, কেন না তিনি সরাসরিভাবে কৃষ্ণলোকে উন্নীত হবেন।

## ভগবানকে স্বাগত জানাতে দণ্ডায়মান হওয়া

*ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যিনি ভগবানের রথযাত্রার সময় রথে করে তাঁকে আসতে দেখেন এবং তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য দণ্ডায়মান হন, তার শরীর থেকে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।"

## শ্রীমূর্তির অনুগমন

এই ধরনের একটি উক্তি *ভবিষ্য পুরাণে* রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, "নীচ-কুলোদ্ভূত কোন মানুষও যদি রথের সম্মুখে থেকে অথবা পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে রথের অনুগমন করেন, তা হলে অবশ্যই তিনি শ্রীবিষ্ণুর মতো ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন।"

## বিষ্ণুমন্দির অথবা তীর্থে গমন

*পুরাণে* বলা হয়েছে, "বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা আদি পুণ্যভূমিতে যাঁরা গমন করেছেন, তাঁরা ধন্য। তাঁরা অনায়াসে সংসাররূপ মরুভূমি পার হয়ে যান।"

*হরিভক্তি-সুধোদয়ে* শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যাওয়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বে বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় যাওয়ার যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, সেই সমস্ত পুণ্যভূমিতে ভক্তরা ভগবানের মন্দিরে

ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ পান। *হরিভক্তি-সুধোদয়ে* বলা হয়েছে, "যে সমস্ত মানুষ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং যাঁরা ভগবানের মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে যান, তাঁদের কখনও মাতৃগর্ভরূপী কারাগারে প্রবেশ করতে হয় না।" মাতৃগর্ভে অবস্থান করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কিন্তু বদ্ধ জীব জন্মের পর সেই বেদনাদায়ক অবস্থার কথা ভুলে যায়। শাস্ত্রে জড় জগতের দুঃখময় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রত্যেককে ভক্তি সহকারে ভগবানের মন্দিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অনায়াসে এই জড় জগতের দুঃখময় পুনর্জন্ম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

## বিষ্ণুমন্দির পরিক্রমা

*হরিভক্তি-সুধোদয়ে* বলা হয়েছে, "যে মানুষ বিষ্ণুমূর্তির পরিক্রমা করেন, তিনি এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে প্রতিহত করে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন।" ভবরোগের ফলে বদ্ধ জীব নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়, কিন্তু বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করার ফলে সেই আবর্তন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

ভারতবর্ষে বর্ষাকালের চারটি মাস (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক) কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ভ্রাম্যমান সাধুরা তাঁদের ভ্রমণ স্থগিত রেখে কোন পুণ্যস্থানে অবস্থান করেন। এই সময় কতকগুলি বিশেষ বিধি-নিষেধ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করা হয়। *স্কন্দ-পুরাণে* বলা হয়েছে যে, সেই সময়ে কেউ যদি অন্তত চারবার বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেছেন। এই ধরনের পরিক্রমার ফলে গঙ্গার জলের দ্বারা নিস্নাত সমস্ত পুণ্যতীর্থ দর্শন করা হয়ে যায়, এবং চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করার ফলে অনায়াসে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

## অর্চনা

অর্চনা মানে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করা। ভক্তির এই অঙ্গ অনুশীলন করার ফলে বুঝতে পারা যায় যে, আমরা এই শরীর নই, আমাদের স্বরূপে আমরা চিন্ময় আত্মা। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৮১/১৯) বর্ণনা করা হয়েছে যে, কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা সুদামা ব্রাহ্মণদের গৃহে গিয়ে স্বগতোক্তি করে বলেছিলেন, "কেবলমাত্র কৃষ্ণের অর্চনা করার ফলে অনায়াসে স্বর্গের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, মোক্ষলাভ করা যায়, এই ব্রহ্মাণ্ডের সার্বভৌমত্ব লাভ করা যায়, জড় জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করা যায় এবং যোগসিদ্ধি লাভ করা যায়।"

সুদামার এই স্বগতোক্তির কারণ হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা সুদামাকে ব্রাহ্মণদের গৃহে গিয়ে কিছু আহার্য ভিক্ষা করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, তাই তাঁদের জন্য কিছু আহার্যের প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে গেলে পরে ব্রাহ্মণেরা সুদামাকে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীরা যখন শুনলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম কিছু খাবার চেয়ে পাঠিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁরা নানা রকম উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে নিজেরাই রওনা হলেন কৃষ্ণ-বলরামকে নিবেদন করার জন্য। *বিষ্ণু-রহস্যেও* বলা হয়েছে, "এই জগতে যে মানুষ পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করছেন, তিনি অনায়াসে নিত্য আনন্দময় ভগবৎ-ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন।"

## ভগবানের পরিচর্যা

*বিষ্ণু-রহস্যে* বলা হয়েছে, "রাজার পরিচারকেরা যেভাবে রাজার সেবা করে, ঠিক সেইভাবে যদি কোন মানুষ ভগবানের সেবা করেন, তা হলে অবশ্যই তিনি দেহত্যাগের পর কৃষ্ণলোকে উন্নীত হবেন।" প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে ভগবানের মন্দিরগুলি ঠিক রাজপ্রাসাদের মতো। সেগুলি কোন সাধারণ বাড়ি নয়, কেন না রাজা যেভাবে তাঁর প্রাসাদে সেবিত হন, শ্রীকৃষ্ণকেও ঠিক সেইভাবে সেবা করা উচিত। তাই বৃন্দাবনে শত শত মন্দিরে রাজকীয়ভাবে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা হয়। *নারদীয়-পুরাণে* বলা হয়েছে, "কেউ যদি কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য ভগবানের মন্দিরে থাকেন, তা হলে অবশ্যই তিনি ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হবেন।"

সুতরাং এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সমাজে যারা বিত্তবান, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের জন্য সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি করা, এবং তাঁর পূজার আয়োজন করা, যাতে মানুষ সেই মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করতে পারে, অথবা ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ করতে পারে। এইভাবে সকলেই ভগবৎ-ধামে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। পক্ষান্তরে বলা যায়, কোন সাধারণ মানুষও যদি ভগবানের মন্দিরে যান, তা হলে তিনি অনায়াসে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারেন। সুতরাং যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় রত, তাঁদের সৌভাগ্যের কথা কে অনুমান করতে পারে?

এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতের* চতুর্থ স্কন্ধে (৪/২১/৩১) মহারাজ পৃথু তাঁর প্রজাদের বলছেন, "হে প্রজাগণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি হচ্ছেন সমস্ত অধঃপতিত জীবের প্রকৃত ত্রাণকর্তা। কোন দেবতা বদ্ধ জীবকে মুক্ত করতে

পারেন না, কেন না তাঁরা নিজেরাই হচ্ছেন বদ্ধ। কোন বদ্ধ সত্তার পক্ষে অপর কোন বদ্ধ সত্তাকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। কেবল পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অথবা তাঁর যথার্থ প্রতিনিধিই বদ্ধ জীবকে মুক্ত করতে পারেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদনখ থেকে গঙ্গা উদ্‌গত হয়ে এই পৃথিবী ও অন্য সমস্ত গ্রহগুলিতে প্রবাহিত হয়ে পাপপঙ্কিল জীবসমূহকে উদ্ধার করছেন। সুতরাং, যে মানুষ নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁর মুক্তির কথা নিয়ে কিছু বলার কি প্রয়োজন? তাঁদের মুক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। তাঁদের পূর্বজন্মে যদি রাশিকৃত পাপও সঞ্চিত হয়ে থাকে, তা হলেও তাতে কিছু যায় আসে না।" পক্ষান্তরে বলা যায়, যে মানুষ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপফল অচিরেই বিনষ্ট হয়। ভগবানের আরাধনা করার পন্থা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে এবং নিষ্ঠা সহকারে সেই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত।

## কীর্তন

*লিঙ্গ-পুরাণে* ভগবানের মহিমা কীর্তন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তনকারী ব্রাহ্মণ অবশ্যই কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন। দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতি থেকেও এই কীর্তন শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়।"

## সংকীর্তন

কেউ যদি উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের লীলা, গুণ, রূপ আদির মহিমা কীর্তন করেন, তাকে বলা হয় সংকীর্তন। সংকীর্তন বলতে সমবেতভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনকে বোঝায়।

*বিষ্ণুধর্মে* এই সংকীর্তনের মহিমা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "এই কৃষ্ণনাম এতই পবিত্র যে, এই নাম কীর্তনের ফলে তৎক্ষণাৎ জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" এই কথাটি ধ্রুব সত্য। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* উল্লেখ করা হয়েছে, "কেউ যদি একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তা হলে তাঁর এত পাপ নাশ হয় যে, তত পাপ করার সাধ্য কোন পাপীর নেই।" কোন পাপী অসংখ্য পাপকর্ম করতে পারে, কিন্তু একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফলে যত পাপ ক্ষয় হয়, তত পাপ করার ক্ষমতা কোন পাপীর নেই।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে (৭/৯/১৮) প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করেছেন, "হে নৃসিংহদেব! আমি যদি আপনার চরণ-কমলের দাসত্ব লাভ করতে পারি, তা হলে আমার পক্ষে আপনার লীলা শ্রবণ করা সম্ভব হবে। আপনিই হচ্ছেন পরম সুহৃৎ, পরম আরাধ্য ভগবান। আপনার

দিব্য লীলাসমূহ শ্রবণ করা মাত্র সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। তাই সেই সমস্ত পাপকর্মকে আমি আর ভয় করি না, কারণ আপনার লীলাসমূহ শ্রবণ করার ফলে আমি অনায়াসে জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারব।"

ভগবানের লীলা সম্বন্ধীয় বহু গান রয়েছে। যেমন, ব্রহ্মা *ব্রহ্ম-সংহিতায়* গেয়েছেন, নারদ মুনি *নারদ-পঞ্চরাত্রে* গেয়েছেন, এবং শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* গেয়েছেন। কোন মানুষ যদি এই সমস্ত সঙ্গীত শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে জড়-জগতের কলুষিত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী এই সমস্ত সঙ্গীত শ্রবণ করা অত্যন্ত সহজ। কোটি কোটি বছর ধরে এই সমস্ত সঙ্গীত গান করা হচ্ছে এবং আজও মানুষ সেগুলি গাইছে। সুতরাং এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে কেন মানুষ জড় জগতের কলুষিত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে না?

*শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৫/২২) নারদ মুনি তাঁর শিষ্য ব্যাসদেবকে বলছেন, "হে ব্যাস! জেনে রাখ যে, তপ, ত্যাগ, বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, দান আদি পুণ্য কর্মগুলির একমাত্র পরম ফল হচ্ছে ভক্তসঙ্গে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা।" এখানে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবানের মহিমা কীর্তন হচ্ছে জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য।

## জপ

মৃদুমন্দ স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে বলা হয় জপ, এবং উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে বলা হয় কীর্তন। যেমন, মহামন্ত্র (*হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।*) যখন কেবল নিজের শোনার জন্য আস্তে আস্তে উচ্চারণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় জপ। সেই মন্ত্রই যখন সকলের শোনার জন্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় কীর্তন। মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন দুটিই করা যায়। জপের ফলে কেবল নিজেরই লাভ হয়, কিন্তু কীর্তনের ফলে শ্রবণকারী সহ সকলেরই কল্যাণ হয়।

*পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যে মানুষ ভগবানের দিব্য নাম জপ অথবা কীর্তন করেন, তাঁর কাছে স্বর্গসুখ ও মোক্ষ লাভের পন্থা তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত হয়।"

## আত্মনিবেদন

*স্কন্দ-পুরাণে* ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটি পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে—(১) *সম্প্রার্থনাত্মিকা*—গভীর আবেগের সঙ্গে ভগবানের প্রার্থনা করা; (২) *দৈন্যবোধিকা*—দীনভাবে ভগবানের

শরণাগত হওয়া; (৩) *লালসাময়ী*—সিদ্ধি লাভের অভিলাষী হওয়া। পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের এই প্রচেষ্টা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয়। মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দাসরূপে, সখারূপে, পিতা-মাতারূপে অথবা প্রেমিকারূপে তাঁর যে পরিচয়, সেটিই হচ্ছে যথার্থ স্বরূপ। একে বলা হয় লালসাময়ী, অথবা নিজের যথার্থ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঐকান্তিক বাসনা। আত্মনিবেদনের এই *লালসাময়ী* স্তর হচ্ছে যথার্থ মুক্তির স্তর, যাকে বলা হয় স্বরূপসিদ্ধি—জীব তখন আত্মজ্ঞান লাভ করে ভগবানের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্কের কথা জানতে পারে।

*পদ্ম-পুরাণে* ঐকান্তিকভাবে আত্মনিবেদনের ভাব প্রকাশিত হয়েছে ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রার্থনায়, "হে প্রভু! যুবতীরা যেমন স্বাভাবিকভাবে যুবকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং যুবকেরাও যেমন স্বাভাবিকভাবে যুবতীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আমি প্রার্থনা করি, আমার মন যেন ঠিক সেইভাবে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।" এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সুন্দর। যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে দর্শন করে পরিচয় ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়। যৌন আবেদনের ফলে কোন রকম শিক্ষা ব্যতীত স্বাভাবিকভাবেই এই আকর্ষণ দেখা দেয়। এটি অবশ্য একটি জড় দৃষ্টান্ত, কিন্তু ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তিনি তেমনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোন রকম লাভ-ক্ষতির বিচার বা অন্য কারণ ব্যতীতই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। ভগবানের প্রতি এই স্বাভাবিক আকর্ষণ হচ্ছে আত্মনিবেদনের চরম প্রকাশ।

*পদ্ম-পুরাণের* আর একটি জায়গায় দৈন্যভাবে আত্মনিবেদনের প্রার্থনা বর্ণনা করা হয়েছে— "হে প্রিয় প্রভু, আমার থেকে পাপী আর কেউ নেই। আমার থেকে বড় অপরাধীও কেউ নেই। আমি এত পাপী ও এত অপরাধী যে, আপনার সামনে সেই পাপের কথা স্বীকার করতে এসে আমার অত্যন্ত লজ্জা হয়।" এটি ভক্তের স্বাভাবিক অবস্থা। বদ্ধ জীব মাত্রই পূর্বজীবনে কিছু না কিছু পাপকর্ম করেছে, এবং ভগবানের সামনে সেই সমস্ত পাপের কথা স্বীকার করা উচিত। তা যখন করা হয়, পরমেশ্বর ভগবান তখন ঐকান্তিক ভক্তকে ক্ষমা করেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা ভগবানের এই অহৈতুকী কৃপার সুযোগ নিয়ে পাপ করে যেতে থাকব এবং আশা করব যে, তিনি আমাদের পাপ বারবার মোচন করতে থাকবেন। এটি হচ্ছে নির্লজ্জ মানুষদের মনোবৃত্তি। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "আমি যখন আমার পাপকর্মের কথা স্বীকার করতে আসি, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই।" সুতরাং, কেউ যদি তার পাপের জন্য লজ্জাবোধ না করে এবং পাপ স্বীকার করে নিলে ভগবান পাপমোচন করবেন, এই কথা জেনে ক্রমান্বয়ে সে একই পাপ করে যেতে থাকে, সেটি চরম নির্লজ্জতার প্রকাশ। এই ধারণা বৈদিক শাস্ত্রে স্থান

*অগ্নি-পুরাণে* বলা হয়েছে, "আনন্দের সঙ্গে কেউ যদি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহপূজা দর্শন করেন, তা হলে তিনি *পঞ্চরাত্রের ক্রিয়াযোগের* ফল প্রাপ্ত হন।" ক্রিয়াযোগ ভক্তিযোগেরই মতো অভ্যাসের পদ্ধতি, কিন্তু তা বিশেষ করে ধ্যানযোগীদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই পদ্ধতি অনুশীলন করে ক্রমান্বয়ে ধ্যানযোগী অবশেষে ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

পায়নি। ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে যে পূর্বকৃত সমস্ত পাপের মোচন হয়, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পাপমুক্ত হওয়ার পর আমরা আবার সেই পাপ করতে শুরু করব এবং আশা করব যে, ভগবানের দিব্য নামের প্রভাবে এই পাপ মোচন হয়ে যাবে। এই ধরনের ধারণাগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং ভগবদ্ভক্তিতে এর কোন স্থান নেই। কেউ মনে করতে পারে, "সারা সপ্তাহ ধরে আমি পাপ করে যাব আর সপ্তাহে একদিন মাত্র ভগবানের মন্দিরে অথবা গির্জায় গিয়ে ভগবানের কাছে আমার পাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে আসব, যাতে সেই পাপ মোচন হয়ে যায় এবং তারপর আবার পাপ করতে শুরু করব।" এটি সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং অপরাধজনক ধারণা, এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের প্রণেতা সেই মনোভাবের স্বীকৃতি দেননি।

*নারদ-পঞ্চরাত্রে* স্বরূপসিদ্ধি কামনা করে আত্মনিবেদনের বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্ত বলছেন, "হে প্রিয় প্রভু, সেই দিন কবে আসবে যখন তুমি আমাকে চামর ঢুলাতে বলবে, এবং তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তুমি বলবে, 'এইভাবে আমাকে বাতাস করো'।" এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভক্ত ব্যক্তিগতভাবে চামর ব্যজন করে ভগবানের সেবা করতে চাইছেন, অর্থাৎ ভগবানের নিজের পার্ষদ হওয়ার অভিলাষ করছেন। নিঃসন্দেহে দাস, সখা অথবা প্রেমিকরূপে প্রত্যেক ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সান্নিধ্যে থাকেন। নিজের রুচি অনুসারে তিনি কোন একভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার অভিলাষ করেন। এখানে ভক্ত ভগবানের দাস হয়ে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি লক্ষ্মীদেবীর মতো চামর ব্যজন করে তাঁর সেবা করতে চাইছেন। এখানে ভক্ত আরও অভিলাষ করেছেন যে, ভগবান যেন প্রসন্ন হয়ে 'এইভাবে চামর ব্যজন করো' বলে তাঁকে আদেশ দেন। এই দিব্য অভিলাষ অথবা *লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি* হচ্ছে স্বরূপ উপলব্ধির চরম স্তর।

*নারদ-পঞ্চরাত্রে* আর এক জায়গায় আত্মনিবেদনের প্রার্থনা করে ভক্ত বলছেন, "হে প্রিয় প্রভু! সেই দিন কবে আসবে যখন যমুনার তটে তোমার নাম কীর্তন করতে করতে আমার দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়বে এবং ভাবোন্মত্ত হয়ে আমি নৃত্য করব?" এটিও হচ্ছে সিদ্ধ অবস্থার প্রকাশ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই অভিলাষ প্রকাশ করে বলেছেন—*যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।* অর্থাৎ, "হে গোবিন্দ! তোমার বিরহে এক-একটি মুহূর্তকে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে, এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হচ্ছে।" অনুভূতি সহকারে এইভাবে প্রার্থনা করা উচিত এবং নিজের রুচি অনুসারে ভগবানের সেবা করতে উৎসুক হওয়া উচিত। সেটি হচ্ছে সমস্ত মহান আচার্যদের শিক্ষা, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা।

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের জন্য আকুল হয়ে ক্রন্দন করতে শিখতে হবে। কোন বিশেষভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে ক্রন্দন করতে হবে। একে বলা হয় *লৌল্যম্*, এবং এই অশ্রু হচ্ছে পরম সিদ্ধি লাভের মূল্য। কারও অন্তরে যদি এই *লৌল্যম্* প্রকাশিত হয় অথবা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং কোন বিশেষভাবে তাঁর সেবা করার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়, সেটি হচ্ছে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার মূল্য। এ ছাড়া কোন জড় হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার প্রবেশপত্রের মূল্য নিরূপণ করা যায় না। এই প্রবেশাধিকারের একমাত্র মূল্য হচ্ছে *লৌল্যম্ লালসাময়ী*, অথবা গভীর আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক বাসনা।

## স্তব পাঠ

মনীষীদের মত অনুসারে *ভগবদ্গীতা* বহু প্রামাণিক স্তরে পরিপূর্ণ, বিশেষ করে একাদশ অধ্যায়ে। কারণ, সেখানে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁর স্তব করেছিলেন। এইভাবে *গৌতমীয়-তন্ত্রে* সব কটি শ্লোকই হচ্ছে ভগবানের স্তব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তো ভগবানের শত শত স্তব রয়েছে। ভক্তের উচিত এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কিছু শ্লোক চয়ন করে প্রতিদিন তা পাঠ করা। *স্কন্দ-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যাঁর জিহ্বা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের স্তবরত্নের দ্বারা বিভূষিত, তিনি মুনি-ঋষিদের নমস্য এবং দেবতাদেরও আরাধ্য।"

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার পরিবর্তে জগৎকে ভোগ করার বাসনায় বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করতে চায়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের স্তব করেন, তিনি দেবতাদেরও আরাধ্য। শুদ্ধ ভক্তের কোন দেব-দেবীর কাছ থেকে কিছু চাওয়ার থাকে না, বরং সমস্ত দেব-দেবীরাই শুদ্ধ ভক্তের আরাধনা করার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন।

*নৃসিংহ-পুরাণে* বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে এসে বিভিন্ন স্তব পাঠ করেন, তিনি যে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

## প্রসাদ সেবন

*পদ্ম-পুরাণে* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "ভগবানের শ্রীবিগ্রহ থেকে একটু দূরে গিয়ে যে মানুষ তুলসী ও চরণামৃতযুক্ত ভগবানের প্রসাদ নিয়মিত সেবন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পুণ্য অর্জন করেন।"

## চরণামৃত পান

সকালবেলায় ভগবানকে শৃঙ্গার করার আগে ভগবানকে যে স্নান করানো হয়, সেই স্নানের জল হচ্ছে চরণামৃত। গন্ধ ও পুষ্পসহ সেই জল ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বেয়ে নেমে আসে এবং তা এক জায়গায় সংগ্রহ করে তার সঙ্গে দধি মেশানো হয়। এইভাবে চরণামৃত অতি মধুর আস্বাদপূর্ণ তো হয়ই, উপরন্তু তাতে প্রবল পারমার্থিক মাহাত্ম্য নিহিত থাকে। *পদ্ম-পুরাণের* বর্ণনা অনুসারে, যে মানুষ কোন দিনও দান, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, অর্চন আদি কোন রকম পুণ্যকর্ম করেনি, সে-ও ভগবানের মন্দিরে গিয়ে চরণামৃত পান করে পরম ধামে প্রবেশ করার যোগ্য হয়। মন্দিরে চরণামৃত বড় পাত্রে রাখার প্রথা আছে। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও অভিবাদন করতে এসে ভক্ত নম্রভাবে এই চরণামৃতের তিনটি বিন্দু পান করে পরমানন্দ লাভ করেন।

## অর্পিত ধূপ ও পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণ

*হরিভক্তি-সুধোদয়ে* উল্লেখ করা হয়েছে, "কোন বিশেষ ওষধি আঘ্রাণ করার ফলে যেমন সাপের বিষ কেটে যায়, তেমনই ভগবানকে অর্পিত সুগন্ধি পুষ্প আঘ্রাণ করার ফলে জড় বিষয়ের বিষময়ী প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" জঙ্গলে এক রকম ওষধি পাওয়া যায়, যা সাপুড়েরা সর্প-দংশনে অচেতন মানুষের চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করেন। কেবলমাত্র সেই ওষধি আঘ্রাণ করার ফলে সাপের বিষের প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। তেমনই, কোন মানুষ যখন মন্দিরে এসে ভগবানকে নিবেদিত সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপ আঘ্রাণ করেন, তখন তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।

মন্দিরে গিয়ে ভক্তের উচিত ফল, ফুল, ধূপ ইত্যাদি কোন না কোন পদার্থ ভগবানকে অবশ্যই অর্পণ করা। ধন দান করার সামর্থ্য যদি না থাকে, তা হলে অন্য কিছু ভগবানকে নিবেদন করা যায়। সকালবেলায় মন্দিরে গিয়ে মানুষ নানা রকম উপঢৌকন ভগবানকে দেন। বিশেষ কিছু না দিতে পারলেও অন্তত একমুঠো চাল ভগবানকে নিবেদন করা যায়। শাস্ত্রের বিধি হচ্ছে, কোন রকম উপঢৌকন না নিয়ে সাধুসন্ত অথবা মন্দিরে ভগবানের শ্রীমূর্তি দর্শন করতে যাওয়া উচিত নয়। সেই নিবেদন যতই তুচ্ছ বা মূল্যহীন হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। ফল, ফুল, জল ইত্যাদি যা পাওয়া যায়, তা-ই ভগবানকে অর্পণ করা উচিত। কোন ভক্ত যখন মন্দিরে ভগবানের দর্শনের জন্য যান, তখন তিনি অবশ্যই ধূপ আঘ্রাণ করবেন এবং তার ফলে তিনি ভবরোগের বিষ থেকে মুক্ত হবেন।

*তন্ত্রশাস্ত্রে* বলা হয়েছে, "ভগবানকে নিবেদিত ফুলের মালার সৌরভ যখন কোন মানুষের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সমস্ত পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। কেউ যদি কোন পাপকর্ম করেও থাকেন, কিন্তু তবুও কেবলমাত্র ভগবানকে নিবেদিত সুগন্ধি পুষ্প আঘ্রাণ করে, তিনি নির্বিশেষবাদের বিষময় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তে পরিণত হতে পারেন।" এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সনকাদি চার কুমারের ভগবৎ-ধামে উন্নতি তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এই চার কুমারেরা ছিলেন নির্বিশেষবাদী, কিন্তু ভগবানের মন্দিরে ভগবানকে নিবেদিত সুগন্ধি পুষ্প আঘ্রাণ করার ফলে, তাঁরা ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। উপরোক্ত এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরাও কিছুমাত্রায় কলুষিত। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নির্মল নন।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে, "যিনি সমস্ত পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেননি, তিনি ভক্ত হতে পারেন না। শুদ্ধ ভক্তের পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ থাকে না, এবং তার ফলে তিনি নিরন্তর কৃষ্ণভাবনা ও ভক্তিযোগে যুক্ত থাকেন।" *অগস্ত্য-সংহিতাতেও* এই রকম একটি বর্ণনা রয়েছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশুদ্ধিকরণের জন্য মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পিত পুষ্পের আঘ্রাণ নেওয়া উচিত।

## শ্রীবিগ্রহ স্পর্শন

*বিষ্ণুধর্মোত্তরে* শ্রীমূর্তির চরণারবিন্দ স্পর্শ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "যে মানুষ বৈষ্ণব দীক্ষায় দীক্ষিত এবং কৃষ্ণভাবনাময়ে ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করার অধিকারী।" বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে শূদ্র, চণ্ডাল আদি অধম শ্রেণীর মানুষদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই নিষেধ তাদের অশুদ্ধ আচরণের জন্য। কিন্তু গান্ধীর দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় সেই বৈদিক পদ্ধতির বিরোধিতা করা হয়েছিল। অধম শ্রেণীর মানুষদের অশুদ্ধ আচরণের জন্য মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সেই নীচ-কুলোদ্ভূত মানুষেরা যদি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে শুরু করে, তা হলে তারাও সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে। নীচকুলে জন্ম হওয়ার ফলে মানুষের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হচ্ছে না, তার নিষেধের কারণ হচ্ছে তার অশুদ্ধ আচরণ। তাই বিশুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া অবশ্যই অঙ্গীকার করতে হবে। গান্ধী কেবল তাদের পিঠে হরিজন ('ভগবানের সন্তান') ছাপ মেরে তাদের শুদ্ধিকরণ করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই মন্দিরের ব্যবস্থাপক ও গান্ধীর অনুগামীদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ বাধে।

কিন্তু শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে—কেউ যদি কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়, তা হলে সে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সেটিই হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ। যিনি যথাযথভাবে দীক্ষিত হয়েছেন, যিনি যথাযথভাবে শাস্ত্রের নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করছেন, তিনিই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে পারেন—সকলে তা পারে না। যে মানুষ বিধি-নিষেধগুলি যথাযথভাবে অনুশীলন করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং অচিরেই তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়।

## শ্রীবিগ্রহ দর্শন

মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শনের মহিমা *বরাহ-পুরাণে* কীর্তিত হয়েছে। এক ভক্ত বলছেন, "হে বসুন্ধরে! যে মানুষ বৃন্দাবনে গিয়ে গোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, তিনি যমালয় থেকে মুক্ত হন এবং সর্বোচ্চ লোকে প্রবিষ্ট হওয়ার অনুমতি লাভ করেন, যে লোকে দেবতারা বাস করেন।" অর্থাৎ, যদি কোন সাধারণ মানুষও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে ঘটনাক্রমে ভগবানের শ্রীমন্দির দর্শন করেন, বিশেষ করে গোবিন্দদেবের মন্দির দর্শন করেন, তিনি যদি ভগবৎ-ধামে উন্নীত নাও হতে পারেন, তবুও অন্তত তিনি যে স্বর্গলোকে উন্নীত হবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করার ফলে অগাধ পুণ্য অর্জিত হয়।

## আরতি দর্শন ও উৎসব অনুষ্ঠান

ভগবানের আরতি সম্বন্ধে *স্কন্দ-পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে, "কেউ যদি আরতির সময় ভগবানের শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করেন, তা হলে তিনি কোটি কোটি বছরের সঞ্চিত সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। তিনি এমন কি ব্রহ্মহত্যার মতো জঘন্যতম পাপ থেকেও মুক্ত হন।"

পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, রামনবমী, মহান বৈষ্ণবদের জন্মতিথি, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা আদি বিভিন্ন উৎসবের অনুষ্ঠান করা উচিত। ভগবানের উৎসবের দিনগুলিতে রথে করে ভগবানকে নিয়ে শোভাযাত্রা বার করা হয়, যার ফলে মানুষ অনায়াসে ভগবানের দর্শন লাভ করতে পারে। *ভবিষ্য-পুরাণে* বলা হয়েছে, "এই সমস্ত উৎসবের দিনে যদি কোন চণ্ডালও (যে মানুষ কুকুরের মাংস আহার করে) কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রথে উপবিষ্ট ভগবানকে দর্শন করে, তা হলে সেও বিষ্ণুর পার্ষদত্ব লাভ করে।"

*অগ্নি-পুরাণে* বলা হয়েছে, "আনন্দের সঙ্গে কেউ যদি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহপূজা দর্শন করেন, তা হলে তিনি *পঞ্চরাত্রের ক্রিয়াযোগের* ফল প্রাপ্ত হন।" ক্রিয়াযোগ ভক্তিযোগেরই মতো অভ্যাসের পদ্ধতি, কিন্তু তা বিশেষ করে ধ্যানযোগীদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই পদ্ধতি অনুশীলন করে ক্রমান্বয়ে ধ্যানযোগী অবশেষে ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

# দশম অধ্যায়

# শ্রবণ ও স্মরণের প্রক্রিয়া

## শ্রবণ

কৃষ্ণভাবনা অথবা ভগবদ্ভক্তি শুরু হয় শ্রবণের মাধ্যমে। সমস্ত মানুষকেই ভক্তগোষ্ঠীতে এসে ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করার জন্য এই শ্রবণের পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যখন শব্দব্রহ্ম শ্রবণ করার জন্য তাঁর কর্ণ-বিবরকে যুক্ত করেন, তখন তিনি শীঘ্রই পবিত্র হন এবং তাঁর হৃদয় কলুষমুক্ত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই শ্রবণের মাহাত্ম্যের উপর গভীর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই শ্রবণ বদ্ধ জীবের হৃদয় পবিত্র করে, যার ফলে তিনি অচিরেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারেন এবং ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হতে সমর্থ হন।

*গরুড়-পুরাণে* অতি সুন্দরভাবে শ্রবণের মহিমা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবের অবস্থা ঠিক একটি সর্পদংশনে অচেতন মানুষের মতো। কারণ, এই দুটি অচেতন অবস্থাই মন্ত্রের প্রভাবে নিরাময় হতে পারে।" কোন মানুষকে যখন বিষাক্ত সর্প দংশন করে, তখন তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয় না, প্রথমে সে অচেতনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষও নিদ্রামগ্ন, কেন না তার যথার্থ স্বরূপ, তার কর্তব্য এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা তার কিছুই মনে নেই। তাই বদ্ধ জীবন মানে হচ্ছে মায়াসর্পের দংশনে অচেতন কৃষ্ণভক্তি-বিহীন মৃতপ্রায় জীবন। কিন্তু এই তথাকথিত সর্প-দংশনে মৃতপ্রায় মানুষদের মন্ত্র উচ্চারণের প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। এই মন্ত্রবিদ্যার অনেক বিশারদ আছেন। ঠিক তেমনই *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—এই মহামন্ত্র শ্রবণ করার ফলে, যে কেউ মৃতপ্রায় অচেতন অবস্থা থেকে পুনরায় কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* চতুর্থ স্কন্ধে (৪/২৯/৪০) ভগবানের লীলা শ্রবণের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎকে বলেছেন, "হে রাজন! যেস্থানে মহান আচার্যরা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ আলোচনা করেন,

সেই স্থানে বাস করা উচিত এবং সেই সমস্ত মহাত্মাদের মুখচন্দ্র থেকে নিঃসৃত কৃষ্ণলীলা রসসুধার ধারা কর্ণপুটের মাধ্যমে অহর্নিশি পান করা উচিত। কেউ যদি ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে এইভাবে সেই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করেন, তা হলে অচিরেই তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, সুখ ও বদ্ধ জীবনের মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে অবশ্যই মুক্ত হবেন।"

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই কলিযুগে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পন্থারূপে ভগবানের নাম শ্রবণের প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করেছেন। পুরাকালে যেমন বেদপাঠ করে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে অনুশীলন করা হত, তা এই কলিযুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি মহান ভক্ত ও আচার্যদের মুখ-নিঃসৃত বাণী ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করেন, তা হলে তার ফলে তিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মুখারবিন্দ থেকে ভগবানের বাণী শ্রবণ করার জন্য। ভগবানের নাম করে যারা পয়সা রোজগার করে, তাদের কথা শুনলে কোন কাজ হবে না। যাঁরা যথার্থই তত্ত্বদ্রষ্টা, আত্মজ্ঞানী, তাঁদের কাছ থেকে ভগবানের কথা শুনলে কৃষ্ণলীলা-রসের অমৃতের ধারা আমাদের কর্ণপুটে প্রবাহিত হতে থাকে। পূর্ববর্তী শ্লোকে এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে।

*ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে, "কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়ার ফলে বিষয়াসক্ত মানুষ বিষয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।" মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উত্তম কার্যে লিপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার তুচ্ছ কার্য থেকে বিরত হতে পারে না। প্রাকৃত জগতে জীব প্রকৃতির মায়িক কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির দিব্য কার্যকলাপের মহৎ আনন্দ আস্বাদন করলে, তখন স্বল্প-সুখদায়ক জড় কার্যকলাপের প্রতি আর কোন আসক্তি থাকে না। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের কাছে মনে হবে সেটি যেন দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র থেকে নিঃসৃত অমৃতের ধারা। সেই অমৃত প্রবাহ অর্জুন শ্রবণের মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সব রকম জড় সমস্যার মোহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে (১২/৩/১৫) বলা হয়েছে, "যে মানুষ উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভের অভিলাষী, তার কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষণ তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলীর মহিমা শ্রবণ করা। তার ফলে অবশ্যই হৃদয়ের সমস্ত কলুষ বিদূরিত হয়।"

## ভগবানের কৃপার প্রত্যাশী হওয়া

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে, "হে প্রভু! যে মানুষ সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল বলে মনে করেন, এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আপনাকে প্রণতি জানিয়ে আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রতীক্ষা করেন, তিনি অচিরেই মুক্তি লাভের অধিকারী হন।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বাণী সমস্ত ভক্তের পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত। পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হওয়ার আশা করা ভক্তের উচিত নয়। কোন বদ্ধ জীবই কর্মফল থেকে মুক্ত নয়। কারণ জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবন মানেই হচ্ছে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করা। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ যখন সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়, তখনই কেবল কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং তখন আর পুনর্জন্ম হয় না। তা সম্ভব হয় কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে, কেন না ভগবানের সেবাময়ী কার্যকলাপের কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। তাই কেউ যখন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি অর্জন করেন, তখন আর তাঁর এই জড় জগতে পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যে মানুষ কর্মফলের বন্ধন থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেননি, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সব রকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে যাওয়া। যখন এই ধরনের বাধা-বিপত্তিগুলি আসে, তখন কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতীক্ষা করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই হচ্ছে তখন একমাত্র সান্ত্বনা। এই রকম মনোভাব নিয়ে ভক্ত যখন তাঁর দিন যাপন করেন, তখন অবশ্যই তিনি ভগবানের ধামে উন্নীত হবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি ভগবানের ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই শ্লোকে এই সম্বন্ধে *দায়ভাক্* কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। *দায়ভাক্* কথাটির অর্থ হচ্ছে ন্যায়-সঙ্গতভাবে পুত্রের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া। ঠিক তেমনই, শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনাময় অপ্রাকৃত ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

## স্মরণ

যে কোনওভাবে কেউ যদি তাঁর চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের চিন্তায় নিবদ্ধ করেন, তাকে বলা হয় স্মরণ। এই স্মরণ সম্বন্ধে *বিষ্ণু-পুরাণে* খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে, "কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার ফলে জীবের সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তাই সেই অজ, নিত্য, শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবানকে আমি স্মরণ করতে চাই।" *পদ্ম-পুরাণেও* এই স্মরণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি

নিবেদন করি, কারণ জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর ক্ষণে কেউ যদি তাঁকে স্মরণ করেন, তা হলে তিনি সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হন।"

## ধ্যান

ধ্যানের অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা আদির চিন্তায় মনকে নিমগ্ন করে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া। রূপহীন, গুণহীন কোন কিছুর কল্পনা করা বা শূন্যের কল্পনা করা ধ্যান নয়। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ধ্যানের অর্থ হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর রূপ দর্শনে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ করা।

*নৃসিংহ-পুরাণে* ভগবানের ধ্যান করা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান জড় জগতের সুখ-দুঃখ অনুভূতির অতীত চিন্ময় অবস্থা। এই ধ্যানের প্রভাবে মহাপাপীও তার পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে।"

*বিষ্ণুধর্মে* ভগবানের দিব্য গুণাবলীর ধ্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "যে সমস্ত মানুষ নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত, এবং যাঁরা নিরন্তর ভগবানের দিব্য গুণাবলীর কথা স্মরণ করেন, তাঁরা অচিরেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং এইভাবে পবিত্র হয়ে তাঁরা ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করার যোগ্য হন।" পক্ষান্তরে বলা যায়, সর্বতোভাবে পাপমুক্ত না হলে ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করা যায় না। পাপমুক্ত হওয়া যায় কেবলমাত্র ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি স্মরণ করার মাধ্যমে।

*পদ্ম-পুরাণে* ভগবানের লীলা স্মরণ করা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "যে মানুষ নিরন্তর ভগবানের অমৃতময় লীলা ও অদ্ভুত কার্যকলাপের চিন্তায় সর্বক্ষণ মগ্ন, তিনি অবশ্যই সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।"

কতকগুলি *পুরাণে* প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি কোন মানুষ কেবল ভগবানের সেবার ধ্যান করেন, তাঁর সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। এই সম্বন্ধে *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* একটি সুন্দর কাহিনী আছে। দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠানপুর নামক স্থানে একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি খুব একটা অবস্থাপন্ন ছিলেন না, কিন্তু তিনি সব সময় মনে করতেন, "পূর্বজন্মে আমি নিশ্চয়ই অনেক পাপ করেছিলাম, তাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় আমি পর্যাপ্ত ধনসম্পদ লাভ করতে পারিনি।" এই কথা মনে করে তিনি সর্বক্ষণ আত্মতৃপ্ত থাকতেন। তাই তাঁর দরিদ্রতার জন্য তাঁর হৃদয়ে লেশমাত্রও গ্লানি ছিল না, এবং তিনি অত্যন্ত শান্তিতে জীবন যাপন করতেন। তিনি পরম উদার ছিলেন এবং কখনও কখনও তিনি মহাত্মাদের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের বাণী শুনতে যেতেন। এই রকম এক সভায় তিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে, মনে মনেও ভগবানের সেবা

করা যায়। অর্থাৎ বাস্তবিকভাবে সেবা না করা গেলেও মনে মনে ভগবানের সেবার ধ্যান করা যায়, এবং তার ফলে একই ফল লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, তাই তিনি মনস্থ করলেন যে, অসীম ঐশ্বর্য সহকারে মনে মনে ভগবানের সেবা করার ধ্যান করবেন, এবং তিনি তাই করতে শুরু করলেন—

তিনি গোদাবরীতে স্নান করে সেই নদীর তীরে নির্জনে বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করার মাধ্যমে তাঁর চিত্তকে ভগবানের ধ্যানে নিবদ্ধ করতেন। এই প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে চিত্তকে একটি যন্ত্রের মতো কোন বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করা যায়। প্রাণায়াম ও আসনের এটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য। পুরাকালে সাধারণ মানুষও জানতেন কিভাবে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্র করতে হয়। সেই ব্রাহ্মণও সেই অভ্যাস করছিলেন। এইভাবে ধ্যান করার ফলে হৃদয়ে ভগবানের রূপ প্রকাশিত হলে, তিনি তাঁকে বহু মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, মুকুট ও অন্যান্য ভূষণে বিভূষিত করতেন। তারপর তিনি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করতেন। শৃঙ্গার সমাপ্ত হলে, তিনি কল্পনা করতেন যে, তিনি খুব সুন্দরভাবে মন্দির মার্জন করছেন। মন্দির মার্জন হলে, তিনি মানসে কল্পনা করতেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বহু পাত্র করে তিনি বিভিন্ন নদী থেকে পুণ্য সলিল আহরণ করেছেন। তিনি কেবল গোদাবরী থেকেই জল সংগ্রহ করতেন না, তিনি গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কাবেরী আদি সমস্ত পবিত্র স্রোতস্বিনী থেকে জল সংগ্রহ করতেন। ভগবানের পূজা করার সময় বৈষ্ণব ভক্ত সাধারণত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে এই সমস্ত নদী থেকে জল সংগ্রহ করেন। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্র উচ্চারণ করে ধ্যানের মাধ্যমে এই সমস্ত নদী থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত জলপাত্রে পবিত্র জল সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর তিনি পুষ্প, ফল, ধূপ, চন্দন আদি—পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতেন। ভগবানের বিগ্রহকে অর্পণ করবার জন্য তিনি এই সমস্ত সংগ্রহ করেছিলেন। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এই জল, পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভগবানের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হত। তারপর তিনি ভগবানের আরতি করতেন, এবং এইভাবে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে তিনি ভগবানের পূজা করতেন।

প্রতিদিন তিনি এইভাবে নিয়মিত ভগবানের অর্চনা করতেন। এইভাবে বহু বছর ধরে তিনি ভগবানের পূজা করলেন। তারপর একদিন সেই ব্রাহ্মণ ধ্যানে ভগবানের জন্য পায়েস তৈরি করলেন। কিন্তু ভগবানের সেই নৈবেদ্য তাঁর মনঃপূত হল না, কেন না সেই পায়েস তখনই তৈরি করা হয়েছিল এবং তা তখনও বেশ গরম ছিল। (পায়েস গরম থাকলে তেমন উপাদেয় হয় না। ঠাণ্ডা পায়েসই অধিক উপাদেয়।) তাই সেই ব্রাহ্মণ সদ্যপ্রস্তুত পায়েস তখন কতটা গরম আছে এবং তা ভগবানের আহারের উপযোগী হয়েছে কি না, তা দেখবার জন্য সেই পায়েসের

পাত্রে তাঁর আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। সেই পায়েসের পাত্র আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করা মাত্রই তাঁর আঙ্গুলে সেই উত্তপ্ত পায়েসের তাপ লাগল এবং তার ফলে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। তখন তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে, তার আঙ্গুলে ফোস্কা পড়েছে এবং কিভাবে তা ঘটল তা ভেবে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। কারণ তিনি কখনও ভাবেননি যে, ধ্যানে তপ্ত পায়েস স্পর্শ করার ফলে তাঁর আঙ্গুল পুড়ে যাবে।

এইভাবে তিনি যখন ভাবছিলেন, তখন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর পার্শ্বে উপবিষ্ট ভগবান নারায়ণ ঈষৎ হাসলেন। ভগবানকে এইভাবে হাসতে দেখে, সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত উৎসুক হয়ে ভগবান নারায়ণকে তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে সেইখানে নিয়ে আসার জন্য তাঁর দূতদের পাঠালেন। বৈকুণ্ঠলোকে থেকে তৎক্ষণাৎ নারায়ণের কাছে সেই ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসার জন্য একটি বিমান প্রেরণ করা হল। তারপর ব্রাহ্মণকে যখন ভগবানের সামনে নিয়ে আসা হল, তখন ভগবান লক্ষ্মীদেবীকে সমস্ত ঘটনা বললেন। সেই ব্রাহ্মণ এইভাবে নিত্যধাম বৈকুণ্ঠলোক লক্ষ্মী-নারায়ণের নিত্য সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, ভগবান সর্বব্যাপ্ত। যদিও তিনি তাঁর ধামে বিরাজ করছেন, কিন্তু তবুও তিনি সর্বত্রই রয়েছেন। যদিও তিনি বৈকুণ্ঠে ছিলেন, কিন্তু তবুও সেই ব্রাহ্মণ যখন ধ্যানে তাঁর পূজা করছিলেন, তখন তিনি তাঁর হৃদয়েও বিরাজ করছিলেন। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, ধ্যানের মাধ্যমে যখন ভগবানকে কিছু অর্পণ করা হয়, তখন তিনি তা গ্রহণ করেন এবং তার ফলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

## একাদশ অধ্যায়

# ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ

### দাস্য

সকাম কর্মীদের মতো কর্মফল অর্পণকেই দাস্য বলা হয়। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যদের মতে, কোন না কোনভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকাই হচ্ছে দাস্যের স্বরূপ।

*স্কন্দ-পুরাণে* বলা হয়েছে যে, কর্মকাণ্ড ও বর্ণাশ্রম আচরণকারী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত। কিন্তু ভক্ত যখন সরাসরিভাবে তাঁর সমস্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করেন, তখন তাঁকে ভাগবত বা শুদ্ধ ভক্ত বলা হয়। যাঁরা সকাম কর্মে যুক্ত অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করছেন, তাঁরা শুদ্ধ ভক্ত নন। কিন্তু তবুও যেহেতু তাঁরা তাঁদের কর্মের ফল ভগবানকে অর্পণ করছেন, তাই তাঁদের ভক্ত বলে স্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ যখন সব রকম কামনা-বাসনা রহিত হয়ে, ভগবৎ-প্রেমের বশবর্তী হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করতে থাকেন, তখন তাঁকে শুদ্ধ ভক্ত বলে গণ্য করা হয়। এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ সমস্ত বদ্ধ জীবই কিছু না কিছু পরিমাণে এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। কর্মকাণ্ডীয় বিধি-নিষেধ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করার ফলে, বদ্ধ জীব তার কামনা-বাসনা অনুসারে এই জড় জগৎকে ভোগ করে তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি জনিত সুখ উপভোগ করতে পারে, এবং ধীরে ধীরে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারে। বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত অনেক কর্তব্য রয়েছে, যা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের অঙ্গ। গৃহস্থ উক্ত বৈদিক কর্ম ও বৈধীভক্তি উভয়ই অনুশীলন করেন, কারণ এই দুটি কার্যই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম করেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয়, তা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

ভগবদ্ভক্তির অধিকারীর যোগ্যতা বর্ণনা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, নব্য ভক্ত তাঁর ভগবৎ-প্রেমের মাত্রা অনুসারে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি বিরক্তি অনুভব করেন। কিন্তু তবুও যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনিত কার্যকলাপের প্রতি

আসক্তি থেকে থাকে, তা হলে সেই সমস্ত কার্যকলাপের ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত। এই ভাবকে বলা হয় দাস্যভাব। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রভু এবং তাঁর সেবক হচ্ছে ভৃত্য।

*নারদীয়-পুরাণে* এই দাস্য ভাবের চিন্ময় গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যে মানুষ কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, এমন কি যদি কেউ সেইভাবে ভগবানের সেবা করার আকাঙ্ক্ষাও করেন, তা হলে তাঁকে মুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

## সখ্যভাব

সখ্যভাবকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবক, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভগবানের শুভাকাঙ্ক্ষী। ভগবদ্ভক্তিতে যাঁদের সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, তাঁরা নিঃসংশয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করার জন্য ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি যথাক্রমে পালন করেন। দ্বিতীয় প্রকারের ভগবদ্ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের শুভাকাঙ্ক্ষী হন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, ভগবানের বাণীর প্রচারকেরা হচ্ছেন ভগবানের সব চাইতে প্রিয় পাত্র। যে মানুষ *ভগবদ্গীতার* নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান জনসাধারণের কাছে বিতরণ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের এত প্রিয় যে, সমগ্র মানব-সমাজে কেউ তাঁর তুল্য হতে পারে না।

*মহাভারতে* দ্রৌপদী বলেছেন, "হে গোবিন্দ, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ যে, তোমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না। তোমার সেই উক্তিতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আর তাই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আমি কেবল তোমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করি এবং তাঁর ফলে আমি জীবন ধারণ করতে সমর্থ হই।" এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবেরা তাঁদের জ্ঞাতি ভাই দুর্যোধনের দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হয়েছিলেন। তাঁদের এত কঠোর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল যে, তাঁদের পিতামহ ভীষ্মদেব, যিনি ছিলেন আকুমার ব্রহ্মচারী এবং একজন মহারথী, তিনিও তাঁদের কথা চিন্তা করে চোখের জল ফেলতেন। এই কথা ভেবে তিনি সর্বদাই আশ্চর্যান্বিত হতেন যে, যদিও পাণ্ডবেরা হচ্ছেন পরম পুণ্যাত্মা এবং দ্রৌপদী হচ্ছেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী, আর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁদের সখা, তবুও তাঁদের এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও দ্রৌপদী বিচলিত হননি। তিনি জানতেন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁদের সখা, তাই অবশেষে তাঁদেরই জয় হবে।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২/৫৩) মহারাজ ঋষভদেবের পুত্র হবি মহারাজ নিমিকে বলেছেন, "হে রাজন! যে মানুষ ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদেরও

ঈপ্সিত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা থেকে ক্ষণিকের জন্যও বিরত হন না, কেন না তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, ভগবানই হচ্ছেন পরম আরাধ্য এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবাই হচ্ছে চরম কাম্য, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ভক্ত।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত, যিনি কেবল ভগবানের প্রতি স্বল্প পরিমাণে শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েছেন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির সুযোগ্য অধিকারী। তাঁর শ্রদ্ধা যখন সুদৃঢ় হয়, তখন তিনি অন্তরঙ্গভাবে ভক্তিমার্গে অধিষ্ঠিত হন।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, কোন শুদ্ধ ভক্ত অন্তরঙ্গ সখারূপে ভগবানের সেবা করার জন্য ভগবানের মন্দিরে শয়ন করে থাকেন। ভক্তের এই সখ্য ব্যবহারকে রাগানুগা বা স্বতঃস্ফূর্ত ভগবদ্ভক্তি বলা হয়। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের মন্দিরে কারও শয়ন করা উচিত নয়, কিন্তু ভগবানের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম সখ্যভাবে ভগবানের সেবা করার অন্তর্গত।

## সর্বস্ব সমর্পণ

সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২৯/৩৪) খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে ভগবান বলছেন, "যে মানুষ সর্বতোভাবে আমার চরণে আত্মনিবেদন করে অন্য সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে, ইহলোকে ও পরলোকে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে রক্ষা করি। অর্থাৎ পারমার্থিক জীবনে ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করার জন্য আমি তাকে সাহায্য করি। এই ধরনের মানুষ ইতিমধ্যেই 'সার্ষ্টি' নামক মুক্তি (ভগবানের মতো সমান ঐশ্বর্য) লাভ করেছেন বলে বুঝতে হবে।" *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সমস্ত পাপ থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। হৃদয়াভ্যন্তর থেকে তিনি তাঁদের পরিচালিত করেন, যাতে অচিরেই সেই ভক্ত পারমার্থিক মার্গে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

এই পূর্ণ শরণাগতিকে বলা হয় আত্মনিবেদন। প্রসঙ্গ অনুসারে 'আত্ম' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আত্ম বলতে কখনও কখনও আত্মাকে বোঝায়, আর 'আত্ম' বলতে কখনও কখনও মন অথবা দেহকে বোঝায়। তাই পূর্ণ আত্মনিবেদন বলতে কেবল আত্মাকে নিবেদনই বোঝায় না, ভগবানের সেবায় মন ও দেহকে নিবেদনও বোঝায়। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি খুব সুন্দর গান গেয়েছেন। ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর । অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর।। সম্পদে-বিপদে,

জীবনে-মরণে। দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে।। মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা।।"

এই ভাব ব্যক্ত করে যামুনাচার্যও প্রার্থনা করেছেন, "হে ভগবান, আমি মনুষ্য-শরীরে অথবা দেবশরীরে থাকতে পারি, কিন্তু যে রকম জীবনই আমি প্রাপ্ত হই না কেন, আমি তার প্রতি কোনভাবেই আগ্রহী নই। কারণ সেই শরীরগুলি হচ্ছে কেবল জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সৃষ্টি, কিন্তু আমি তোমার চরণে নিজেকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করছি।"

*হরিভক্তি-বিবেক* গ্রন্থে শরীরের মাধ্যমে আত্মনিবেদনের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "হে ভগবান! বিক্রীত পশু যেমন তার শরীর ধারণ ও রক্ষার বিষয়ে চিন্তা করে না, তেমনই আমি যেহেতু আমার দেহ ও আত্মা তোমাকে নিবেদন করেছি, সুতরাং আমিও আর সেই শরীর ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা চিন্তা করি না।" পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে তখন আর শরীর ধারণ এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য চিন্তা করতে হয় না। কেউ যখন দেহ ও আত্মা যথার্থভাবে ভগবানের চরণে নিবেদন করেন, তখন তাঁর সর্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, তাঁর একমাত্র কার্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, সখ্যভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া এবং ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন, ভক্তির এই দুটি অঙ্গ অত্যন্ত দুষ্কর। তাই এই ধরনের ভক্তরাই কেবল ভগবদ্ভক্তির এই অঙ্গ দুটি সাধন করতে পারেন। অর্থাৎ ঐকান্তিক প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবাযুক্ত আত্মনিবেদন অত্যন্ত বিরল। আত্মনিবেদনের অর্থ হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করা।

## প্রিয় বস্তু সমর্পণ

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১১/৪১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, "হে সখে! কোন মানুষ যখন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি আমাকে নিবেদন করে, অথবা তার প্রিয় বস্তু আমাকে নিবেদন করে, তখন তার অপরিসীম লাভ হয়।"

## ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা করা

ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করার দৃষ্টান্ত *নারদ-পঞ্চরাত্রেও* রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভগবদ্ভক্তির অভিলাষী মানুষের উচিত ভগবানের সেবার জন্য সব রকম লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কার্যকলাপের প্রয়াসী হওয়া। অর্থাৎ, ভক্তির শাস্ত্রবিহিত বিধানগুলি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভাবনায়

ভাবিত হয়ে ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্যগুলিও পালন করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন ভক্তের যদি বড় ব্যবসা থাকে বা বড় কারখানা থাকে, তা হলে তিনি তাঁর সেই লৌকিক সম্পত্তির ফল ভগবানের সেবায় নিবেদন করতে পারেন।

## আত্মনিবেদন

*হরিভক্তি-বিলাসে* আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "হে ভগবান! যে মানুষ নিজেকে তোমার চরণে নিবেদন করেছেন, যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে তিনি তোমারই, এবং এই মনোভাব নিয়ে যিনি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করেন, তিনি অবশ্যই দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন।"

*নৃসিংহ-পুরাণে* শ্রীনৃসিংহদেব বলেছেন, "যে মানুষ আমার কৃপা প্রার্থনা করে, যে মানুষ আমার আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমার কাছে প্রার্থনা করে, তাকে আমি সর্বদাই রক্ষা করি এবং সব রকম দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার করি।"

## তুলসীসেবা

*স্কন্দ-পুরাণে* তুলসীর মহিমা কীর্তন করে বলা হয়েছে, "যাঁর দর্শনে পাপ ও রোগ নাশ হয়, স্পর্শের ফলে শরীর শুদ্ধ হয়, জল সিঞ্চন করার ফলে ভয় দূর হয়, রোপণ করার ফলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করার ফলে পূর্ণ ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়, সেই তুলসী দেবীর চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুরাই তুলসী দেবীর বিশেষ পরিচর্যা করেন। এমন কি বড় বড় শহরেও, যেখানে গাছপালা সংরক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন, সেখানেও দেখা যায় যে, মানুষ অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে তাঁর পরিচর্যা করেন। তাঁরা তুলসীবৃক্ষে জল দান করেন এবং প্রণতি নিবেদন করেন, কারণ ভগবদ্ভক্তির পথে তুলসীসেবা অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ।

*স্কন্দ-পুরাণে* আর একটি শ্লোকে তুলসীর মহিমা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তুলসী সর্বমঙ্গলময়ী। তাঁকে দর্শন করলে, স্পর্শ করলে, স্তবন করলে, বন্দনা করলে, তাঁর মহিমা শ্রবণ করলে অথবা রোপণ করলে সব রকমের কল্যাণ লাভ করা যায়। এই প্রকার নয়টি বিধির মাধ্যমে তুলসী দেবীর সেবা করলে নিত্যকাল বৈকুণ্ঠ জগতে বাস করা যায়।"

## দ্বাদশ অধ্যায়

# ভগবদ্ভক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ

### শাস্ত্র শ্রবণ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর মত অনুসারে, যে গ্রন্থ ভক্তিমার্গে প্রগতি সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে, তাকেই শাস্ত্র বলে বিবেচনা করা হয়। শ্রীল মধ্বাচার্যও *রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ, বেদান্ত* আদি গ্রন্থ এবং তাঁদের অনুগামী অন্য সমস্ত গ্রন্থকে শাস্ত্র বলে গণ্য করেছেন।

*স্কন্দ-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যে মানুষ নিরন্তর বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করেন এবং শ্রবণ করেন, তিনি ধন্য এবং নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। যে মানুষ অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই সমস্ত গ্রন্থ গৃহে রাখেন এবং তাঁদের প্রতি প্রণতি নিবেদন করেন, তিনি সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হন এবং পরিণামে দেবতাদেরও আরাধ্য হন।"

নারদ মুনিকে বলা হয়েছে, "হে নারদ! যে মানুষ বৈষ্ণব শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করে ঘরে রাখেন, তাঁর গৃহে সাক্ষাৎ নারায়ণ সর্বক্ষণ বিরাজ করেন।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে (১২/১৩/১৫) বলা হয়েছে, "এই *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বেদান্তের সারাতিসার। কেউ যখন কোন না কোন ভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রস আস্বাদন করতে শুরু করেন, তখন তাঁর আর অন্য কোন সাহিত্য পাঠে রুচি থাকে না। অর্থাৎ, যে মানুষ একবার *শ্রীমদ্ভাগবতের* দিব্য রস আস্বাদন করেছেন, তিনি আর জড়-জাগতিক বিষয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন না।"

### মথুরামণ্ডলে বাস

মথুরা-মণ্ডলের মহিমা কীর্তন করে জনসাধারণের প্রতি বরাহদেবের একটি উক্তি *বরাহ-পুরাণে* উল্লিখিত হয়েছে, "মথুরা ছেড়ে অন্য কোন স্থানের প্রতি কোন মানুষ যদি আসক্ত হয়, তা হলে সে অবশ্যই আমার মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে সংসার-চক্রে আবর্তিত হবে।" *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও* বলা হয়েছে, "ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেও যে পরমানন্দ সিদ্ধি লাভ করা যায় না, তা মথুরার পুণ্যভূমি স্পর্শ

করা মাত্রই লব্ধ হয়।" বহু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র মথুরা সম্বন্ধে শ্রবণ, স্মরণ, তাঁর মহিমা কীর্তন, সেখানে বাস করার অভিলাষ, তা দর্শন অথবা স্পর্শন করার ফলে সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

## বৈষ্ণব-সেবা

*পদ্ম-পুরাণে* বৈষ্ণব-সেবার মহিমা কীর্তন করে একটি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেই বর্ণনায় দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন, "হে দেবী! সমস্ত আরাধনার মধ্যে ভগবানের আরাধনাই হচ্ছে সর্বোত্তম। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের আরাধনা তার থেকেও বড়।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/৭/১৯) বলা হয়েছে, "আমি কেবল ভগবদ্ভক্তের নিষ্কপট দাস হবার আকাঙ্ক্ষা করি, কেন না তাঁদের সেবা করার ফলে ভগবানের চরণারবিন্দে শুদ্ধ ভক্তি অনায়াসে লাভ করা যায়। ভক্তসেবার ফলে সব রকম জড়জাগতিক ক্লেশ বিনষ্ট হয়, এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করা যায়।"

*স্কন্দ-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যে সমস্ত মানুষ তাঁদের শরীর তিলকের দ্বারা ভূষিত করেন এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন ধারণ করেন, মাথায় তুলসীপত্র ধারণ করেন, এবং শরীরের দ্বাদশ অঙ্গ গোপীচন্দনের দ্বারা ভূষিত করেন—তাঁদের একবার মাত্র দর্শন করলে সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।"

এই রকমই একটি উক্তি *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১৯/৩৩) দেখতে পাওয়া যায়, "ভগবদ্ভক্তের দর্শন, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শন, অথবা তাঁকে বসবার জন্য আসন দান করলে, সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই ধরনের বৈষ্ণবদের স্মরণ করা মাত্রই সপরিবারে পবিত্র হওয়া যায়। সুতরাং সরাসরিভাবে তাঁর সেবা করলে যে কি অসীম ফল লাভ হয়, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।"

*আদি-পুরাণে* শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে বলেছেন, "হে পার্থ! যে নিজেকে আমার ভক্ত বলে প্রচার করতে চায়, সে আমার ভক্ত নয়। যে আমার ভক্তের ভক্ত, সেই হচ্ছে যথার্থ ভক্ত।" কেউই নিজের চেষ্টায় ভগবানকে পেতে পারে না, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে পাওয়া যায়। তাই বৈষ্ণব আচারের প্রথম কার্য হচ্ছে, ভগবানের কোন শুদ্ধ ভক্তকে গুরুরূপে বরণ করে তারপর তাঁর সেবা করা।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে উল্লিখিত সব কটি উক্তিই বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলি ভগবদ্ভক্ত মহান আচার্যরা স্বীকার করে গেছেন।

## সামর্থ্য অনুসারে ভগবানের সেবা করা

*পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে ভগবানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা উচিত। ভগবানের বিভিন্ন লীলাবিলাস অনুসারে বিভিন্ন তিথিতে ভগবানের বিভিন্ন উৎসব করা সকলেরই কর্তব্য।

## কার্তিক মাসে বিশেষভাবে ভগবৎ-সেবা

ঊর্জব্রত পালন ভগবৎ-সেবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই ঊর্জব্রত কার্তিক মাসে পালন করা হয়; বিশেষ করে বৃন্দাবনের মন্দিরগুলিতে সেই সময় ভগবানের দামোদর রূপ পূজিত হন। মা যশোদার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রজ্জুবদ্ধ হবার লীলার নাম হচ্ছে 'দামোদর'। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভগবানের এই দামোদর রূপ ভক্তের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তাই দামোদর মাস (কার্তিক মাস) ভক্তের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

দামোদর মাসে এই ঊর্জব্রত বিশেষভাবে মথুরায় পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভক্ত দামোদর মাসে মথুরা বা বৃন্দাবনে অবস্থান করে এই ব্রত পালন করেন।

*পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "ভগবান তাঁর ভক্তকে মুক্তি অথবা সব রকম জাগতিক সুখ দান করতে পারেন। কিন্তু দামোদর মাসে, বিশেষ করে মথুরায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করলে ভক্ত ভগবানের চরণে শুদ্ধ ভক্তি ছাড়া আর কিছু কামনা করেন না।" এই শ্লোকের ভাবার্থ হচ্ছে, ঐকান্তিকভাবে ভগবানের প্রতি আসক্ত না হলে ভগবান ভক্তি দান করেন না। কিন্তু ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী না হলেও কেউ যদি কার্তিক মাসে মথুরায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করেন, তা হলে তিনিও ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন।

## ভগবানের লীলা-বিলাসের মহোৎসব

*ভবিষ্য-পুরাণে* ভগবানের আবির্ভাব এবং অন্যান্য অপ্রাকৃত কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহোৎসব পালন করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "হে জনার্দন! দয়া করে আপনি আমাদের বলুন কোন্ তিথিতে আপনার মাতা দেবকীদেবী আপনাকে জন্ম দিয়েছিলেন, তা হলে সেই দিন আমরা মহোৎসব পালন করব। হে কেশীহন্তা, আমরা সর্বতোভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত আত্মা এবং এই মহোৎসবের দ্বারা আমরা আপনাকে প্রসন্ন করতে চাই।"

*ভবিষ্য-পুরাণের* এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবৎ-মহোৎসব পালন করলে ভগবান প্রীত হন।

## প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে শ্রীবিগ্রহের সেবা

*আদি-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যে মানুষ নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন এবং ভগবৎ-সেবায় তন্ময় হয়ে যিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করেন, তিনি কেবল মুক্তিই লাভ করেন না, মুক্তির অনেক ঊর্ধ্বে নিত্য আনন্দময় ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন।"

মুক্তির অর্থ ভব-বন্ধন মোচন। মুক্তিলাভ করার পর আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা নষ্ট করে দিতে চায়, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। প্রতিটি জীবই তাঁর স্বরূপে ভগবানের নিত্য সেবক। *আদি-পুরাণের* এই উক্তি থেকে বুঝতে পারা যায় যে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলেই কেবল ভগবানের ভক্ত সন্তুষ্ট হন। ভক্ত কখনও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান না। পক্ষান্তরে বলা যায়, যে মানুষ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বলে মনে হলেও তিনি মুক্ত পুরুষ।

## ভক্তসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন

*শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানরূপী কল্পবৃক্ষের সুপক্ব ফল। *বেদ* কথাটির অর্থ হচ্ছে, 'সম্যক্ জ্ঞান'। মানব-সমাজের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তা সম্পূর্ণভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে সমাজনীতি, রাজনীতি, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ আদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। সেই সমস্ত জ্ঞানই সম্পূর্ণরূপে *বেদে* বর্ণিত হয়েছে। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানও বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে, এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে এই বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ব ফল। বৃক্ষের মহিমা প্রকাশিত হয় তার ফলের মাধ্যমে। যেমন, আম্রবৃক্ষকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়, কেন না আম সমস্ত ফলের রাজা, সুপক্ব আম্র ফল হচ্ছে সেই বৃক্ষের সর্বোত্তম উপহার। *শ্রীমদ্ভাগবত*ও তেমন বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ব ফল। শুক পক্ষীর চঞ্চু স্পর্শে সুপক্ব ফল যেমন আরও অধিক সুস্বাদু হয়ে ওঠে, তেমনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর দিব্য মুখারবিন্দ থেকে উদ্‌গত হয়েছিল বলে *শ্রীমদ্ভাগবত* আরও অধিক রসময়ী হয়ে উঠেছে।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় গ্রহণ করা উচিত। গাছের সুউচ্চ ডাল থেকে যদি সুপক্ব ফল পেড়ে হাতে হাতে সেটি নিচে নামিয়ে আনা হয়, তা হলে ফলটি নষ্ট হয় না। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবত* যদি পরম্পরাক্রমে গ্রহণ করা হয়, তা হলেই কেবল তা অবিকৃতভাবে লাভ করা যায়। *ভগবদ্গীতাতেও*

বলা হয়েছে যে, গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে হয়। শাস্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত প্রামাণিক আচার্যই কেবল এই জ্ঞান সঞ্চার করতে পারেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*ভাগবত পড় গিয়া ভাগবত স্থানে*। অর্থাৎ, ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা উচিত। *ভাগবত* কথাটির অর্থ হচ্ছে, 'পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া।' তাই কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তকেও *ভাগবত* বলা হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি সম্বন্ধীয় যে গ্রন্থ, তাকেও *ভাগবত* বলা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, *শ্রীমদ্ভাগবতের* যথার্থ স্বাদ আস্বাদন করতে হলে, তা ব্যক্তি ভাগবতের কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে। একজন মুক্ত পুরুষও *শ্রীমদ্ভাগবতের* স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও স্বীকার করে গেছেন, যদিও তিনি মাতৃগর্ভেই মুক্ত ছিলেন, তবুও *শ্রীমদ্ভাগবতের* রস আস্বাদন করার পরই তিনি ভগবদ্ভক্ত হতে পেরেছেন। সুতরাং যে মানুষ ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হতে চান, তাঁর অবশ্যই তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তগোষ্ঠীতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী আস্বাদন করা উচিত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে (২/১/৯) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী স্বীকার করেছেন যে, যদিও তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তবুও তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের শ্রীমুখ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। অর্থাৎ, ব্যাসদেবও আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, এবং তিনি উপরোক্ত পন্থায় এই পরিপক্ক দিব্যজ্ঞান সরাসরিভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে দান করেছিলেন।

## উত্তম ভক্তসঙ্গ

নৈমিষারণ্যে শ্রীল সূত গোস্বামীর উপস্থিতিতে শৌনক মুনি *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনা করার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তখন সূত গোস্বামী বলেন যে, কেউ যদি ক্ষণিকের তরেও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তা হলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সমস্ত পুণ্যকর্মেরও তার সঙ্গে তুলনা হয় না। অর্থাৎ, যাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তাঁরা উচ্চলোকে উন্নতি অথবা নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীদের ঈপ্সিত মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ এতই দুর্লভ যে, তার সঙ্গে কোন জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনা হয় না।

*হরিভক্তি-সুধোদয়ে* প্রহ্লাদ মহারাজ ও তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর কথোপকথনে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলেছেন, "হে পুত্র! সঙ্গের প্রভাব স্ফটিকের মতো, যা তার সম্মুখস্থ সব কিছুকেই প্রতিফলিত করবে।" অর্থাৎ, কেউ যদি পুষ্পসদৃশ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করেন, এবং তাঁর হৃদয় যদি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়, তা হলে অবশ্যই তাতে ভগবদ্ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলী প্রতিফলিত হবে। এই সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষ যদি বীর্যবান হয় এবং স্ত্রী যদি রোগমুক্ত হয়, তা হলে তাদের মিলনের ফলে সন্তান উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনই যদি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান প্রদানকারী গুরু যথার্থই সদ্‌গুরু হন এবং সেই তত্ত্ব গ্রহণকারী শিষ্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে যথাযথ ফল লাভ হবে।

## ভগবানের পবিত্র নামকীর্তন

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে (২/১/১১) *'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র'—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।* কীর্তন করার গুরুত্ব বর্ণনা করে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছিলেন, "হে রাজন! কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি পরম সিদ্ধিলাভ করেছেন।" সেখানে বলা হয়েছে, যে সমস্ত কর্মী তাদের কর্মফল ভোগ করার বাসনা করছেন, যে সমস্ত মুক্তিকামী জ্ঞানীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করছেন, এবং যে সমস্ত যোগী যৌগিক সিদ্ধিলাভ করার আকাঙ্ক্ষা করছেন, তাঁরা সকলেই 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে তাঁদের অভীপ্সিত বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে *নির্ণীতম* শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে—'তা ইতিমধ্যেই নির্ণীত হয়েছে।' শুকদেব গোস্বামী ছিলেন মুক্ত পুরুষ, তাই তিনি তেমন কোন মত স্বীকার করেননি, যা নির্ণীত (সিদ্ধ) হয়নি। তাই শুকদেব গোস্বামী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, যে মানুষ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেছেন, তিনি যে ইতিমধ্যেই সকাম কর্ম, মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান ও যোগের অষ্টসিদ্ধির স্তর অতিক্রম করেছেন, তা নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়েছে।

*আদি-পুরাণে* শ্রীকৃষ্ণ সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে অর্জুনকে বলেছেন, "হে অর্জুন! যে মানুষ আমার দিব্যনাম কীর্তন করে, সে নিরন্তর আমার সান্নিধ্য লাভ করছে বলে বুঝতে হবে। হে সখে! এই ধরনের ভক্তদের কাছে আমি সহজেই বিক্রীত হয়ে থাকি।"

*পদ্ম-পুরাণেও* বলা হয়েছে, "যে মানুষ বহু জন্মে ভগবান বাসুদেবের সেবা করেছেন, তাঁরই জিহ্বায় 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' বিরাজ করে।" *পদ্ম-পুরাণে* আরও বলা হয়েছে, "ভগবানের দিব্য নাম জড় শব্দতরঙ্গ নয় এবং তা কখনও জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।" সুতরাং, যার ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে কলুষমুক্ত হয়নি, সে ভগবানের এই দিব্যনাম নিরপরাধে কীর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ, প্রাকৃত বিকারগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' যথাযথভাবে কীর্তন করা যায় না। কিন্তু এই কীর্তনের প্রভাবে মানুষ পবিত্র হতে পারে এবং তার ফলে তারা অচিরেই নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, প্রতিটি মানুষই যেন তাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে কলুষমুক্ত করার জন্য 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে। হৃদয় নির্মল হলে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের' গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। যে সমস্ত মানুষ তাদের হৃদয় কলুষমুক্ত করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তারা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার অপ্রাকৃত ফললাভ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে উৎসাহের সঙ্গে ভগবানের প্রতি সেবাভাব বিকশিত করা, যাতে তাঁরা নিরপরাধে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে পারেন। তাই সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যকে শিক্ষা দেন ভগবানের সেবা করতে এবং একই সঙ্গে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে। যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের প্রতি সেবাভাবের উদয় হয়, তখনই মানুষ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের' দিব্য প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে।

## মথুরা বাস

*পদ্ম-পুরাণে* মথুরা, দ্বারকা আদি পুণ্যক্ষেত্রে বাস করার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু এই মুক্তি পরম সিদ্ধি নয়। মুক্ত হওয়ার পর ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হয়। ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বা মুক্তিলাভ করার পর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। তাই অপ্রাকৃত প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবাই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য, এবং স্বল্পক্ষণ মথুরামণ্ডলে বাস করলে তা অনায়াসে লাভ করা যায়।"

সেখানে আরও বলা হয়েছে, "এমন কোন মানুষ কি আছে, যে মথুরা-মণ্ডলের সেবা করবে না? মথুরা সকাম কর্মীদের ও ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার অভিলাষী মুমুক্ষুদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করতে পারে। সুতরাং, যে সমস্ত

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবার অভিলাষী, মথুরা অবশ্যই তাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে।" বৈদিক শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে, "আহা, মথুরা কী অপূর্ব মহিমাসম্পন্ন, কেবলমাত্র একদিন সেখানে বাস করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত ভক্তিলাভ করা যায়! এই মথুরা অবশ্যই ভগবৎ-ধাম বৈকুণ্ঠ থেকে অধিক মহিমামণ্ডিত!"

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# ভগবৎ-সেবার পাঁচটি বিশেষ অঙ্গ

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, ভগবদ্ভক্তির পাঁচটি কৃত্য বা অঙ্গ—মথুরাবাস, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ, ভক্তসেবা ও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন এতই শক্তিশালী যে, এই পাঁচটির যে কোনও একটি অঙ্গ বা কৃত্যের প্রতি স্বল্পমাত্রায় আসক্ত হলেই একজন নবীন ভক্তও ভগবৎ-প্রেমের পরমানন্দ লাভ করতে পারেন।

ভগবানের দিব্যরূপ বা বিগ্রহ আরাধনা সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী লিখেছেন, "হে সখে! তোমার যদি এই জড় জগতে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গসুখ লাভ করার কোন বাসনা থাকে, তা হলে বৃন্দাবনের কেশীঘাটের কাছে মৃদু হাস্যোজ্জ্বল, ত্রিভঙ্গললিত, বেণুবাদনরত, শিখীপুচ্ছশোভিত, চন্দ্রের আলোকে উজ্জ্বল গোবিন্দ নামক বালকের শ্যামসুন্দর রূপ কখনও দর্শন করো না।"

এই শ্লোকের ভাবার্থ হচ্ছে, কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর আরাধনা করতে শুরু করেন, তা হলে তিনি তাঁর তথাকথিত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সমাজ ইত্যাদির কথা ভুলে যাবেন। তাই প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে, তার গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করা। তার ফলে ক্লাব, সিনেমা, পার্টি, ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি অর্থহীন কার্যকলাপে কেউ আর লিপ্ত হবে না। গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করতে শুরু করলে, এই সমস্ত অর্থহীন কার্যকলাপে আর লিপ্ত হতে ইচ্ছা করবে না।

শ্রীল রূপ গোস্বামী আরও লিখেছেন, "হে আমার মূর্খ বন্ধুগণ! আমার মনে হয় যে, তোমরা ইতিমধ্যেই সর্বমঙ্গলময় *শ্রীমদ্ভাগবতের* পরিত্রাণকারী পদ্যাবলী শ্রবণ করেছ, যা সকাম কর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি ও মুক্তির বাসনাকে নিন্দা করেছে। আমার মনে হয়, এখন নিশ্চিতভাবে ভগবৎ-লীলাময় দশম স্কন্ধের শ্লোকগুলি ক্রমশ তোমাদের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয়ে তোমাদের হৃদয়ে অমৃতের সঞ্চার করবে।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথমেই বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ ভোগ আকাঙ্ক্ষা, অহেতুক আচার-অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার মোক্ষ বাসনা আবর্জনার মতো বর্জন না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত

সে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। *শ্রীমদ্ভাগবত* কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির কথাই আলোচনা করছে। যে মানুষ জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করেন, তিনিই কেবল দশম স্কন্ধে বর্ণিত ভগবানের লীলা-বিলাসের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অর্থাৎ, *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকৃষ্ট না হলে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত রাসলীলা আদি পরম লোভনীয় অঙ্গ বুঝতে চেষ্টা করা উচিত নয়। শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ হলে *শ্রীমদ্ভাগবতের* যথার্থ রস আস্বাদন করা যায়।

পূর্বোক্ত দুটি শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী কয়েকটি রূপক অলঙ্কারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বৈষয়িক সঙ্গ, সখ্য ও প্রেমের নিন্দা করেছেন। মানুষ সাধারণত জড়-জাগতিক সমাজ, মিত্রতা ও প্রেমের প্রতি অনুরক্ত, এবং এই সমস্ত জড় কলুষগুলি বর্ধিত করার জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করার ফলে, এই সমস্ত জড় প্রচেষ্টাগুলির কথা আর মনে থাকে না। রূপ গোস্বামী এমনভাবে এই শ্লোকগুলি রচনা করেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি যেন বৈষয়িক সঙ্গ, মিত্রতা ও প্রেমের প্রশংসা করছেন এবং গোবিন্দের শ্রীমূর্তি দর্শনের নিন্দা করছেন। এই রূপক অলঙ্কারপ্রসূত দৃষ্টান্তটি এমনভাবে রচনা করা হয়েছে, যেন মনে হচ্ছে যার প্রশংসা করা হচ্ছে, তাকে যেন নিন্দা করা হচ্ছে। এই শ্লোকের ভাবার্থ হচ্ছে, কেউ যদি অর্থহীন বৈষয়িক সঙ্গ, মিত্রতা ও প্রেমের কথা ভুলতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে হবে।

এইভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনার মাধ্যমে দিব্যরস আস্বাদনের কথা বলেছেন। এক ভক্ত বলেছেন, "অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, যখন থেকে আমি এই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছি, যিনি আমার চোখের জলে অবগাহন করেন, আর আমার দেহে পুলকের সঞ্চার করেন, তখন থেকে আমি আমার বৈষয়িক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। তাঁকে দেখার পর থেকেই আমি আর চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারি না। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমার মন সব সময় আকুল হয়ে থাকে।" এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করা মাত্রই মানুষ কৃষ্ণ-বিষয়ক কথা শ্রবণ করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানবার জন্য, অর্থাৎ, সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

তেমনই 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' শ্রবণ ও কীর্তন সম্বন্ধেও এই রকম একটি বর্ণনা রয়েছে, "কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনরত নারদ মুনির করস্থিত বীণার মধুর ধ্বনি মহাত্মারা শুনতে পান। এখন সেই শব্দতরঙ্গ আমার কর্ণকুহরেও

প্রবেশ করেছে, এবং আমি নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারছি। ধীরে ধীরে আমি সব রকম জড়-জাগতিক সুখভোগের বাসনা থেকে মুক্ত হচ্ছি।"

পুনরায় শ্রীল রূপ গোস্বামী মথুরামণ্ডলের বর্ণনা করে বলেছেন, "যমুনার তটে দণ্ডায়মান পরমেশ্বর ভগবানের কথা আমার মনে পড়ে। পাখিদের কূজনে মুখরিত কদম্ব-কাননে তাঁর সেই রূপ এতই মনোহর যে, তা নিরন্তর আমাকে সৌন্দর্য ও আনন্দের অপ্রাকৃত অনুভূতি প্রদান করে।" মথুরামণ্ডল ও বৃন্দাবন সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামীর এই বর্ণনার মাধুর্য অভক্তরাও অনুভব করতে পারে। যমুনার তীরে ৮৪ ক্রোশ ব্যাপী মথুরামণ্ডল এতই সুন্দর যে, সেখানে গেলে কেউ আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে চায় না। শ্রীল রূপ গোস্বামীর এই বর্ণনা মথুরা ও বৃন্দাবনের যথার্থ উপলব্ধির বর্ণনা। এই সমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, মথুরা ও বৃন্দাবন অপ্রাকৃত। তা না হলে, সেই স্থানের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কখনই এই দিব্য ভাবের আকুলতা দেখা দিত না। মথুরা অথবা বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেই তৎক্ষণাৎ এই দিব্যভাবের উদয় হয়।

ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এই সমস্ত বর্ণনা শুনে মনে হতে পারে যে, এগুলি অত্যুক্তি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি অত্যুক্তি নয়। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক ভক্ত এই ধরনের সঙ্গলাভের ফলে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ করেছেন, যদিও তা সকলের জন্য সম্ভব নয়। যেমন, চার কুমারেরা (সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার) ভগবানের মন্দিরে ধূপের সৌরভ আঘ্রাণ করে তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনা মাত্রই তাঁর সুন্দরী বান্ধবীকে ত্যাগ করে মথুরা ও বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেছিলেন, এবং সেখানে তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত বর্ণনাগুলি অত্যুক্তি নয়, অথবা গল্পকথা নয়। সেগুলি সত্য ঘটনা, তবে তা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তা কেবল কতিপয় অতি উন্নত ভক্তের বেলায় প্রযোজ্য। এই সমস্ত বর্ণনাগুলি অত্যুক্তি বলে মনে হলেও ক্ষণস্থায়ী জাগতিক সৌন্দর্যের প্রতি বিরক্ত হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য, তা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর যাঁরা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে পূর্ববর্ণিত ফল লাভ করা অসম্ভব নয়।

কিছু কিছু পণ্ডিত তর্ক করেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশীলন করলে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধ অবস্থা লাভ করা যায়, কিন্তু মহান আচার্যরা এই মতবাদ স্বীকার করেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবদ্ভক্তির ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আলোচনার সময় এই মতবাদ অস্বীকার করেছিলেন। রামানন্দ রায়

যখন বর্ণাশ্রম ধর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করছিলেন, তখন মহাপ্রভু তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশীলন বাহ্যিক অর্থাৎ দৈহিক, তা অন্তরঙ্গা বা আধ্যাত্মিক নয়। তারও উর্ধ্বে এক তত্ত্ব রয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান নিজেই বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—অর্থাৎ, সব রকম জড়জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। তার ফলে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ হবে।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২০/৯) ভগবান নিজেই বলেছেন, "ভগবানের লীলা শ্রবণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আসক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" অর্থাৎ, বর্ণাশ্রম ধর্ম কেবল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের সহায়ক। যে মানুষ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়নি, তার জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলনের নির্দেশ। প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষকে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার জন্য। কিন্তু যিনি ইতিমধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁকে আর শাস্ত্রে উল্লিখিত এই সমস্ত বিধি-বিধানের আচরণ করতে হয় না।

# চতুর্দশ অধ্যায়

# ভক্তির যোগ্যতা

কিছু পণ্ডিত বলেন যে, ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করার জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য হচ্ছে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার বিষয়ে জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুশীলন অনুকূলভাবে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু তা কেবল প্রাথমিক স্তরে। চরমে সেগুলিও ত্যাগ করতে হয়, কেন না ভগবদ্ভক্তি ভগবানের সেবার প্রতি অনুরাগ ছাড়া আর কিছুর উপরেই নির্ভরশীল নয়। ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিক অনুরাগ ছাড়া আর কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

মহান ভগবদ্ভক্তরা বলে গেছেন যে, মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান ও যোগাভ্যাসের কৃত্রিম তপশ্চর্যা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তার ফলে হৃদয় অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। তার ফলে ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধনে কোনই লাভ হয় না। সুতরাং ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ সেবার জগতে প্রবেশ করার ব্যাপারে সেগুলি মোটেই অনুকূল নয়। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করার একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাই তা একাধারে কারণ ও কার্য উভয়ই। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত কারণের পরম কারণ, তাই সেই পরম অদ্বয়তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে আসতে হলে, অপ্রাকৃত পন্থা ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

*ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান বলছেন, "ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আমাকে জানা যায়।" *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে ভগবান বলছেন, "যেহেতু তুমি আমার ভক্ত, তাই আমি তোমাকে এই পরম গুহ্যতম জ্ঞান দান করব।" বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা, এবং তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করবার একমাত্র পন্থা হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি। সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রেই সেই কথা স্বীকার করা হয়েছে। মনোধর্মী জ্ঞানীরা এই ভক্তিযোগের পন্থাকে অবহেলা করে, এবং নিরন্তর দার্শনিক গবেষণা-প্রসূত জ্ঞানের দ্বারা অপরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টায় রত থাকে, তাই তারা ভগবৎ-প্রেমের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২০/৩১) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "হে উদ্ধব! যে সমস্ত মানুষ ঐকান্তিকভাবে আমার সেবায় যুক্ত, তারা জ্ঞানের প্রয়াস ও

কৃত্রিম বৈরাগ্যকে অনুকূল বলে মনে করে না। কেউ যখন আমার ভক্ত হয়, তখন আপনা থেকেই সে জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি নিস্পৃহ হয় এবং পরমতত্ত্ব উপলব্ধির বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।" এটিই হচ্ছে ভক্তিমার্গে উন্নতির ইঙ্গিত। ভক্ত কখনই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকেন না, কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাঁকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২০/৩২-৩৩) ভগবান উদ্ধবকে বলছেন, "প্রিয় সখে! সকাম কর্ম, তপশ্চর্যা, দার্শনিক জ্ঞানের প্রচেষ্টা, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম ও অন্যান্য শুভ কর্মের দ্বারা মানুষ যে ফল উপার্জন করে, আমার ভক্ত আমার শুদ্ধ ভক্তিযোগের দ্বারা তা অনায়াসে লাভ করতে পারে। যদিও আমার ভক্ত আমার সেবা ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না, তবুও ভক্তির অনুকূল বলে বিবেচনা করলে, আমার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, সে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি আমার ধাম বৈকুণ্ঠও লাভ করতে পারে।"

কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত মানুষের যদি জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি কোন রকম আসক্তি থেকেও থাকে, তা হলে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে অচিরেই তিনি সেই প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হন।

তারপর শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন যে, জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়; পক্ষান্তরে, বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সব কিছু গ্রহণ করা উচিত। যেমন, জীবন ধারণ করার জন্য আমাদের আহার করতে হয়, এবং সকলেই চায় তার রসনা তৃপ্তির জন্য সুস্বাদু খাবার খেতে। তাই আমাদের রসনা-তৃপ্তির পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের রসনা-তৃপ্তির জন্য নানা রকম উপাদেয় আহার্য তৈরি করে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা উচিত। সেটিই হচ্ছে যথার্থ বৈরাগ্য। উপাদেয় খাদ্য তৈরি করা হোক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে তা খাওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোন কিছু গ্রহণ না করার যে প্রতিজ্ঞা, তাই হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য এবং এই ধরনের বৈরাগ্যের ফলে ইন্দ্রিয়ের বেগ প্রশমিত করা যায়।

নির্বিশেষবাদীরা সমস্ত প্রাকৃত বস্তু বর্জন করার চেষ্টা করে কঠোর তপশ্চর্যা পালন করতে পারে, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার পরম সৌভাগ্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তাই তাদের বৈরাগ্য যথার্থ সিদ্ধি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। ভক্তিহীন কৃত্রিম বৈরাগ্যের অনুশীলন করার চেষ্টা করার ফলে, নির্বিশেষবাদীদের পুনরায় অধঃপতিত হয়ে জড় কলুষের প্রতি আসক্ত হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখনও অনেক তথাকথিত ত্যাগীদের দেখা যায়, যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বলে প্রচার করে। এইভাবে তারা জড় জগৎ ত্যাগ

করার অভিনয় করে। কিন্তু যেহেতু তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি ভক্তিলাভ করতে পারেনি, তাই তারা তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তারা আবার এই জগতে ফিরে এসে তথাকথিত পরোপকার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়। এই রকম বহু তথাকথিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যারা 'জগৎ মিথ্যা' বলে এই জগৎ পরিত্যাগ করে, আবার জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছে, কেন না তারা তাদের যথার্থ আশ্রয়—ভগবানের চরণারবিন্দে আসক্ত হতে পারেনি।

যা দিয়ে ভগবানের সেবা করা যায়, তেমন কোন বস্তু পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির রহস্য। কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তির মার্গে প্রগতির অনুকূল যে বস্তু, তা গ্রহণ করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য আমরা নানা রকম যন্ত্র ব্যবহার করছি, যেমন—টাইপরাইটার, ডিক্টেটিং মেশিন, টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন, এরোপ্লেন ইত্যাদি। কখনও কখনও মানুষ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা জড় সভ্যতার প্রগতির নিন্দা করেন, তা হলে এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুগুলি আপনারা ব্যবহার করছেন কেন?" না, আমরা তার নিন্দা করি না। আমরা কেবল মানুষের কাছে আবেদন করি, তাঁরা যেন সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করেন। *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই উপদেশই দিয়েছিলেন—"তোমার শৌর্য দিয়ে, সামরিক দক্ষতা দিয়ে আমার সেবা কর।" তেমনই আমরাও এই সমস্ত যন্ত্রগুলি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করে তাদের সদ্ব্যবহার করছি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইভাবে অনুরক্ত হয়ে, অথবা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে আমরা সব কিছু গ্রহণ করতে পারি। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য যদি টাইপরাইটার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, তা হলে আমরা অবশ্যই তা ব্যবহার করব। তেমনই, ডিক্টেটিং মেশিন, টেপরেকর্ডার, টেলিফোন, গাড়ি, বাড়ি ও এরোপ্লেন—সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে, সব কিছুই কৃষ্ণের, আমাদের কিছুই নয়। তাই কৃষ্ণের জিনিস কৃষ্ণের সেবাতেই নিয়োগ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

তার অর্থ এই নয় যে, আমরা ভক্তির সাধন ছেড়ে দেব অথবা ভক্তি-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিধি-বিধানগুলি বর্জন করব। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে অবশ্যই গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে বিধি-নিষেধের অনুশীলন করতে হবে। কোন্ জিনিস বর্জন করতে হবে তা নির্ধারিত হবে ভক্তির তত্ত্ব অনুসারে, এমন নয় যে, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে গ্রহণ ও ত্যাগ করব। তাই ভক্তকে যথার্থভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি ও বাহ্য প্রকাশরূপে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

ধন সঞ্চয় অথবা বহু শিষ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা গুরুদেবের উচিত নয়। সদ্‌গুরু কখনও সেই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হন না। কিন্তু যথার্থ যোগ্যতা অর্জন না করে কেউ যদি নিজেই উদ্যোগী হয়ে গুরু সেজে বসে, তা হলে সে ধন-সম্পদের প্রলোভন এবং শিষ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় অধঃপতিত হতে পারে। এই ধরনের গুরুরা কখনই উত্তম ভক্তির মার্গ প্রদর্শন করতে পারে না। এই ধরনের প্রচেষ্টার দ্বারা কেউ যখন বিচলিত হয়, তখন তার ভক্তি শিথিল হয়ে যায়। তাই পরম্পরার সিদ্ধান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করা উচিত।

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নির্মল হওয়ার ফলে, তাঁকে তাঁর চিন্তা বা কার্যকলাপ পবিত্রীকরণের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা করতে হয় না। কৃষ্ণভাবনার অতি উত্তম স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, তাঁর মধ্যে সমস্ত দিব্য গুণাবলী প্রকাশিত হয় এবং সব রকম যোগসিদ্ধিগুলি তাঁর লব্ধ হয়। তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে অহিংসা, যা হচ্ছে একটি অতি মহৎ গুণ। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই অহিংস এবং তাই তাঁকে আর আলাদাভাবে অহিংসার অভ্যাস করতে হয় না। কিছু মানুষ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিরামিষাশী আন্দোলনে যোগদান করেন, কিন্তু ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই নিরামিষাশী। তাঁকে আর আলাদাভাবে নিরামিষাশী হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয় না।

এই রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে যার ফলে বোঝা যায় যে, ভক্তকে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন ছাড়া আর কোন কিছু অনুশীলন করতে হয় না, এবং তার ফলে সমস্ত দিব্য গুণাবলী তাঁর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। অভ্যাস করার মাধ্যমে নিরামিষাশী হওয়া অথবা অহিংস হওয়া জড়-জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সদ্‌গুণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই গুণগুলি তাদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করে না। নিরামিষাশী হলেই অথবা অহিংস হলেই ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই নিরামিষাশী ও অহিংস। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, নিরামিষ ভোজন অথবা অহিংসাই ভগবদ্ভক্তির কারণ নয়।

এই সম্পর্কে *স্কন্দ-পুরাণে* একটি ব্যাধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যিনি নারদ মুনির সংস্পর্শে আসার ফলে মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিলেন। সেই ব্যাধ যখন শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হলেন, তখন তিনি একটি পিপীলিকাকে পর্যন্ত মারতে চাইতেন না। নারদ মুনির সখা পর্বত মুনি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সেই ব্যাধের এই আশ্চর্যজনক পরিবর্তন দেখে মন্তব্য করেছিলেন, "হে ব্যাধ! একটি পিপীলিকাকে পর্যন্ত হত্যা করতে তোমার এই অনিচ্ছা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেন না, যে মানুষের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়েছে, তাঁর মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণাবলী আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভক্ত কখনও কাউকে কোন রকম কষ্ট দেন না।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী এখানে বলেছেন যে, অন্তঃকরণ ও কার্যকলাপের পবিত্রতা, শম, দম, আদি সমস্ত সদ্‌গুণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভক্তিপরায়ণ পুরুষে প্রকাশিত হয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তির নয়টি কৃত্য বা অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। ভক্তির এই নয়টি সাধন-অঙ্গের প্রতিটি এতই শক্তিশালী যে, যদি কেউ এর একটিরও অনুশীলন করেন, তবে তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবেন। যেমন, কেউ যদি ভগবানের কথা শ্রবণের প্রতি অনুরক্ত হন অথবা কেউ যদি ভগবানের নাম কীর্তনের প্রতি অনুরক্ত হন, তা হলে উভয়েই ভগবদ্ভক্তির চরম সিদ্ধি লাভ করবেন। সেই কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেউ ভক্তি সাধনের একটি, দুটি, তিনটি অথবা সব কয়টি অঙ্গেরই অনুশীলন করতে পারেন এবং পরিণামে ভগবদ্ভক্তির চরম লক্ষ্য শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে পারেন।

ভক্তির উপরোক্ত সাধন অঙ্গের একটিও সাধন করার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই এক-একটি অঙ্গে ভগবদ্ভক্তি সাধনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন—শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজ, কীর্তনে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে প্রহ্লাদ মহারাজ, পাদসেবনে লক্ষ্মীদেবী, অর্চনে পৃথু মহারাজ, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন ও আত্মনিবেদনে বলি মহারাজ।

এমন অনেক ভক্তও রয়েছেন, যাঁরা ভক্তির সব কটি অঙ্গেরই অনুশীলন করছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে (৯/৪/১৮, ১৯, ২০) অম্বরীষ মহারাজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ভক্তির সব কটি অঙ্গেরই অনুশীলন করেছিলেন। সেই শ্লোকগুলিতেই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, "অম্বরীষ মহারাজ সর্বপ্রথমে তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দের ধ্যানে নিমগ্ন করেন এবং তারপর তিনি তাঁর বাক্যের দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ কীর্তন করেন, তাঁর হস্তের দ্বারা মন্দির মার্জন করেন, তাঁর কর্ণের দ্বারা তিনি নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তাঁর চক্ষুর দ্বারা তিনি মন্দিরে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করেন, তাঁর দেহের দ্বারা তিনি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করেন। (যখন আমরা কারও সঙ্গ করি, তখন তার সঙ্গে একত্রে ওঠা-বসা, খাবার খাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সাহচর্য হয়ে থাকে এবং তার ফলে পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ হয়। অম্বরীষ মহারাজ কেবল শুদ্ধ ভক্তেরই সঙ্গ করতেন এবং অভক্তের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতেন।) তাঁর নাসিকা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুল ও তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণ করতেন এবং তাঁর রসনা দিয়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ আস্বাদন করতেন। তিনি ছিলেন রাজা,

তাই তাঁর কোন অভাব ছিল না, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনেক উপাদেয় ভোগ নিবেদন করতেন এবং তারপর সেই কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করতেন। তাঁর এক অতি সুন্দর মন্দির ছিল, যেখানে বহুমূল্য রত্ন, অলঙ্কার, বসন-ভূষণ দিয়ে ভগবানের মনোহর শৃঙ্গার (অঙ্গরাগ) হত এবং নানা রকম অতি উত্তম ভোগ নিবেদনও করা হত। এইভাবে তিনি নিরন্তর পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিলেন।” এই বর্ণনার তাৎপর্য হচ্ছে, মহাভাগবতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা উচিত। যদি কেউ ভগবদ্ভক্তি সাধনের সব কটি অনুশীলন না করতে পারেন, তবে অন্ততপক্ষে একটি অবশ্যই করা উচিত, যা পূর্ববর্তী আচার্যরা উদাহরণ-স্বরূপ আমাদের দেখিয়ে গেছেন। যদি অম্বরীষ মহারাজের মতো আমরা ভগবদ্ভক্তির সাধন-অঙ্গের সব কয়টি অনুশীলন করতে পারি, তা হলে তার প্রতিটি অঙ্গ থেকে আমরা অবশ্যই ভক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভ করতে পারব। পূর্ণরূপে ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে বিষয় বাসনার নিবৃত্তি হয়ে যায়, আর মূর্তিমতী মুক্তি তখন ভগবদ্ভক্তের পরিচারিকারূপে তাঁর অনুগামিনী হন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে গেছেন। কেউ যখন ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হন, মুক্তিদেবী তখন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর দাসীত্ব বরণ করে তাঁর অনুগামিনী হন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, বৈষ্ণবাচার্যেরা বৈধীভক্তিকে কখনও কখনও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভগবদ্ভক্তি বলে বর্ণনা করেন।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# রাগানুগা ভক্তি

রাগানুগা ভক্তির সব চাইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদেরা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। ভক্তি সম্বন্ধে তাঁদের শিক্ষালাভ করতে হয় না। তাঁরা ইতিমধ্যেই সমস্ত শাস্ত্রবিধির চরম সিদ্ধিলাভ করেছেন। যেমন, যে সমস্ত গোপবালকেরা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেছেন, তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে কিভাবে খেলা করতে হয়, তা তাঁদের তপশ্চর্যা অথবা যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শিখতে হয়নি। তাঁরা তাঁদের পূর্ব জন্মেই এই সমস্ত বিধি-বিধানের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হয়েছেন, এবং তার ফলস্বরূপ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাব লাভ করেছেন। তাঁদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেমকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি।

রাগানুগা ভক্তির বিশ্লেষণ করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, কোন কিছুর প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে তার চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হয়ে, তার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের আকুলতায় যখন ভগবদ্ভক্তি সাধিত হয়, তখন তাকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তিকেও আবার, দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তার একটি হচ্ছে 'কামরূপা' এবং অপরটি হচ্ছে 'সম্বন্ধরূপা'।

এই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* সপ্তম স্কন্ধে (৭/১/৩০) নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছেন, "হে রাজন! ভক্ত প্রথমে কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা স্নেহের বশে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু পরিণামে তাঁর সেই আকর্ষণ সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, ধীরে ধীরে তাঁর হৃদয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, এবং অবশেষে তাঁর জীবনের পরম প্রাপ্তি শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়।"

কামার্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেম লাভের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ব্রজগোপিকারা। ব্রজগোপিকারা হচ্ছেন যুবতী রমণী, আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নবকিশোর। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন ব্রজগোপিকারা কামের বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনই, কংস কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল ভয়ের বশবর্তী হয়ে। কংস সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত ছিল, কারণ সে দৈববাণী শুনেছিল যে, তার ভগিনীর পুত্র কৃষ্ণ তাকে হত্যা করবে। শিশুপাল সব সময় কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। আর যদুবংশীয়েরা কৃষ্ণকে তাঁদের আত্মীয় বলে মনে করে

তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের ভক্তরা ভিন্ন ভিন্নভাবে কৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুরক্ত হলেও চরমে তাঁরা সকলেই জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হন।

কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিকাদের আকর্ষণ ও যদুবংশীয়দের স্নেহ উভয়ই স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ বা রাগানুগা ভক্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে। ভয়ের বশবর্তী হয়ে উদ্বেগগ্রস্ত কংসের নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তা, এবং বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শিশুপালের কৃষ্ণচিন্তা, ভগবদ্ভক্তি বলে স্বীকার করা হয়নি, কেন না কৃষ্ণের প্রতি তাদের মনোভাব অনুকূল ছিল না। অনুকূল মনোভাবাপন্ন হয়েই কেবল ভগবদ্ভক্তি সাধন করতে হয়। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর মত অনুসারে এই ধরনের কৃষ্ণচিন্তা ভগবদ্ভক্তি নয়। যদুদের স্নেহের বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, তা যদি সখ্যভাবে হয়ে থাকে তা হলে তা রাগানুগা ভক্তি, কিন্তু তা যদি বৈধীমার্গে হয়ে থাকে, তা হলে তা রাগানুগা নয়। স্নেহ যখন স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের স্তরে উন্নীত হয়, তখন তাকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি বলে গণ্য করা হয়।

ব্রজগোপিকারা ও কংস উভয়েই যে জীবনের পরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেই কথা বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। তাই এই বিষয়টি একটু ভালভাবে বুঝতে হবে, কারণ কংস ও শিশুপালের মনোভাব ব্রজগোপিকাদের মনোভাব থেকে অবশ্যই ভিন্ন ছিল। যদিও এই ক্ষেত্রে সকলেরই ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং ভগবদ্ভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে সমস্ত ভক্তরাই চিন্ময় জগতে প্রবিষ্ট হন, তবুও এই দুই ধরনের আত্মার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন অদ্বয়, এবং তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় হলেও তাঁর চিন্ময় ভেদ রয়েছে। যদিও ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব, কংস ও শিশুপালের মতো জীবেরা কেবল ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করতে পারে। তারা পরমাত্মা অথবা ভগবান উপলব্ধির যোগ্য নয়। এটিই হচ্ছে পার্থক্য।

এই সম্পর্কে সূর্যমণ্ডল ও সূর্যরশ্মির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সূর্যকিরণে দাঁড়িয়ে থাকা আর সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করা এক নয়। সূর্যকিরণের তাপমাত্রা ও সূর্যমণ্ডলের তাপমাত্রা ভিন্ন। কেউ যদি প্লেনে করে অথবা রকেটে করে সূর্যরশ্মির মধ্যে দিয়ে যায়, তার মানে এই নয় যে, সে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। সূর্যরশ্মি ও সূর্যমণ্ডল অভিন্ন, কিন্তু তবু তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কারণ তার একটি হচ্ছে শক্তি ও অন্যটি হচ্ছে শক্তির উৎস। তেমনই, পরমতত্ত্ব ও তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা যুগপৎ এক ও ভিন্ন। কংস ও শিশুপাল পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু

তারা গোলোক-বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারেনি। নির্বিশেষবাদী ও ভগবানের শত্রুরা প্রতিকূলভাবে হলেও ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করে, কিন্তু তারা ভগবৎ-ধাম বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক-বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারে না। রাজার রাজ্যে প্রবেশ করা আর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করা এক কথা নয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী এখানে নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদীদের বিভিন্ন সিদ্ধির কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণত যারা নির্বিশেষবাদী এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, তারা যখন জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করে, তখন তারা কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হতে পারে। নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা একদিক দিয়ে ভগবানের শত্রুর মতো, কারণ ভগবানের শত্রুরা ও নির্বিশেষবাদীরা উভয়েই পরিণামে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। তাই বুঝতে হবে যে, তারা সমপর্যায়ভুক্ত। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের শত্রু, কারণ তারা ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব সহ্য করতে পারে না। তারা সব সময় চেষ্টা করে নিজেদের ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত বলে প্রতিষ্ঠা করতে। সেটি হচ্ছে তাদের ঈর্ষাপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করে গেছেন যে, নির্বিশেষবাদীরা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী। কিন্তু ভগবান এতই কৃপাময় যে, যদিও তারা তাঁর শত্রু, তিনি তাদের তাঁর চিন্ময় জগতে প্রবেশ করতে অনুমতি দেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করার সুযোগ দেন।

কখনও কখনও কোন নির্বিশেষবাদী ধীরে ধীরে ভগবানের সবিশেষত্ব উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর যথার্থ জ্ঞানী আমার শরণাগত হয়।" এইভাবে শরণাগতির ফলে নির্বিশেষবাদী বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারেন, যেখানে সমর্পিত আত্মারূপে তিনি ভগবানের মতো রূপবিশিষ্ট সারূপ্য মুক্তি লাভ করেন।

*ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছেন, এবং যে সমস্ত অসুর পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিহত হয়েছেন, তাঁরা উভয়েই ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে গিয়ে চিদাকাশে অবস্থান করেন।" এই চিদাকাশ জড় আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে, এবং *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এই জড় আকাশের ঊর্ধ্বে আর একটি নিত্য আকাশ রয়েছে। ভগবানের শত্রু ও নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু কৃষ্ণভক্তরা চিন্ময় ভগবৎ-ধামে উন্নীত হন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ লাভ করেছেন, তাই তাঁরা চিন্ময় ভগবৎ-ধামে উন্নীত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করে চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৮৭/২৩) মূর্তিমান বেদগণ ভগবানকে সম্বোধন করে বলছেন, "হে ভগবান, যোগীরা আপনার পরমাত্মা রূপের ধ্যান করেন, এবং এইভাবে তাঁরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধিলাভ করেন। আপনার প্রতি যারা বৈরীভাবাপন্ন, তারাও ধ্যান না করেই ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়। আর আপনার বাহুযুগলের আলিঙ্গনে আবদ্ধ অত্যন্ত কামার্তা গোপিকারাও তেমনই সিদ্ধিলাভ করেন। আর বিভিন্ন বৈদিক জ্ঞানের তত্ত্বাবধায়ক দেবতা আমরা নিরন্তর সেই ব্রজগোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি, সেই একই সিদ্ধি লাভের আশায়।" এখানে ভগবানের শত্রুদের ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধি আর ব্রজগোপিকাদের 'তেমনই সিদ্ধিলাভ' সম্বন্ধে সূর্য ও সূর্যরশ্মির দৃষ্টান্তটি মনে রাখতে হবে। যাঁরা নির্বিশেষবাদী, তাঁরা সূর্যরশ্মি সদৃশ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করেছেন, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় ধাম গোলোক-বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন।

ব্রজগোপিকাদের 'কামভাব' যৌন আবেদন-প্রসূত নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই 'কামভাব' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য ভক্তের এক বিশেষ আকুলতা। প্রত্যেক ভক্তেরই সিদ্ধ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এক স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ রয়েছে। এই আকর্ষণকে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের 'কামভাব' বলা হয়। ভক্তের এই কাম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে কোন বিশেষভাবে সেবা করার জন্য অত্যধিক আকুলতা। এই আকুলতাকে ভগবানকে ভোগ করার কামনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে ভগবানকে আনন্দ দান করার প্রচেষ্টা। যেমন, যে ভক্ত গোপসখারূপে ভগবানের সঙ্গ করতে চান, তিনি গোষ্ঠে গাভীদের তত্ত্বাবধান করে ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এটি ভগবানের সঙ্গসুখ লাভ করার বাসনা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানকে আনন্দ দান করার প্রচেষ্টা।

## কামরূপা ভক্তি

ভগবানের সেবা করার এই চরম বাসনা কেবল অপ্রাকৃত ব্রজভূমিতেই দেখা যায়। আর তা কেবল গোপিকাদের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিকাদের প্রেম এতই উন্নত যে, আমাদের বোঝাবার জন্য তা 'কামভাব' বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাধারণ কামভাব ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার এই ঐকান্তিক বাসনার পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন, *আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা — তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম'*

*নাম*। জড় জগতে প্রেমিকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার কোন রকম চেষ্টা প্রেমিক করে না। প্রকৃতপক্ষে, জড় জগতে সকলেই তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করার চেষ্টা করে। ব্রজগোপিকারা কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা ছাড়া আর কিছুই চাননি, সেই রকম কোন দৃষ্টান্ত জড় জগতে পাওয়া যায় না। তাই তত্ত্ববিদেরা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের এই দিব্য প্রেমকে 'কামভাব' বলে বর্ণনা করে, যেন জড়-জাগতিক কামের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিকভাবে তার অর্থ বিশ্লেষণ করা উচিত নয়। এটি কেবল সর্বোত্তম অপ্রাকৃত ভাব উপলব্ধি করার একটি পন্থামাত্র।

উদ্ধব আদি ভগবানের মহান ভক্তরা ভগবানের অতি প্রিয় সখা, আর তাঁরাও ব্রজগোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিকাদের প্রেম অবশ্যই জড়-জাগতিক কাম নয়। তা না হলে, উদ্ধবের মতো মহাজ্ঞানী, মহান ভক্তরা কেন তাঁদের অনুসরণ করার প্রয়াসী হবেন? আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করেছিলেন, আর তিনিই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, ব্রজগোপিকারা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছেন, সেটিই হচ্ছে সর্বোত্তম আরাধনা। সুতরাং ব্রজগোপিকাদের কৃষ্ণ-আরাধনা যাকে আপাতদৃষ্টিতে 'কামভাব' বলে মনে হয়, তার মহিমা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও কীর্তন করে গেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিকাদের যে আকর্ষণ, তাকে আপাতদৃষ্টিতে কাম বলে মনে হলেও, তা মোটেই জড়-জাগতিক নয়। পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপিকাদের সম্পর্ক উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তাঁদের এই ভাব সাধারণ যুবক-যুবতীর প্রেমের মতো মনে হয় বলে, অনেক সময় সেটিকে জড়-জাগতিক কাম বলে ভুল হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, যে সমস্ত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীদের প্রেমের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে না, তারা মনে করে, ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই ভাব-বিনিময় সাধারণ জড় সম্পর্ক, এবং তাই তারা কখনও কখনও সেই বিষয় নিয়ে আধুনিক পন্থার নানা রকম উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র অঙ্কন করে।

আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জার কামভাবকে 'প্রায় কামভাব' বলে বর্ণনা করেছেন। কুব্জা ছিলেন এক অতি কুৎসিত বিকৃতদেহী স্ত্রীলোক এবং তিনিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর এই প্রেম দিব্য হলেও তা প্রায় জড়-জাগতিক কামের মতো ছিল, এবং তাই তাঁর প্রেমকে ব্রজগোপিকাদের প্রেমের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর এই অনুরাগকে বলা হয় 'কামপ্রায়', অথবা প্রায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের প্রেমের মতো।

# ষোড়শ অধ্যায়

# রাগানুগা ভক্তির অতিরিক্ত বর্ণনা

## সম্বন্ধ রস

নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা প্রমুখ ব্রজবাসীদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আদর্শ পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব অভিমানের দিব্যভাব দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, কেউই শ্রীকৃষ্ণের মাতা অথবা পিতা হতে পারেন না। কিন্তু ভক্তের এই ভাবকে বাৎসল্য রসাশ্রিত কৃষ্ণপ্রেম বলা হয়। বৃষ্ণিবংশীয়রাও (দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়রা) এই ভাবের দ্বারা ভাবিত ছিলেন। সুতরাং বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ দ্বারকায় বৃষ্ণিবংশীয় ও ব্রজবাসী উভয়ের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল।

বৃষ্ণি ও ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন, তা তাঁদের নিত্যভাব। বৈধীভক্তির স্তরে এই অনুরাগের আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই, কেন না অধিক উন্নত অবস্থাতেই কেবল তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়।

## স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-সেবার যোগ্যতা

বৃষ্ণি ও ব্রজবাসী আদি নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক যাঁরা অনুসরণ করতে চান, তাঁদের বলা হয় রাগানুগা ভক্ত, অর্থাৎ সেই ভক্তদের মতো তাঁরা সিদ্ধিলাভ করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই ধরনের রাগানুগা ভক্তরা ততটা দৃঢ়তার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করেন না, কিন্তু তাঁরা স্বাভাবিকভাবে নন্দ মহারাজ বা মা যশোদা প্রমুখ ভগবানের নিত্য পার্ষদদের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। কোন বিশেষ ভক্তের মতো হওয়ার অভিলাষ তাঁদের ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে। এই ধরনের ভক্তিকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি।

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সম্পূর্ণভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত না হলে, এইভাবে ব্রজবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার আকাঙ্ক্ষা লাভ করা যায় না। বৈধীভক্তি অনুশীলনের একটি স্তর হচ্ছে অনর্থ-নিবৃত্তি, অর্থাৎ সেই স্তরে সব রকমের জড়-জাগতিক অনর্থগুলি দূর হয়ে যায়। কখনও কখনও দেখা যায় কেউ

কেউ ভগবদ্ভক্তির অনুকরণ করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অনর্থ থেকে মুক্ত হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, এই সমস্ত তথাকথিত ভক্তরা নন্দ মহারাজ, যশোদা মা অথবা ব্রজগোপিকাদের অনুগামী বলে নিজেদের পরিচয় দেন। আবার সেই সঙ্গে দেখা যায় যে, তারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ভগবৎ-প্রেমের এই অনুকরণের কোন মূল্য নেই। কেউ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রজগোপিকাদের ভগবৎ-প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন দেখা যাবে যে, তাঁর চরিত্রে কোন রকম জড়-জাগতিক কলুষ নেই।

তাই প্রথমে সকলেরই উচিত শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ ও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে বৈধীভক্তি অনুশীলন করা। সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার পরই কেবল বৃন্দাবনের ভগবৎ-পার্ষদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সম্ভব।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, "কেউ যখন সম্পূর্ণভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হন, তিনি তখন নিরন্তর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কোন নিত্য পার্ষদের কথা স্মরণ করে তাঁর মতো কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হতে পারেন। এই ধরনের প্রবণতা প্রকাশিত হলে, নিরন্তর মানসেও বৃন্দাবনে বাস করা যায়।" অর্থাৎ, যদি সম্ভব হয় তা হলে ব্রজভূমি বৃন্দাবনে গিয়ে সেই চিন্ময় ব্রজধামে ভগবানের নিত্য পার্ষদদের অনুগামী হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে মানসে অর্থাৎ, সেই অবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ধ্যান করে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যেতে পারে। যেখানেই থাকা হোক না কেন, সর্বক্ষণ ব্রজধামের দিব্য জীবনের কথা চিন্তা করা উচিত এবং কোন বিশেষ ভগবৎ-পার্ষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ধ্যান করা উচিত।

যে ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃতে যথার্থই উন্নতি লাভ করেছেন, যিনি নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করলেও নিজেকে প্রকাশ করা উচিত নয়। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রাকৃত দেহ থাকে, ততক্ষণ তিনি নিরন্তর কনিষ্ঠ ভক্তের মতো আচরণ করবেন। শুদ্ধ ভক্তদেরও বৈধীভক্তি আচরণ করা উচিত। কিন্তু যখন ভগবানের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে তিনি তাঁর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন বৈধীভক্তি অনুশীলন করে ভগবানের কোন বিশেষ পার্ষদের তত্ত্বাবধানে অন্তরে ভগবানের সেবার ধ্যান করেন এবং সেই পার্ষদের অনুগামী হয়ে ভগবানের প্রতি তাঁর অন্তরের দিব্য ভাব বিকশিত করেন।

এই সম্পর্কে আমাদের তথাকথিত সিদ্ধ প্রণালী সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে। কিছু লোক, যাদের কোন রকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই এবং যারা মনগড়া কতকগুলি ভক্তির পন্থা তৈরি করেছে, তারা এই সিদ্ধ প্রণালীর পন্থা অনুসরণ করে। তারা কল্পনা করে যে, নিজেদের ভগবানের পার্ষদরূপে চিন্তা করার মাধ্যমেই তারা

ভগবানের পার্ষদ হয়ে গেছে। এই সমস্ত বাহ্য আচরণ কোনমতেই বৈধীভক্তি পন্থার অনুবর্তী নয়। এই তথাকথিত সিদ্ধ প্রণালী প্রাকৃত সহজিয়ারা (অর্থাৎ এক রকম তথাকথিত বৈষ্ণব) অনুশীলন করে থাকে। শ্রীল রূপ গোস্বামীর মত অনুসারে এই ধরনের কার্যকলাপ ভক্তিমার্গে কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, মহান আচার্যরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগানুগা ভক্তির প্রকাশ হওয়ার পরেও বৈধীভক্তি অনুশীলন করা উচিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈধীভক্তির নয়টি সাধনাঙ্গ আছে এবং তদনুযায়ী স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন মানুষের শ্রবণ করার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহ থাকতে পারে, অন্য কেউ কীর্তনে বিশেষভাবে আগ্রহী হতে পারেন, এবং অন্য কারও মন্দিরে ভগবানের সেবা করার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যেতে পারে। সুতরাং সেইভাবে, অর্থাৎ স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন, অর্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এর যে কোনও একটি পন্থা অবলম্বনে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যেতে পারে। এইভাবে সকলকেই তাঁদের স্বাভাবিক রুচি অনুসারে ভগবানের সেবা করা উচিত।

## কামানুগা ভক্তি

বৃন্দাবনের গোপিকাদের অথবা দ্বারকার মহিষীদের পদাঙ্ক অনুসরণে যে ভগবৎ-সেবা, তাকে বলা হয় কামানুগা ভক্তি। এই ভগবদ্ভক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি হচ্ছে 'স্বকীয়া' ও অপরটি হচ্ছে 'পরকীয়া'। এই উভয় ক্ষেত্রেই গোলোক-বৃন্দাবনে মাধুর্যরসে ভগবানের সেবায় যুক্ত কোন বিশেষ গোপিকার অনুগামী হতে হয়। মাধুর্যরসে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত হওয়াকে 'কেলি' বলা হয়। এই 'কেলি' কথাটির অর্থ হচ্ছে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। অনেক ভক্ত রয়েছেন, যাঁরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে চান না, কিন্তু গোপিকাদের সঙ্গে ভগবানের মাধুর্যলীলা আস্বাদন করেন। এই ধরনের ভক্তরা কেবল গোপিকাদের সঙ্গে ভগবানের লীলাবিলাসের কথা শ্রবণ করে দিব্য আনন্দ লাভ করেন।

শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অনুসরণ করে যাঁরা বৈধীভক্তির অনুশীলন করছেন, বিশেষ করে শ্রীমন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করছেন, তাঁদেরই হৃদয়ে কেবল কামানুগা ভক্তির প্রকাশ হয়। এই ধরনের ভক্তরা ধীরে ধীরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম লাভ করেন, এবং গোপিকাদের সঙ্গে ভগবানের মাধুর্য লীলা-বিলাসের কাহিনী শ্রবণ করে তাঁরা সেই লীলা-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট

হন। এই স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন তিনি পূর্বোক্ত দুটি বিভাগের যে কোনও একটি বিভাগে অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই মাধুর্যপ্রেম কেবল স্ত্রীলোকদের মধ্যেই প্রকাশিত হয় না। অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক নেই। কোন স্ত্রীলোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাব লাভ করতে পারেন, তেমনই কোন পুরুষ বৃন্দাবনে ব্রজগোপিকার মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমপরায়ণ হয়ে একজন গোপিকার রূপ প্রাপ্ত হতে পারেন। কি করে একজন পুরুষ-ভক্ত গোপিকা হওয়ার বাসনা করতে পারেন, সেই সম্বন্ধে *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "পুরাকালে দণ্ডকারণ্যে বহু ঋষি ছিলেন। দণ্ডকারণ্য হচ্ছে সেই বন, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র পিতার আদেশে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসী হয়ে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় সেখানকার অনেক মহর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁরা কামনা করেছিলেন, তাঁরা যেন স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করতে পারেন। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময় এই মহর্ষিরা গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখী গোপবধূরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধিলাভ করেন।"

দণ্ডকারণ্যের ঋষিদের কাহিনী এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—শ্রীরামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে ছিলেন, তখন যে সমস্ত ঋষিরা সেখানে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করছিলেন, তাঁরা তাঁর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁদের স্মৃতিপথে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মাধুর্যরসে লীলা-বিলাসে রত ব্রজগোপিকাদের স্মৃতির উদয় হয়। তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা ব্রজগোপিকাদের মতো মাধুর্যরসে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে চেয়েছিলেন, যদিও তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র এই উভয় রূপেই জানতেন। তাঁরা জানতেন যে, যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র একজন আদর্শ রাজারূপে লীলাবিলাস করছেন, তাই তিনি একাধিক পত্নী গ্রহণ করতে পারেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু বৃন্দাবনে লীলাবিলাস পরায়ণ পূর্ণ পুরুষোত্তম, তাই তিনি তাঁদের সকলের সেই মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন। সেই সমস্ত ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ শ্রীরামচন্দ্রের থেকে অধিক মনোহর, এবং তাই তাঁরা পরবর্তী জীবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করার জন্য বৃন্দাবনে গোপীরূপে জন্মলাভ করার প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁদের সেই প্রার্থনা শুনে শ্রীরামচন্দ্র মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন।

তাঁর সেই মৌনতা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি সেই সমস্ত ঋষিদের প্রার্থনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের পরবর্তী জীবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এই

আশীর্বাদের ফলে তাঁরা গোকুলে ব্রজবাসীদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁদের পূর্বজন্মের বাসনা অনুসারে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলায় অংশগ্রহণ করে তাঁর সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলায় অংশগ্রহণ করে, তাঁরা তাঁদের দিব্যভাব বিকশিত করে তাঁদের মানবজন্ম সার্থক করেছিলেন।

প্রেমভক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—যথা, স্বামী-স্ত্রীরূপে স্বকীয়া প্রেম এবং প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে পরকীয়া প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরূপে যাঁর ভগবৎ-প্রেম বিকশিত হয়, তিনি দ্বারকায় উন্নীত হয়ে ভগবানের মহিষীরূপে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব লাভ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকারূপে যাঁদের প্রেম বিকশিত হয়, তাঁরা গোলোক-বৃন্দাবনে উন্নীত হয়ে, গোপিকারূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় অংশগ্রহণ করার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন। এখানে খুব সতর্কতার সঙ্গে একটি জিনিস আমাদের বুঝতে হবে যে, গোপী অথবা মহিষীরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাধুর্য প্রেমপরায়ণ হওয়া কেবল স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, পুরুষদের পক্ষেও সেই ভাব বিকশিত করা সম্ভব, যা দণ্ডকারণ্যের ঋষিদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। কেউ যদি প্রেমভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে চান, কিন্তু গোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করেন, তা হলে তিনি দ্বারকায় উন্নীত হয়ে ভগবানের সঙ্গলাভ করবেন।

*মহাকূর্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, "অগ্নিদেবের পুত্র মহান ঋষিরা প্রেমভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের পরবর্তী জীবনে তাঁরা সমস্ত সৃষ্টির পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলেই তাঁকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করেছিলেন।"

## বাৎসল্য ও সখ্য

যে সমস্ত ভক্তরা বাৎসল্য রসে অথবা সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে যথাক্রমে নন্দ মহারাজ অথবা সুবলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। নন্দ মহারাজ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা, এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সখাদের মধ্যে সুবল হচ্ছেন তাঁর সব চাইতে অন্তরঙ্গ সখা।

ভগবানের পিতা অথবা সখারূপে সম্পর্ক বিকশিত করার দুটি পন্থা রয়েছে। একটি পন্থা হচ্ছে, সরাসরিভাবে ভগবানের পিতা হওয়ার চেষ্টা করা, এবং অপরটি হচ্ছে, নন্দ মহারাজের অনুগামী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পিতা হওয়ার আদর্শ বিকশিত করা। এই দুটির মধ্যে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের পিতা হওয়ার প্রচেষ্টা

স্বীকার করা হয়নি। এই ধরনের প্রচেষ্টা মায়াবাদ (নির্বিশেষবাদ) দর্শনের দ্বারা কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মায়াবাদী অথবা অদ্বৈতবাদীরা মনে করে যে, তারা নিজেরাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, এবং কেউ যদি মনে করে যে, সে নিজেই নন্দ মহারাজ হয়ে গেছে, তা হলে ভগবানের প্রতি তার বাৎসল্য রস মায়াবাদ দর্শনের দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়। মায়াবাদী দার্শনিকদের মনোভাব অপরাধজনক, এবং কোন অপরাধী ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করে ভগবানের সঙ্গলাভ করতে পারে না।

*স্কন্দ-পুরাণে* পাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুরবাসী এক বৃদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বৃদ্ধ তাঁর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেছিলেন। নারদ মুনি সেই বৃদ্ধকে নন্দ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তার ফলে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

*নারায়ণ-ব্যূহস্তবের* একটি বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, যে সমস্ত মানুষ নিরন্তর তাঁদের পতিরূপে, সখারূপে, পিতারূপে বা শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে ভগবানের কথা চিন্তা করছেন, তাঁরা সকলেই আরাধ্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের বিশেষ কৃপার প্রভাবেই কেবল প্রকাশিত হতে পারে। ভগবদ্ভক্তির এই পন্থাকে কখনও কখনও *পুষ্টিমার্গ* বলে সম্বোধন করা হয়। *পুষ্টি* অর্থ পুষ্টিকর এবং *মার্গ* অর্থ পথ। এই ধরনের ভক্তিভাব বিকশিত হওয়ার ফলে, সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তি লাভের পুষ্টিসাধন হয়। তাই তাকে বলা হয় পুষ্টিমার্গ। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়, বল্লভ সম্প্রদায় এই *পুষ্টিমার্গে* শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

# সপ্তদশ অধ্যায়

# ভাবভক্তি

বৈধীমার্গে ভগবদ্ভক্তি সাধন করার ফলে, জড়া প্রকৃতির গুণগুলি অতিক্রম করে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। সেই সময় ভক্তের হৃদয় সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সূর্যলোক গ্রহমণ্ডলের অনেক ঊর্ধ্বে, এবং সূর্যের কখনও মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই; তেমনই ভক্ত যখন সূর্যের মতো নির্মল হন, তখন তাঁর নির্মল হৃদয় থেকে এক দিব্যভাব বিকশিত হয়, যা সূর্যকিরণের থেকেও অধিক উজ্জ্বল। সেই সময়েই কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভক্ত তখন সেই দিব্যভাবে ভাবিত হয়ে ভগবানকে ভালবাসার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। সেই স্তরে ভক্ত ভগবদ্ভক্তির উত্তম অধিকার বা শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন। ভক্ত তখন কোন রকম জড়-জাগতিক বন্ধনের দ্বারা বিচলিত হন না এবং তখন তিনি কেবল শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবাতেই ঐকান্তিকভাবে যুক্ত থাকেন।

স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করে, ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেমের স্তরে উন্নীত হতে পারি। সেই সম্পর্কে দুই রকমের ভগবদ্ভক্তি—বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বৈধীভক্তির দুটি স্তর রয়েছে—সাধন ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। এই রাগানুগা ভক্তিকে বলা হয় 'ভাব'। এই সম্পর্কে তন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই 'ভাব' হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমের প্রথম প্রকাশ, এবং এই স্তরে রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু ইত্যাদি বিকার পরিলক্ষিত হয়। এই বিকারগুলি সব সময় প্রকাশিত হয় না, কেবল মাঝে মাঝে হয়। দুর্বাসা যখন অম্বরীষ মহারাজকে নির্যাতন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন অম্বরীষ মহারাজ ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করতে থাকেন, এবং তখন তাঁর দেহে কিছু বিকার দেখা গিয়েছিল এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। এগুলি হচ্ছে ভাবের লক্ষণ। রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু আদিরূপে তা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পর্যন্ত বাহ্যরূপে প্রকট থাকার পর, এই সমস্ত ভাবের লক্ষণগুলি চিত্তবৃত্তিতে বিরাজমান থাকে, এবং এই ভাবের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে 'সমাধি' বলা হয়। এই উপলব্ধির স্তর থেকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমের আদান-প্রদান শুরু হয়।

দুটি পন্থায় এই ভাবভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। তার একটি হচ্ছে নিরন্তর শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার মাধ্যমে, এবং অন্যটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের বিশেষ কৃপা লাভ করার মাধ্যমে। সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে ভাবভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের বিশেষ কৃপা লাভ করার মাধ্যমে এই ভাবভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল। তাই গভীর নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সেবা করা উচিত, যাতে অন্তত ভাবভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় এবং আমাদের সর্বদাই সেই কৃপা লাভের আশা করা উচিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগ্রহের প্রতীক্ষা করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। কর্তব্য-কর্মগুলি অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, অনেক সময় দেখা যায়, কোন মানুষ স্কুলে অথবা কলেজে না গিয়েও বিরাট পণ্ডিতরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁকে সম্মানীয় উপাধিতে ভূষিত করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, স্কুল-কলেজে পড়াশুনা না করে সকলেই আপনা থেকে সম্মানীয় উপাধি লাভ করবে। তেমনই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে, গভীর নিষ্ঠা সহকারে বৈধীভক্তির অনুশীলন করে ভগবানের সেবা করা এবং সেই সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁর ভক্তের কৃপা লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা।

বৈধীভক্তি অনুশীলন করে ভাবভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রীনারদ মুনির জীবনচরিত, যা *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীল ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন। সেখানে নারদ মুনি নিজেই তাঁর পূর্বজন্মের কথা এবং ভাবভক্তি প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি মহাভাগবতের সেবা করতেন এবং তাঁদের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতেন। যেহেতু তিনি শুদ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে ভগবানের লীলা-বিলাসের কাহিনী এবং তাঁর মহিমা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাই তিনি তাঁর অন্তরে অন্তস্তল থেকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভগবানের কথা শ্রবণে তিনি এত ঐকান্তিকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের উদয় হয়। এই ভাব হচ্ছে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের পূর্বাবস্থা, কারণ পরবর্তী শ্লোকে নারদ মুনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, মহাভাগবতদের মুখারবিন্দ থেকে ভগবানের কথা শোনার ফলে তাঁর হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়। এই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৫/২৮) নারদ মুনি বলেছেন, "প্রথমে বর্ষা ও শরৎকালে মহাভাগবতেরা যখন নির্জনে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেছিলেন, তখন তাঁদের সেবায় আমি আমার দিনগুলি অতিবাহিত করি। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায়

তাঁরা যখন 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতেন, তখন আমি তা শ্রবণ করতাম, এবং তার ফলে ধীরে ধীরে আমার হৃদয় নির্মল হয়। ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তাঁদের কথা শোনার ফলে রজ ও তমোগুণের প্রভাব বিদূরিত হয়, এবং আমি ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হই।"

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে কিভাবে ভাবভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়, এগুলি হচ্ছে তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। তাই যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন, তাঁদের সঙ্গ করা অত্যন্ত আবশ্যক। তার ফলে আমাদের হৃদয় নির্মল হয় এবং আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে পারি।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২৫/২৫) এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে ভগবান কপিলদেব বলছেন, "হে মাতঃ! কেউ যখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করেন, তখন তিনি আমার ভক্তির দিব্য প্রভাব অনুভব করতে পারেন।" অর্থাৎ, কোন শুদ্ধ ভক্ত যখন কথা বলেন, তখন তাঁর সেই বাণী শ্রোতার হৃদয়ে তাঁর অপ্রাকৃত প্রভাব বিস্তার করে। শ্রবণ ও কীর্তনের রহস্য কি? পেশাদারি প্রবচনকারীরা কখনই শ্রোতার হৃদয়ে দিব্য ভাবের সঞ্চার করতে পারে না। কিন্তু কোন তত্ত্বদ্রষ্টা ভগবদ্ভক্ত যখন ভগবানের বাণী শোনান, তখন শ্রোতাদের হৃদয়ে এক অপ্রাকৃত আনন্দের সঞ্চার হয়। তাই এই ধরনের অনন্য ভক্তের সঙ্গ লাভ করার চেষ্টা করা উচিত এবং তাঁদের সঙ্গ করার ফলে ও তাঁদের সেবা করার ফলে কনিষ্ঠ ভক্ত অচিরেই ভগবানের প্রতি আসক্ত হন, এবং ধীরে ধীরে ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি লাভ করেন।

*পদ্ম-পুরাণে* এক কনিষ্ঠ ভক্তের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি ভগবানের কৃপালাভ করে ভাবভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য সারা রাত ধরে নৃত্য করেছিলেন।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন রকম ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন না করেই কেউ হঠাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছেন। কোন কোন মানুষের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির এই আকস্মিক প্রকাশ অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর ভক্তের বিশেষ কৃপা বলে বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আকস্মিকভাবে এই ভাবভক্তির প্রকাশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—(১) বাচিক, (২) আলোকদান ও (৩) হার্দ্য।

বাচিক বা কেবলমাত্র কথা বলার মাধ্যমে ভাবভক্তি বিকাশ করার একটি বর্ণনা *নারদীয়-পুরাণে* রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে বলছেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার প্রতি তোমার সর্ব মঙ্গলময়, সদা পূর্ণানন্দময়ী ও অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রকাশিত হোক।"

আলোকদান বা কেবলমাত্র দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি লাভ করার দৃষ্টান্ত *স্কন্দ-পুরাণে* রয়েছে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, "জঙ্গল প্রদেশের মানুষেরা যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, তখন বিগলিত চিত্তে তাঁরা এতই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না।"

হার্দ্য প্রসাদজ ভাব সম্বন্ধে *শুক-সংহিতায়* নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে বলেছেন, "হে বাদরায়ণ! তোমার মহাভাগবত পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বহু জন্ম-জন্মান্তরে সাধনার ফলে যে বিষ্ণুভক্তি লাভ করা যায়, তা বিনা সাধনাতেই তার চিত্তে উদিত হয়েছে।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাবভক্তি সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* সপ্তম স্কন্ধে (৭/৪/৩৬) নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন, "হে রাজন! প্রহ্লাদ মহারাজের অসংখ্য গুণের যথাযথ বর্ণনা কে করতে পারে? তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ লাভ করেছিলেন। আমি তাঁর মাহাত্ম্যের কেবলমাত্র সূচনা করলাম। তাঁর গুণের যথাযথ বর্ণনা করা অসম্ভব।" অর্থাৎ নারদ মুনি নিজেই স্বীকার করলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়েছিল।

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের এই স্বাভাবিক রতি প্রকাশিত হয়েছিল নারদ মুনির কৃপার প্রভাবে। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন নারদ মুনি করুণা করে তাঁর মাকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেই সময় নারদ মুনি কামনা করেছিলেন যে, তাঁর গর্ভস্থ শিশুটিও যেন সেই উপদেশ গ্রহণ করে লাভবান হয়। যেহেতু নারদ মুনির মতো একজন ভগবৎ-পার্ষদ মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য এই শুভ কামনা করেছিলেন, তাই প্রহ্লাদ মহারাজ মহাভাগবতের গুণাবলীতে ভূষিত হন। এই ভাবকে বলা হয় স্বাভাবিক রতি। পরমেশ্বর ভগবান অথবা নারদ মুনির মতো মহাভাগবতের বিশেষ কৃপার ফলে এই স্বাভাবিক রতি লাভ করা যায়।

*স্কন্দ-পুরাণে* একটি বর্ণনা রয়েছে, যেখানে পর্বত মুনি নারদ মুনিকে বলছেন, "হে নারদ! সমস্ত মহাত্মাদের মধ্যে আপনি এত মহান ও মহিমান্বিত যে, কেবলমাত্র আপনার শুভ কামনার প্রভাবে অতি নীচকুলোদ্ভূত ব্যাধও ভগবান শ্রীহরির মহান ভক্তে পরিণত হয়েছেন।"

এই রতিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবেন।

# অষ্টাদশ অধ্যায়

# ভাবাবিষ্ট ভক্তের লক্ষণ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর হৃদয়ে ভাবের উদয় হয়েছে, এখানে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর লক্ষণগুলি বর্ণনা করেছেন। সেই লক্ষণগুলি হচ্ছে—

১। তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করতে উৎকণ্ঠিত থাকেন। তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে চান না। তিনি সব সময়, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করতে চান।

২। তিনি সর্বদাই গম্ভীর ও সহনশীল।

৩। তিনি সব সময়ে জাগতিক আকর্ষণের প্রতি অনাসক্ত।

৪। তিনি তাঁর কার্যকলাপের বিনিময়ে কোন রকম জাগতিক সম্মান আশা করেন না।

৫। তিনি সব সময় বিশ্বাস করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে কৃপা করবেন।

৬। তিনি সর্বদাই বিশ্বস্তভাবে ভগবানের সেবা করতে অত্যন্ত উৎসুক।

৭। তিনি সর্বদাই ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত।

৮। ভগবানে দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করতে তিনি সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকেন।

৯। মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা আদি ভগবানের লীলাস্থলীগুলিতে বাস করতে তিনি খুব ভালবাসেন।

## সময়ের সদ্ব্যবহার

ভগবদ্ভাবনায় আবিষ্ট অনন্য ভক্ত তাঁর বাণী দিয়ে নিরন্তর ভগবানের প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁর মন দিয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন এবং তাঁর দেহ দিয়ে তিনি হয় ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করেন অথবা অন্য কোন সেবায় যুক্ত থাকেন। এই রকম ভাবময়ী কার্যকলাপের সময় কখনও কখনও তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে। এইভাবে তাঁর সমস্ত জীবন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় এবং একটি মুহূর্তও তিনি অন্য কোন কার্যকলাপে নষ্ট করেন না।

## সহিষ্ণুতা

নানা রকম গোলমালের মধ্যেও যখন কোন মানুষ অবিচলিত থাকেন, তখন তাঁকে বলা হয় গম্ভীর ও সহনশীল। এই সহনশীলতা ও গাম্ভীর্যের একটি দৃষ্টান্ত

*শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১৯/১৫) মহারাজ পরীক্ষিতের আচরণের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর সময় সমবেত মুনি-ঋষিদের সম্বোধন করে মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, "হে ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের শরণাগত সেবকরূপে আপনারা আমাকে গ্রহণ করুন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আমার হৃদয় ও আমার আত্মা অর্পণ করার জন্য আমি গঙ্গার তীরে এসেছি। আপনারা কৃপা করে আমাকে আশীর্বাদ করুন, যাতে মা গঙ্গাও আমার প্রতি প্রসন্না হন। আমার প্রতি ব্রাহ্মণ-বালকের অভিশাপ আমার উপর নেমে আসুক—তাতে আমি বিচলিত নই। আমার একমাত্র অনুরোধ হচ্ছে, আপনারা আমার জীবনের অন্তিম সময়ে কৃপা করে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করুন, যাতে আমি তখন তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলী উপলব্ধি করতে পারি।"

মহারাজ পরীক্ষিতের এই আচরণ তাঁর জীবনের অন্তিম সময়েও ধীর ও প্রশান্তচিত্ত গাম্ভীর্যের একটি অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত। যে ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্যভাবের উদয় হয়েছে, তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী প্রকাশিত হয়।

## বিষয়ে অনাসক্তি

ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের কামনা করে, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য ভাবের উদয় হয়, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি আর তাঁকে জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না। মনের এই অবস্থাকে অনাসক্তি বলা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধে (৫/১৪/৪৩) এই বৈরাগ্যের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় ভরত মহারাজের চরিত্রে। সেখানে বলা হয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের সৌন্দর্যে মহারাজ ভরত এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, যৌবনেই তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য ইত্যাদি সব কিছু বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করেছিলেন।"

বৈরাগ্যের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত মহারাজ ভরতের মধ্যে পাওয়া যায়। এই জড় জগতে উপভোগ করার মতো সব কিছু তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি তা সবই পরিত্যাগ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বিষয়-বাসনার প্রলোভন থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্জনে কৃত্রিমভাবে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যথার্থ বৈরাগ্য নয়। নানা রকম প্রলোভনের মধ্যেও কেউ যদি জড় বিষয়াসক্তির প্রতি আকৃষ্ট না হন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ বৈরাগী। প্রথম দিকে অবশ্য কনিষ্ঠ ভক্তকে সব রকম মোহ উৎপাদনকারী বিষয় থেকে দূরে থাকতে হয়, কিন্তু দৃঢ়শ্রদ্ধ উত্তম ভক্ত নানা রকম প্রলোভনের মধ্যে থাকলেও তিনি তাদের প্রতি কখনও আকৃষ্ট হন না। এটিই হচ্ছে যথার্থ বৈরাগ্য।

## অমানী

কোন ভক্ত যখন শুদ্ধ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের সমস্ত গুণাবলীসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোন রকম গর্ব অনুভব করেন না, তখন তাঁকে বলা হয় অমানী। *পদ্ম-পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে, মহারাজ ভগীরথ ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁর হৃদয়ে এমন মধুর ভাবের উদয় হয়েছিল যে, তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং তাঁর শত্রু, এমন কি অস্পৃশ্যদের ঘরে গিয়েও ভিক্ষা করেন। তিনি এত বিনীত ছিলেন যে, শ্রদ্ধা সহকারে নতমস্তকে তিনি তাঁদের প্রণাম করতেন।

ভারতের ইতিহাসে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিছুদিন আগেও প্রায় একশ বছর আগে, লালাবাবু নামক কলকাতার একজন বিখ্যাত জমিদার তাঁর অসীম সম্পদ হেলাভরে পরিত্যাগ করে ভগবানের দাসত্ব বরণপূর্বক বৃন্দাবনে চলে যান। তিনিও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন, এমন কি তাঁর শত্রুদের ঘরে গিয়েও তিনি ভিক্ষা করতেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করলে নানা রকম অবমাননা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। সেটি স্বাভাবিক। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্য সেই সমস্ত অবমাননা, লাঞ্ছনা হাসিমুখে সহ্য করেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য কৃষ্ণভক্ত অতি তুচ্ছ পদও গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।

## আশাবন্ধ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অবশ্যই কৃপা করবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাসকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় *আশাবন্ধ*। "যেহেতু আমি ভগবদ্ভক্তির নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, তাই আমি অবশ্যই ভগবানের কাছে ফিরে যাব।" এইভাবে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের করুণা প্রত্যাশী হওয়াকে বলা হয় *আশাবন্ধ*।

এই আশার বর্ণনা শ্রীল রূপ গোস্বামীর একটি প্রার্থনায় অপূর্ব সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "কৃষ্ণপ্রেমে আমি মগ্ন হতে পারলাম না, এমন কি শ্রবণ, কীর্তন আদি যে সমস্ত পন্থার মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হয়, তার প্রতি আমি আসক্ত হতে পারলাম না। আর ভক্তিযোগ, যাঁর প্রভাবে মানুষ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারেন এবং তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তা সাধন করতেও আমি অক্ষম। দার্শনিক জ্ঞান অথবা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করার সুযোগ আমার নেই। আমি উচ্চকুলেও জন্মগ্রহণ করিনি। তাই, হে গোপীজনবল্লভ! আমি কেবল তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আমি কেবল বাসনা করি এবং আশা করি যে, কোন না কোনভাবে আমি যেন তোমার

শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত হতে পারি। এই আশা আমার হৃদয়কে ব্যথাতুর করে তোলে, কেন না আমি মনে মনে বুঝতে পারি যে, জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে আমি কত অক্ষম।" এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে, গভীর নিরাশার মধ্যেও আমাদের আশা রাখতে হবে যে, কোন না কোনভাবে আমরা ভগবানের চরণারবিন্দের দিকে অগ্রসর হতে পারব।

## সমুৎকণ্ঠা

কেউ যখন ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন, তখন সেই উৎকণ্ঠাকে বলা হয় সমুৎকণ্ঠা। অর্থাৎ, 'সম্পূর্ণভাবে উৎকণ্ঠিত হওয়া'। প্রকৃতপক্ষে, এই উৎকণ্ঠাই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি লাভের মূল্য। সব কিছুরই কিছু-না-কিছু মূল্য রয়েছে, এবং তা পেতে হলে সেই মূল্য দান করতে হয়। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব চাইতে মূল্যবান বস্তু কৃষ্ণভক্তি ক্রয় করতে হলে, তার মূল্যস্বরূপ গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হতে হয়। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর *কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থে এই সমুৎকণ্ঠা অপূর্ব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে বলেছেন, "বৃন্দাবনের সেই কিশোর বালকটিকে দর্শন করবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করছি, যাঁর রূপ সমস্ত জগৎকে মোহিত করেছে, যাঁর চোখ দুটি পদ্মের পাপড়ির মতো বিস্তৃত আর তার ওপর টানা টানা একজোড়া কালো ভুরু, আর তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের দিকে আগ্রহভরে তাকাচ্ছেন এবং তার ফলে তাঁর চোখ দুটি যেন নিরন্তর নৃত্য করছে। তাঁর চোখ দুটি সর্বদাই আর্দ্র, তাঁর অধরৌষ্ঠ তাম্রবর্ণ, এবং সেই অধরৌষ্ঠ থেকে যে শব্দতরঙ্গ উত্থিত হয়, তা মানুষকে মত্ত হস্তীর থেকেও উন্মত্ত করে তোলে। বৃন্দাবনে তাঁকে দেখার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠেছি।"

## ভগবানের দিব্য নামের প্রতি আসক্তি

এই *কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থেই শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণনাম কীর্তন সম্বন্ধে একটি বর্ণনা আছে। রাধারাণীর একজন সখী বলছেন, "হে গোবিন্দ! মহারাজ বৃষভানুর কন্যা অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে নিরন্তর 'কৃষ্ণ!' 'কৃষ্ণ!' বলে তোমার নাম ধরে ডাকছে।"

## ভগবানের দিব্য গুণাবলী বর্ণনায় আগ্রহ

ভগবানের মহিমা কীর্তন করার প্রতি আসক্তিও *কৃষ্ণকর্ণামৃত*তে বর্ণিত হয়েছে—"সমস্ত মাধুর্য থেকেও যিনি অধিক মধুর এবং সমস্ত দুরন্ত বালকদের

থেকেও যিনি অধিক চঞ্চল, সেই কৃষ্ণকে নিয়ে আমি এখন কি করি? তাঁর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত কার্যকলাপ আমার হৃদয়কে এমনভাবে আকর্ষণ করছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত!"

## শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীতে বাস করার আকাঙ্ক্ষা

*পদ্যাবলী* নামক গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের বর্ণনা করে বলেছেন, "এখানে নন্দ মহারাজের পুত্র তাঁর পিতার সঙ্গে বাস করতেন। নন্দ মহারাজ ছিলেন সমস্ত গো-পালকদের রাজা। এখানে কৃষ্ণ একটি শকট ভেঙ্গে ফেলেন, যাতে শকটাসুর নামে একটি অসুর লুকিয়ে ছিল। এখানেই সেই দামোদর যিনি আমাদের জড় বন্ধন মোচন করতে পারেন, তিনি তাঁর মা যশোদার দ্বারা রজ্জুবদ্ধ হয়েছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত মথুরা অথবা বৃন্দাবনে বাস করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাস্থলীগুলি দর্শন করেন। এই পবিত্র ধামে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখা ও মা যশোদার সঙ্গে তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন। আজও কৃষ্ণভক্তরা সেই সমস্ত স্থানগুলি পরিক্রমা করেন এবং যাঁরা মথুরা ও বৃন্দাবনে আসেন, তাঁরা নিরন্তর এক অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে, বৃন্দাবনে গেলেই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অনুভূত হয়, কেন না প্রকটকালে তিনি সেখানে যে সমস্ত মধুর লীলাবিলাস করেছিলেন, সেই কথা তখন মনে পড়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করার প্রতি আকর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এক রকমের আসক্তি। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও যোগীরা কৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করে অবশেষে পরমেশ্বর ভগবানে লীন হয়ে যেতে চান। কখনও কখনও তাঁরা শুদ্ধ ভক্তের ভাব অনুকরণ করে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীতে যান। কিন্তু তাঁরা কেবল সাযুজ্য মুক্তি কামনা করেন, তাই তাঁদের এই কার্যকলাপ ভগবানের প্রতি আসক্তিবশত নয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি কর্মী ও জ্ঞানীদের হৃদয়ে কখনই প্রকাশিত হতে পারে না, কেন না শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা-প্রসূত এই রতি অত্যন্ত দুর্লভ এবং অনেক মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও তা লাভ করা সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়। যে মানুষ কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তিলাভ করতে চান, তাঁর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া অসম্ভব। তাঁর প্রতি এই আসক্তি বা রতি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত গোপন রাখেন এবং তিনি কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই তা দান করেন। এমন কি, সাধারণ ভক্তরাও

এই ধরনের বিশুদ্ধ কৃষ্ণরতি লাভ করতে পারেন না। সুতরাং যে সমস্ত মানুষের হৃদয় সকাম কর্মের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কলুষিত হয়ে আছে এবং যারা নানা রকম মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন হয়ে আছে, তারা কি করে এই রতি লাভ করবে?

অনেক কথাকথিত ভক্ত আছে, যারা কৃত্রিমভাবে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার ধ্যান করে। কখনও কখনও কেউ আবার অভিনয় করে, যেন একটি বালকরূপে কৃষ্ণ তার সঙ্গে কথা বলছেন, অথবা রাধারাণী ও কৃষ্ণ উভয়েই তার কাছে এসে তার সঙ্গে কথা বলছেন। এই ধরনের অভিনয়গুলি নির্বিশেষবাদীরাই করে, এবং এইভাবে তারা নিরীহ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে, যাদের ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু কেন অভিজ্ঞ ভক্ত যখন সমস্ত কৌতুকাভিনয় দেখেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত কপটাচারী ভণ্ডগুলির মুখোশ খুলে দেন। কখনও কখনও এই সমস্ত ভণ্ডগুলি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির অভিনয় করে, কিন্তু সেগুলি কখনও যথার্থ আসক্তি বলে স্বীকার করা হয় না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, এই ধরনের আসক্তির অনুকরণ করার ফলেও ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যেতে পারে।

এই আসক্তির অনুকরণকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—ছায়া আসক্তি ও পরা আসক্তি। কেউ যখন বৈধীভক্তি অনুসরণ না করে অথবা সদ্গুরুর দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এই ধরনের আসক্তির অনুকরণ করে, তাকে বলা হয় ছায়া আসক্তি। কখনও কখনও দেখা যায়, কোন মানুষ জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও অথবা মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও সৌভাগ্যক্রমে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে রত শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করেন। সেই সময় কেবলমাত্র এই শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করার ফলে, সেই শুদ্ধ ভক্তদের চন্দ্রকিরণের মতো স্নিগ্ধ ভগবৎ-প্রেম তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গের প্রভাবে তিনি অনুসন্ধিৎসু হয়ে এক রকম আসক্তি লাভ করেন, কিন্তু এই আসক্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যদি এই ক্ষণস্থায়ী আসক্তির উদয়ে জড়-জাগতিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, তখন তাকে বলা হয় পরা আসক্তি।

এই ধরনের ছায়া আসক্তি অথবা পরা আসক্তি শুদ্ধ ভক্তসঙ্গের প্রভাবে অথবা বৃন্দাবন বা মথুরায় গমনের প্রভাবে বিকশিত হতে পারে। কোন সাধারণ মানুষও যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই আসক্তি লাভ করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারেন। অর্থাৎ, চিন্ময় আসক্তি এত শক্তিশালী যে, এই আসক্তি লাভ করে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে, সাধারণ মানুষও সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু শুদ্ধ

ভক্তের পবিত্র সঙ্গের প্রভাবে আশীর্বাদপুষ্ট না হলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই আসক্তি লাভ করা যায় না।

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে যেমন আসক্তির উদয় হয়, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের চরণকমলে অপরাধ করলে সেই আসক্তি নির্বাপিত হয়ে যায়। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির উদয় হয়, কিন্তু কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের শ্রীচরণকমলে অপরাধ করে, তা হলে তার ছায়া আসক্তি অথবা পরা আসক্তি ক্ষয় হয়ে যেতে পারে। এই ক্ষয় অনেকটা পূর্ণচন্দ্রের ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো। তাই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার সময় সব সময় সচেতন থাকা উচিত, তাঁদের চরণে যেন কোন অপরাধ না হয়ে যায়।

শুদ্ধ ভক্তের প্রতি অপরাধের অনুপাতে ছায়া আসক্তি বা পরা আসক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। যদি অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর হয়, তা হলে আসক্তি সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হয়ে যায়, আর সেই অপরাধ যদি ততটা গুরুতর না হয়, তা হলে আসক্তি মধ্যম অথবা কনিষ্ঠ শ্রেণীর হয়ে পড়ে।

কেউ যদি ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়, অথবা মোক্ষ লাভের অভিলাষী হয়, তা হলে তার ভাব ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে ছায়া আসক্তি, পরা আসক্তি অথবা 'অহংগ্রহোপাসনায়' পরিণত হয়। কোন মানুষ যখন নিজেকেই পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে ভগবানের মতো পূজালাভ করতে চায়, সেই আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় 'অহংগ্রহোপাসনা'। আত্মোপলব্ধির এই অবস্থার নাম অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদীরা মনে করে যে, তারা ভগবানের থেকে অভিন্ন। এইভাবে যেহেতু তারা ভগবানের সঙ্গে তাদের পার্থক্য নিরূপণ করে না, তাই তারা মনে করে যে, তাদের নিজেদের পূজার মাধ্যমেই তারা পরম ঈশ্বরের পূজা করছে।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে কীর্তন করছে ও নৃত্য করছে, কিন্তু মনে মনে সে ভাবছে যে, সে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এই অদ্বৈত ধারণা শুদ্ধ ভক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক সময় দেখা যায় যে, বৈধীভক্তি সাধন না করেও অকস্মাৎ কেউ উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন। এই ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, পূর্বজীবনে তিনি উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছিলেন। যে কোনও কারণবশত তা সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত ছিল, খুব সম্ভবত ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করার ফলে। কিন্তু আবার সুযোগ পাবার ফলে তা পুনরায় বিকশিত হয়েছে। এর সিদ্ধান্তে বলা যায় যে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবেই কেবল ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করা যায়।

কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করতে পারেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেটি সম্ভব হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে। জাগতিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর আনন্দ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ভাবভক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছেন যে ব্যক্তি, তিনি যদি কখনও ঘটনাক্রমে ভক্তিমার্গীয় কার্যকলাপ থেকে চ্যুত হন, তবুও তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* এই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, ভক্তের ভগবানের প্রতি স্থির বিশ্বাস ও অবিচল ভক্তি রয়েছে, এমন কি তাঁকেও যদি কখনও ভক্তিযোগের স্তর থেকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়, তবুও তাঁকে শুদ্ধ ভক্তরূপেই গণ্য করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবের প্রতি দৃঢ় ভক্তিযুক্ত হয়ে যিনি তাঁদের নিত্য সেবায় যুক্ত থাকেন, তিনি ভক্তিযোগে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

*নৃসিংহ-পুরাণে* বলা হয়েছে, "যদি কোন ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য সেবায় নিযুক্ত থাকেন, এবং তাঁকে যদি আপাতদৃষ্টিতে কোন অসৎ কার্যে লিপ্ত থাকতে দেখাও যায়, তবুও তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেই অসৎ আচরণগুলি শীঘ্রই দূরীভূত হবে।" এই প্রসঙ্গে চাঁদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, পূর্ণচন্দ্রে অনেক সময় কিছু কিছু দাগ দেখা যায়, যেগুলিকে দেখে কলঙ্ক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তবুও চন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতির প্রকাশকে তার দ্বারা রোধ করা যায় না। ঠিক সেই রকম ভক্তিযোগে ভগবানের বিবিধ সেবার মধ্যে যদি ক্ষুদ্র একটি ত্রুটি থাকে, সেই ত্রুটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে আসক্তি, তা দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ। দিব্য আনন্দরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র জড় ত্রুটিসমূহের যে কলঙ্ক, তা নিতান্তই নগণ্য।

# উনবিংশতি অধ্যায়

# শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম

প্রতিটি জীবই কোন একটি বিশেষ রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যখন সেই বিশেষ রসে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার বাসনা অত্যন্ত তীব্র হয়, তখন তাকে শুদ্ধ প্রেম বলা হয়। প্রাথমিক স্তরে ভক্ত শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা অনুসারে বৈধীভক্তি অনুসরণে তৎপর হন। কিন্তু এই সাধনার মাধ্যমে তিনি যখন সব রকম প্রাকৃত কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হওয়ার প্রতি রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। এই রুচি ও আসক্তি যখন কালক্রমে ধীরে ধীরে দৃঢ় হয়, তখন তা 'প্রেম'রূপ ধারণ করে। 'প্রেম' কথাটি কেবল ভগবানের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হয়। প্রাকৃত জগতে প্রেমের কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রাকৃত জগতে যাকে ভ্রমপূর্বক প্রেম বলে মনে করা হয়, তা কাম ছাড়া আর কিছুই নয়। সোনা ও লোহার মধ্যে যে বিরাট প্রভেদ রয়েছে, প্রেম ও কামের মধ্যেও সেই রকম প্রভেদ রয়েছে। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কাম ও মমতা যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি প্রকাশিত হয়, তখন তাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ আদি মহাজনেরা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমরূপে স্বীকার করে গেছেন।

ভীষ্ম প্রমুখ মহাজনেরা বিশ্লেষণ করে গেছেন যে, ভগবৎ-প্রেমের অর্থ হচ্ছে সকলের প্রতি তথাকথিত প্রেম ত্যাগ করা। ভীষ্ম বলেছেন, অন্য সব কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে, কেবল একমাত্র পুরুষ ভগবানের প্রতি সর্বতোভাবে প্রীতিপরায়ণ হওয়ার নাম হচ্ছে প্রেম। এই শুদ্ধ প্রেম দুভাবে লাভ করা সম্ভব—চিন্ময় ভাবযুক্ত হওয়ার ফলে এবং স্বয়ং ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে।

## চিন্ময় ভাব

সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ পালন করে বৈধীভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ভগবানের প্রতি চিন্ময় ভাবের উদয় হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২/৪০) বৈধীভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে এই চিন্ময় ভাবের উদয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "বৈধীভক্তি অনুশীলন করতে করতে ভক্ত যখন স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হন, তখন দ্রবীভূত চিত্তে তিনি উন্মাদের মতো

নৃত্য করেন। ভগবানের নাম কীর্তন করতে করতে তিনি কখনও রোদন করেন, কখনও প্রলাপে মগ্ন হন, কখনও গান করেন, এবং লোকলজ্জার প্রতি উদাসীন হয়ে উন্মত্তের মতো নৃত্য করেন।"

*পদ্ম-পুরাণে* রাগানুগা ভক্তি থেকে উৎপন্ন চিন্ময় প্রেমের দৃষ্টান্ত রয়েছে। চন্দ্রকান্তি নামক একজন সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন। তিনি নিরন্তর ভগবানের দিব্যমূর্তির ধ্যান করতেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তনে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আর অন্য কাউকে তিনি পতিরূপে বরণ করবেন না।

## ভগবানের বিশেষ কৃপা

যখন দেখা যায় যে, কোন ভক্ত চিন্ময় প্রেমে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গলাভ করছেন, তখন বুঝতে হবে যে, ভগবান স্বয়ং তাঁর প্রতি বিশেষ অহৈতুকী কৃপা করে তাঁকে সেই অবস্থা দান করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* একাদশ স্কন্ধে (১১/১২/৭) এই বিশেষ কৃপার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, "বৃন্দাবনের গোপবধূরা আমাকে পাওয়ার জন্য বেদপাঠ করেনি, তীর্থ পর্যটন করেনি, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করেনি, কোন রকম তপশ্চর্যা করেনি। কেবলমাত্র আমার সঙ্গলাভের প্রভাবে তাঁরা ভক্তির এই চরম সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।"

*পদ্ম-পুরাণে* চন্দ্রকান্তির দৃষ্টান্ত ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* গোপিকাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ভক্ত যখন নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন এবং সর্বক্ষণ ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপার প্রভাবে অনন্য ভক্তির চরম সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, "কোন মানুষ যদি শ্রীহরির আরাধনা করেন, গুণগান করেন এবং তাঁর প্রতি প্রেমপরায়ণ হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি সব রকমের তপশ্চর্যা, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি আত্ম-উপলব্ধির সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি ইতিমধ্যেই সাধন করেছেন। পক্ষান্তরে, সব রকমের তপশ্চর্যা, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পরেও কেউ যদি ভগবান শ্রীহরির প্রতি প্রেমপরায়ণ না হন, তা হলে তাঁর সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। কেউ যদি নিরন্তর অন্তরে ও বাইরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি সব রকমের যাগযজ্ঞ, তপস্যা, যোগ আদি আত্মজ্ঞান লাভের সব কয়টি স্তর অতিক্রম করেছেন। আর এই সমস্ত যাগযজ্ঞ, তপস্যা আদি অনুষ্ঠান করার পরেও কেউ যদি নিরন্তর অন্তরে ও বাইরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে না পারেন, তা হলে তিনি নিরর্থক এই সমস্ত অনুশীলন করেছেন।"

ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রতি আসক্ত হওয়াকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—একটি হচ্ছে ভগবানের মহত্ত্ব অনুভব করে তাঁর প্রতি গভীর সম্ভ্রমযুক্ত হওয়া এবং অপরটি হচ্ছে কোন রকম বিবেচনা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে, গভীরভাবে সম্ভ্রমযুক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি যে গভীর মমতা ও ঐকান্তিক প্রেম লাভ হয়, তার ফলে ভক্ত অবশ্যই চার রকম বৈষ্ণব-মুক্তি লাভ করেন, যথা—সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি। বৈষ্ণব-মুক্তি মায়াবাদ মুক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মায়াবাদ মুক্তি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় বিলীন হয়ে যাওয়া।

*নারদ-পঞ্চরাত্রে* স্বার্থ-বাসনাশূন্য বিশুদ্ধ অনন্য ভক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্ত যখন নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হন এবং তাঁর চিত্ত যখন নিরন্তর তাঁর পদারবিন্দে নিবদ্ধ হয়, সেই ভক্তিভাব ভগবানকে আকর্ষণ করার একমাত্র উপায় বলে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, যে বৈষ্ণব নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করছেন, তিনিই হচ্ছেন শুদ্ধ বৈষ্ণব।

সাধারণত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে বৈধীভক্তি অনুশীলন করার ফলে ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভক্ত ভগবানের পরম মাহাত্ম্যের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাঁর দিব্যরূপের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হন। অর্থাৎ, বৈধীভক্তি অনুশীলন করার ফলে ভগবানের দিব্য রূপমাধুরী পূর্ণরূপে আস্বাদন করার যোগ্য হওয়া যায়। এই অতি উন্নত অবস্থা কেবলমাত্র ভক্তের প্রতি ভগবানের অসাধারণ কৃপার প্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

## শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ

যদিও ভগবৎ-প্রেম লাভ করার বিভিন্ন পন্থা উল্লেখ করা হয়েছে, এখন শ্রীল রূপ গোস্বামী এই দিব্য অবস্থা প্রাপ্তির বর্ণনা করেছেন। প্রেমভক্তি লাভের মূল ভিত্তি হচ্ছে শ্রদ্ধা। শুদ্ধ ভক্তদের অনেক সংঘ ও আশ্রম রয়েছে এবং কেউ যদি অল্প একটু শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে এই ধরনের সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন, তখন তিনি শুদ্ধ ভক্তির মার্গে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তের প্রভাব এতই মহান যে, কেউ যদি লেশমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েও তাঁদের সঙ্গ করেন, তা হলে তিনি *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এইভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবে জীবের প্রামাণিক শাস্ত্রের বর্ণনার প্রতি শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার প্রাথমিক স্তর। তার পরবর্তী স্তরে,

অধিক উন্নত ও পরিপক্ক হওয়ার পর, শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয়ে বৈধীভক্তির আচরণ করবার জন্য তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। তারপর তৃতীয় অবস্থায়, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে তিনি বৈধীভক্তির আচরণ করেন এবং তার পরিণাম-স্বরূপ সব রকম অনর্থ থেকে মুক্ত হন। অনর্থ নিবৃত্তি হওয়ার পর তাঁর হৃদয়ে নিষ্ঠার উদয় হয় এবং ক্রমশ ভক্তিমার্গে তাঁর রুচি, আসক্তি, ভাব এবং চরমে প্রেমের উদয় হয়। শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করার এইগুলিই হচ্ছে বিভিন্ন স্তর।

কেবলমাত্র অত্যন্ত ভাগ্যবানেরা জীবনের এই ধরনের সাফল্য লাভ করতে পারেন। যারা কেবল পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁরা কখনই বুঝতে পারেন না কিভাবে ভগবৎ-প্রেমের এই দিব্য ভাব লাভ করা যায়। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* তাই মহাদেব পার্বতীকে বলছেন, "হে মহেশ্বরী, যে পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমে মত্ত হয়ে পরমানন্দে মগ্ন হয়েছেন, তিনি তাঁর শারীরিক ও মানসিক কোন রকম সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করেন না।"

স্নেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদি হচ্ছে প্রেমরূপ বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা। এদের প্রকাশ নানাভাবে হয়। সেই সম্বন্ধে এখানে বিশদভাবে আলোচনা হবে না। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *ভাগবতামৃত* গ্রন্থে সেই সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও স্নেহ আদি প্রেম বিলাসের বিষয় অত্যন্ত গোপনীয়, তবুও সনাতন গোস্বামী অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তার বর্ণনা করেছেন।

এইভাবে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের পূর্ববিভাগ সমাপ্ত করবার সময় শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবৎ-প্রেমের মাধুর্য-প্রকাশক শ্রীল সনাতন গোস্বামী তথা গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আনন্দ বিধানের জন্য এই অংশটি সমর্পণ করেছেন। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীব গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* রচনার সময় সক্রিয় হননি।

*ইতি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের 'প্রেমভক্তি বর্ণনা পর্যন্ত' পূর্ববিভাগের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*

# দ্বিতীয় খণ্ড

# বিংশতি অধ্যায়

# চিন্ময় রস

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* এই দ্বিতীয় বিভাগের প্রারম্ভে গ্রন্থকার 'শ্রীসনাতনের' সশ্রদ্ধ বন্দনা করেছেন। এই সনাতন তাঁর আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর অগ্রজ ও গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী—এই দুজনকেই বোঝায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'সনাতন' বলে সম্বোধন করে তাঁর বন্দনা করেছেন, কেন না স্বরূপত তাঁর রূপ পরম সুন্দর এবং তিনি অঘাসুরকে বিনাশ করেছিলেন। এই পদের দ্বারা তিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামীরও স্মরণ করছেন, যাঁর প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। তিনি সব রকম অমঙ্গলের বিনাশকারী এবং তিনি (রূপ গোস্বামী) সর্বদাই তাঁর সেবা করেছেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* এই দক্ষিণ বিভাগে শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবদ্ভক্তির দিব্য রসের সাধারণ লক্ষণগুলি নিরূপণ করেছেন।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের এই বিভাগের পাঁচটি বিষয় হচ্ছে—(১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক ভাব, (৪) ব্যভিচারী ভাব এবং (৫) স্থায়ীভাব।

ভগবানের সঙ্গে প্রেমের আদান-প্রদানে যে দিব্য অনুভূতির আস্বাদন হয়, তাকে বলা হয় রস। বিবিধ প্রকার রসের মিলন ভক্তিরসের চরম উৎকৃষ্ট অপ্রাকৃত চিদানুভূতি আস্বাদন করতে সাহায্য করে। যদিও এই স্থিতি সর্বতোভাবে আমাদের অনুভবের অতীত, তবুও শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অধ্যায়ে যতদূর সম্ভব তা বিশ্লেষণ করা হবে।

নিজের কার্যকলাপে কোন রকম রসের অনুভব না করে, কেউ এই কার্যকলাপগুলি করে যেতে পারে না। কৃষ্ণভাবনা অথবা ভগবদ্ভক্তির দিব্য জীবনে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে অবশ্যই কোন রস অথবা বিশেষ রুচি থাকতেই হবে। সাধারণত ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, মন্দিরে ভগবানের আরাধনা এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে এই রস আস্বাদন করা যায়। সুতরাং কেউ যখন দিব্য আনন্দ অনুভব করেন, তাকে বলা হয় 'রস আস্বাদন'। আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাকে ভগবদ্ভক্তির 'রস' বলা হয়।

সব রকম মানুষের পক্ষেই ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে এই দিব্যরস আস্বাদন করা সম্ভব নয়, কারণ এই মধুর প্রেমময় বৃত্তির উদ্ভাবনা পূর্বজন্মের

সংস্কার থেকে অথবা শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গের প্রভাবেই হয়। পূর্বের বর্ণনা অনুসারে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবেই কেবল ভগবদ্ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে এই শ্রদ্ধার ফলে অথবা পূর্বজন্মে ভগবদ্ভক্তি আস্বাদন করার ফলে, এই ভক্তিরস আস্বাদন করা যায়। অর্থাৎ ভক্তিরসের এই পরমানন্দ উপলব্ধি সাধারণ মানুষের হতে পারে না। সেই পরম সৌভাগ্যবানের পক্ষেই এই রস আস্বাদন করা সম্ভব, যিনি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করেছেন অথবা পূর্বজন্মে ভক্তিযোগের অনুশীলন করে এসেছেন।

ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তি লাভ করার পন্থা *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, "ভগবদ্ভক্তির সূচনা হয় সেই সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার মাধ্যমে, যাঁদের হৃদয় সৎসঙ্গের প্রভাবে নির্মল হয়েছে। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার ফলে নিরন্তর দিব্য আনন্দ অনুভব করা যায়।" *ভগবদ্গীতাতেও* বর্ণনা করা হয়েছে, যথার্থভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে প্রসন্নতা। এই আনন্দময় জীবনের উপলব্ধি *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার ফলে অথবা ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষদের সৎসঙ্গ করার ফলে হয়, বিশেষ করে যাঁরা শ্রীগোবিন্দের চরণ-কমলের প্রেমময়ী সেবাপরায়ণ হয়ে তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। এই ভাবের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে যিনি সর্বদাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার জন্য বৈধীভক্তি পরায়ণ, তাঁর মধ্যে 'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন' নামক দুই প্রকার বিভাবের উদয় হয়। এইভাবে তিনি পরমানন্দে মগ্ন হন।

কৃষ্ণের প্রতি এই প্রেমের কতকগুলি কারণ রয়েছে, যেমন কৃষ্ণ স্বয়ং, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণের মুরলী নাদ ইত্যাদি। তার প্রভাব কখনও প্রেমময় এবং কখনও চমকপ্রদ।

দিব্য আনন্দ অনুভূতির ফলে শরীরে আটটি চিন্ময় লক্ষণ দেখা যায়, এবং তা পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার ভাবের মিশ্রণের প্রভাবেই সম্ভব হয়। এই পাঁচ প্রকার ভাবের মিশ্রণ বিনা রসাস্বাদন হতে পারে না। রস আস্বাদনের যে কারণ বা দিব্য ভিত্তি, তাকে বিভাব বলা হয়। বিভাবের দুটি ভাগ—আলম্বন ও উদ্দীপন। *অগ্নি-পুরাণে* বিভাবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—"যার থেকে রতি আদি উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয়, বিভাব। সেই বিভাব দুই প্রকার, যথা—আলম্বন ও উদ্দীপন।" অর্থাৎ, দুই প্রকার প্রেমানুভূতি রয়েছে। চিন্ময় প্রেমের মৌলিক বিষয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত প্রেমের বিষয়, এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন সেই প্রেমের আধার। কোন বস্তু দেখে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হওয়াকে বিভাব উদ্দীপন বলা হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অচিন্ত্য শক্তি, গুণ, জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারী, তিনিই হচ্ছেন দিব্য প্রেমের মূল কারণ। তাঁর বিভিন্ন অবতার ও প্রকাশের মাধ্যমেও তিনি ভক্তিরসের উদ্দীপনার কারণ হন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* 'ব্রহ্মাবিমোহন-লীলায়' এই ভক্তিরসের উদ্দীপনার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যখন ব্রহ্মাকে মোহিত করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত গোপবালক, গাভী ও গোবৎসের রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীবলদেব (যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ) বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "আহা! কি আশ্চর্যের বিষয় যে, এই সমস্ত গোপবালক, গোবৎস ও গাভীদের প্রতিও আমি দিব্য আনন্দময় কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি করছি।" এইভাবে চিন্তা করে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যে ভগবৎ-প্রেমের আলম্বন ও উদ্দীপন হয়ে যেতে পারেন, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

# একবিংশতি অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—তার একটি হচ্ছে আচ্ছাদিত, এবং অন্যটি হচ্ছে প্রকট। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিভিন্ন বেশভূষায় সজ্জিত থাকেন, তখন তাঁর স্বরূপ আচ্ছাদিত। তাঁর আচ্ছাদিত স্বরূপের একটি দৃষ্টান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বারকালীলায় রয়েছে। কখনও কখনও কৃষ্ণ স্ত্রীবেশ ধারণ করে লীলাবিলাস করতেন। তাঁর সেই রূপ দেখে উদ্ধব বলেন, "আহা! কী আশ্চর্য, কৃষ্ণ যেভাবে ভক্তিরসে আমার হৃদয়কে দ্রবীভূত করে আমাকে আকর্ষণ করেন, এই স্ত্রীলোকটিও ঠিক সেইভাবে আমাকে আকর্ষণ করছেন। আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই স্ত্রীরূপ ধারণ করেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট স্বরূপ দেখে এক ভক্ত তাঁর রূপমাধুরীর স্তব করে বলেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কী অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত! তাঁর গ্রীবা শঙ্খের মতো! তাঁর চক্ষু এত সুন্দর যে, তা দেখে মনে হয় তাদের কাছে পদ্মফুলের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে গেছে। তাঁর দেহের বর্ণ তমালের মতো ঘনশ্যাম। তাঁর মস্তক ঘন কেশের দ্বারা আচ্ছাদিত। বক্ষে তাঁর শ্রীবৎস চিহ্ন, এবং হাতে তাঁর শঙ্খ। এইরকম সুন্দর রূপ নিয়ে মধুসূদন প্রকাশিত হয়েছেন, তাঁর দিব্য গুণাবলী প্রদর্শন করে তিনি আমাদের দিব্য আনন্দ প্রদান করছেন।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী নানা শাস্ত্র বিচার করে শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোক্ত গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন—১) তাঁর সমস্ত শরীর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত; ২) সমস্ত শুভ লক্ষণযুক্ত; ৩) অত্যন্ত মনোরম; ৪) জ্যোতির্ময়; ৫) বলবান; ৬) নিত্য নবযৌবন-সম্পন্ন; ৭) সমস্ত ভাষায় পারদর্শী; ৮) সত্যবাদী; ৯) প্রিয়ভাষী; ১০) বাক্‌পটু; ১১) পরম পণ্ডিত; ১২) পরম বুদ্ধিমান; ১৩) অপূর্ব প্রতিভাশালী; ১৪) বিদগ্ধ (শিল্পকলায় পারদর্শী); ১৫) অত্যন্ত চতুর; ১৬) পরম দক্ষ; ১৭) কৃতজ্ঞ; ১৮) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; ১৯) স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে বিচার করতে অত্যন্ত সুদক্ষ; ২০) বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করতে এবং উপদেশ দিতে অত্যন্ত পারদর্শী; ২১) পবিত্র; ২২) সংযত; ২৩) অবিচলিত; ২৪) জিতেন্দ্রিয়; ২৫) ক্ষমাশীল; ২৬) গম্ভীর; ২৭) আত্মতৃপ্ত; ২৮) সমদৃষ্টি-সম্পন্ন; ২৯) উদার; ৩০) ধার্মিক; ৩১) বীর; ৩২) কৃপাময়;

৩৩) শ্রদ্ধাবান; ৩৪) বিনীত; ৩৫) বদান্য; ৩৬) লজ্জাশীল; ৩৭) শরণাগত জীবের রক্ষক; ৩৮) সুখী; ৩৯) ভক্তদের হিতৈষী; ৪০) প্রেমের বশীভূত; ৪১) সর্ব মঙ্গলময়; ৪২) সব চাইতে শক্তিশালী; ৪৩) পরম যশস্বী; ৪৪) জনপ্রিয়; ৪৫) ভক্তবৎসল; ৪৬) সমস্ত স্ত্রীলোকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়; ৪৭) সকলের আরাধ্য; ৪৮) সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী; ৪৯) সকলের মাননীয়, ৫০) পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই পঞ্চাশটি গুণ সমুদ্রের গভীরতার মতো পূর্ণরূপে বিরাজমান।

জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তারা যদি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হয়, তা হলে আংশিকভাবে এই পঞ্চাশটি গুণের অধিকারী হতে পারে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত এই সমস্ত দিব্য গুণাবলী আংশিকভাবে ভক্তদের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী সর্বদাই পূর্ণরূপে বিরাজমান।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি দিব্যগুণ শ্রীকৃষ্ণের রয়েছে, যার বর্ণনা *পদ্ম-পুরাণে* দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীর কাছে করেছেন, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে ধরিত্রীর সঙ্গে ধর্মরাজ যমের কথোপকথনে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "যে সমস্ত মানুষ মহাপুরুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁদের অবশ্যই নিম্নলিখিত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হতে হয়—সত্য, শৌচ, দয়া, সহনশীলতা, ত্যাগ, সন্তোষ, সরলতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, মানসিক স্থিরতা, তপশ্চর্যা, সমদৃষ্টি, তিতিক্ষা, ক্ষান্তি, বিদ্যা, জ্ঞান, অনাসক্তি, ঐশ্বর্য, বীরত্ব, প্রভাব, বল, স্মৃতি, স্বতন্ত্রতা, কুশল, কান্তি, ধৈর্য, কোমলতা, দক্ষতা, নম্রতা, দৃঢ়তা, পূর্ণজ্ঞান, সর্ব কর্মে পারদর্শিতা, গাম্ভীর্য, স্থিরতা, আস্তিক্য, যশ, শ্রদ্ধাবান এবং নিরহঙ্কারী।" যে মানুষ মহাত্মা হওয়ার অভিলাষী, তাঁকে এই সব কয়টি গুণে গুণান্বিত হতে হবে, সুতরাং এর থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, এই সমস্ত গুণাবলী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে।

উপরোক্ত পঞ্চাশটি গুণ ছাড়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরও পাঁচটি অতিরিক্ত গুণ রয়েছে, যেগুলি আংশিকভাবে ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যেও রয়েছে—৫১) অপরিবর্তনশীল, ৫২) সর্বজ্ঞ, ৫৩) চিরনবীন, ৫৪) সৎ, চিৎ, আনন্দময় (নিত্য আনন্দময় রূপবিশিষ্ট), ৫৫) সব রকম যোগসিদ্ধির অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণের আরও পাঁচটি গুণ আছে, যা নারায়ণ বিগ্রহে প্রকাশিত হয়—৫৬) অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, ৫৭) তাঁর দেহ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, ৫৮) তিনি সমস্ত অবতারের আদি উৎস, ৫৯) তাঁর দ্বারা হত শত্রুদের তিনি মুক্তিদান করেন, ৬০) মুক্ত আত্মাদের তিনি আকর্ষণ করেন। এই সমস্ত দিব্য গুণাবলী অদ্ভুতভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

এই ৬০টি দিব্যগুণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও চারটি গুণ রয়েছে, যা স্বর্গের দেবতাদের কি কথা, ভগবানের নারায়ণ রূপেও প্রকাশিত হয় না। সেগুলি হচ্ছে—৬১) তিনি নানারকম অদ্ভুত লীলাবিলাস করেন, বিশেষ করে তাঁর বাল্যলীলা; ৬২) তিনি অপূর্ব ভগবৎ-প্রেমমণ্ডিত ভক্ত পরিবৃত; ৬৩) তিনি তাঁর বাঁশি বাজিয়ে জগতের সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করতে পারেন; ৬৪) তিনি অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত।

পূর্বোক্ত গুণাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই চারটি অসাধারণ গুণ যোগ করলে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ৬৪টি গুণ দেখা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী পরমেশ্বর ভগবানের এই সমস্ত গুণগুলির সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন।

## ১) সুন্দর অঙ্গ

ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে প্রাকৃত বস্তুর কোন তুলনা হয় না। যে সমস্ত সাধারণ মানুষ ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ বুঝতে অসমর্থ, তারা যাতে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে, সেই জন্য লৌকিক উপমা দেওয়া হয়। বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল চন্দ্রের মতো সুন্দর, তাঁর ঊরুদ্বয় হাতির শুঁড়ের মতো শক্তিশালী, তাঁর বাহুদ্বয় স্তম্ভের মতো দৃঢ়, তাঁর করদ্বয় পদ্মফুলের মতো বিকশিত, তাঁর বক্ষঃস্থল কপাটের মতো প্রশস্ত, তাঁর নিতম্ব নিবিড়, এবং তাঁর দেহের মধ্যভাগ সংকীর্ণ।

## ২) শুভ লক্ষণ

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়, যা অত্যন্ত মঙ্গলসূচক এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে সেগুলি পূর্ণরূপে বর্তমান। এই সম্বন্ধে নন্দ মহারাজের এক সখা কৃষ্ণের শরীরে প্রকাশিত শুভ লক্ষণগুলি সম্বন্ধে বলেন, "হে গোপরাজ নন্দ! তোমার এই শিশু-পুত্রটির দেহ বত্রিশটি শুভ লক্ষণযুক্ত! এই বালক যে কিভাবে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করল, তা ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।" সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন, যেমন শ্রীরামচন্দ্র। কখনও কখনও তিনি ব্রাহ্মণকুলেও জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নন্দ মহারাজ বৈশ্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্রত্ব বরণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈশ্যদের বৃত্তি হচ্ছে কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্য। তাই তাঁর সখাটি এই রকম একজন সর্ব সুলক্ষণযুক্ত শিশুকে বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে দেখে বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরীরে সমস্ত সুলক্ষণগুলি তাঁর পালক পিতা নন্দ মহারাজকে দেখিয়েছিলেন।

তিনি আরও বললেন, "এই শিশুটির দেহের সাতটি অঙ্গ রক্তিম—চক্ষু, করদ্বয়, পদদ্বয়, তালু, ঠোঁট, জিহ্বা ও নখ—এই সাতটি স্থান রক্তিম হলে মঙ্গলময় বলে বিচার করা হয়। তাঁর দেহের তিনটি অঙ্গ প্রশস্ত—তাঁর কোমর, ললাট, বক্ষ। তাঁর দেহের তিনটি অঙ্গ হ্রস্ব—গলা, ঊরুদ্বয় ও উপস্থ। তাঁর দেহের তিনটি অঙ্গ গভীর—তাঁর কণ্ঠস্বর, বুদ্ধি ও নাভি। তাঁর দেহের পাঁচটি অঙ্গ উন্নত—তাঁর নাক, বাহুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, কপাল ও জঙ্ঘা। তাঁর দেহের পাঁচটি অঙ্গ সূক্ষ্ম—তাঁর ত্বক, কেশ, লোম, দাঁত ও আঙ্গুলের অগ্রভাগ। এই সমস্ত লক্ষণের প্রকাশ কেবল মহাপুরুষদের শরীরেই দেখতে পাওয়া যায়।"

হাতে যশরেখাকেও একটি সুলক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়। এই সম্বন্ধে একজন বয়স্কা গোপী নন্দ মহারাজকে বলেন, "আপনার শিশু-পুত্রটির হাতে নানা রকম অদ্ভুত সমস্ত রেখা রয়েছে। তাঁর হাতে পদ্ম, চক্র আদি চিহ্ন রয়েছে, এবং তাঁর পায়ে ধ্বজ, বজ্র, মীন, অঙ্কুশ ও পদ্ম রয়েছে। দয়া করে আপনি এই মঙ্গলময় চিহ্নগুলি দর্শন করুন।"

## ৩) রুচির

যে সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবে চক্ষুকে আকর্ষণ করে, তাকে বলা হয় রুচির। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অতিশয় রুচির। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২/১৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে এসে উপস্থিত হলেন, তখন সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাপুরুষেরা তাঁকে দেখে অনুভব করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের এই শরীরটি তৈরি করতে গিয়ে বিধাতার সমস্ত কর্মকুশলতা শেষ হয়ে গেছে।"

কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের আটটি অঙ্গ—তাঁর মুখমণ্ডল, তাঁর চক্ষুদ্বয়, তাঁর হস্তদ্বয়, তাঁর নাভি, এবং তাঁর পদদ্বয় কমলের মতো। বৃন্দাবনের গোপিকারা সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে পদ্মফুলের মাধুর্য দর্শন করতেন, এবং তাঁরা সেই দৃশ্য থেকে তাঁদের চোখ ফেরাতে পারতেন না।

## ৪) জ্যোতির্ময়

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত জ্যোতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই কিরণরাশি। শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম সর্বদা ব্রহ্মজ্যোতি বিকিরণ করে, এবং সেই জ্যোতি হচ্ছে তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা।

ভগবানের বক্ষঃস্থলে বিরাজমান কৌস্তুভ মণির প্রভা সূর্যের দীপ্তিকেও তিরস্কার করে, আর সেই কৌস্তুভ মণি ভগবানের অঙ্গকান্তির কাছে আকাশের

তারার মতো মন্দ মন্দ স্ফুরিত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রভাব এতই মহান যে, তা সকলকেই পরাভূত করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর শত্রু কংসের যজ্ঞস্থলে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত মল্লরা কোমল অঙ্গবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছিল।

## ৫) বলীয়ান

অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষকে বলীয়ান বলা হয়। অরিষ্টাসুরকে শ্রীকৃষ্ণ যখন বধ করেন, তখন কয়েকজন গোপী পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করতে থাকেন, "হে সখী! দেখ, কৃষ্ণ কিভাবে অরিষ্টাসুরকে বধ করল! যদিও সেই অসুরটি ছিল পর্বতের চেয়েও শক্তিশালী, কৃষ্ণ তাকে এক টুকরো তুলোর মতো তুলে নিয়ে অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দিল!" অন্য আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, "হে কৃষ্ণভক্তগণ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্ত, যা একটি গোলকের মতো অনায়াসে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে ধরেছিল, সেই বাম হস্ত তোমাদের সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা করুক।"

## ৬) নিত্য কিশোর

শ্রীকৃষ্ণ শৈশব, কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর আদি সমস্ত বয়সেই অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু এই সমস্ত বয়সের মধ্যে কৈশোর হচ্ছে অখিল রসের আধার, এবং এই বয়সে তিনি সর্বোত্তম ভক্তিযুক্ত সেবা গ্রহণ করেন। এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণ সব কয়টি দিব্য গুণাবলীর দ্বারা বিভূষিত এবং দিব্য লীলাবিলাস পরায়ণ। তাই ভক্তরা মনে করে যে, কৈশোর হচ্ছে প্রেমভক্তির সব চাইতে আকর্ষণীয় অবস্থা।

শ্রীকৃষ্ণের এই বয়সের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের তেজ তাঁর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হাসির সঙ্গে যুক্ত, যা পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্যকে পর্যন্ত পরাভূত করেছে। তিনি সব সময় সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত এবং তাঁর কন্দর্প-বিনিন্দিত রূপ নিরন্তর তাঁর প্রেমামৃত পানে মত্ত গোপিকাদের চিত্ত হরণ করে।

## ৭) অদ্ভুত ভাষাবিৎ

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, যে মানুষ বিভিন্ন দেশের ভাষা, বিশেষ করে দেবভাষা সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রাকৃত ভাষা, এমন কি পশুদের ভাষাও জানেন, তাঁকে বলা হয় অদ্ভুত ভাষাবিৎ। এই বর্ণনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পশুদের ভাষাও বলতে পারেন এবং বুঝতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস দেখে বৃন্দাবনের এক বৃদ্ধা গোপী বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেন, "কী আশ্চর্য! সমস্ত

ব্রজবালাদের হৃদয়বল্লভ কৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সঙ্গে মধুরভাবে ব্রজভাষা বলে, স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় বার্তালাপ করে, আর গরু, মহিষাদি পশুদের সঙ্গে পশুর ভাষায় কথা বলে! তেমনই সে কাশ্মীর প্রদেশের ভাষায় এবং শুক আদি পক্ষীদের ভাষায়ও কথা বলতে পারে, কৃষ্ণ কি অদ্ভুত ভাষাবিৎ!" তিনি গোপীদের জিজ্ঞাসা করেন, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে কৃষ্ণ কিভাবে পারদর্শী হলেন!

## ৮) সত্যবাক্

যে পুরুষের বাক্য কখনও ব্যর্থ হয় না, তাঁকে বলা হয় সত্যবাক্। শ্রীকৃষ্ণ এক সময় পাণ্ডবদের মাতা কুন্তীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর পাঁচ ছেলেকেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন থেকে ফিরিয়ে আনবেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন সমস্ত পাণ্ডবরা ঘরে ফিরে এলেন, কুন্তী তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করে বলেন, "একদিন সূর্য শীতল হয়ে যেতে পারে এবং চন্দ্রকিরণ উষ্ণ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তবুও হে মুরারে, তোমার বাক্য কখনও অসত্য হতে পারে না।" তেমনই, ভীম ও অর্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ যখন জরাসন্ধকে যুদ্ধে আহ্বান করবার জন্য গিয়েছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে জরাসন্ধকে বলেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন নিত্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ছদ্মবেশে দুই পাণ্ডবের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা—এখানে ভীম ও অর্জুন ছিলেন—ক্ষত্রিয়। জরাসন্ধও ছিল ক্ষত্রিয় এবং সে ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে দান করত। তাই জরাসন্ধকে বধ করার পরিকল্পনা করে শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বেশে সেখানে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত দানশীল জরাসন্ধ তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিল, তাঁরা কি চান। তখন তাঁরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সেই সময় কৃষ্ণ ঘোষণা করেন যে, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তিনি হচ্ছেন তার চিরশত্রু কৃষ্ণ।

## ৯) প্রিয়ভাষী

যিনি তাঁর শত্রুকে পর্যন্ত প্রিয় বাক্যের দ্বারা শান্ত করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় প্রিয়ভাষী। শ্রীকৃষ্ণ এত প্রিয়ভাষী ছিলেন যে, তাঁর শত্রু কালীয়কে যমুনার জলে পরাভূত করবার পর তিনি তাকে বলেন, "হে নাগরাজ! যদিও আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, দয়া করে আমার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হয়ো না। আমার কর্তব্য হচ্ছে দেবতাদের আরাধ্য এই সমস্ত গাভীদের রক্ষা করা। তোমার ভয়ঙ্কর উপস্থিতির বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য আমি এখান থেকে তোমাকে নির্বাসন দিতে বাধ্য হয়েছি।"

যমুনার জলে কালীয় বাস করছিল, এবং তার ফলে যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে যায়। তখন যে সমস্ত গাভী সেই যমুনার জল পান করেছিল, তাদের মৃত্যু হয়। তাই, কৃষ্ণের যদিও তখন বয়স ছিল চার অথবা পাঁচ বছর, তবু সেই জলে ঝাঁপ দিয়ে তিনি কঠোরভাবে কালীয়কে দণ্ডদান করেছিলেন এবং সেই স্থান পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যেতে তাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, গাভীরা হচ্ছে দেবতাদের আরাধ্য, এবং তিনি নিজেই দেখিয়ে গেলেন কিভাবে গাভীদের রক্ষা করতে হয়। অন্ততপক্ষে, যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছেন, তাঁদের উচিত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বতোভাবে গাভীদের রক্ষা করা। গাভীরা কেবল দেবতাদেরই আরাধ্য নয়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেও অনেক সময় গোপূজা করেছিলেন, বিশেষ করে গোপাষ্টমী ও গোবর্ধন পূজা উপলক্ষ্যে।

## ১০) বাবদূক

যে পুরুষ বিনয় সহকারে এবং সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত হয়ে অর্থবহ বাক্যালাপ করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় বাবদূক। শ্রীকৃষ্ণের বিনীত বচন সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিনীতভাবে তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করেন, তখন তাঁর সেই কথা শুনে একজন গোপবধূ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পরে তিনি তাঁর সখীদের কাছে তার বর্ণনা করে বলেন, "এত বিনীত ও নম্রভাবে কৃষ্ণ তার পিতার সঙ্গে কথা বলছিল যে, তখন মনে হচ্ছিল, সে যেন উপস্থিত সকলের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করছে। কৃষ্ণের সেই মধুর বচন শুনে কে তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে?"

শ্রীকৃষ্ণের বাণী জগতের সমস্ত বাক্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত, এবং তার বর্ণনা করে উদ্ধব বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের বাণী এত মনোমুগ্ধকর যে, তাঁর শত্রুর হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে। যদিও তিনি বেশি কথা বলেন না, কিন্তু তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দই গভীর অর্থবহ। শ্রীকৃষ্ণের বাণী আমার হৃদয়ের অতিশয় প্রিয়।"

## ১১) সুপণ্ডিত

বিদ্বান ও নীতিজ্ঞ পুরুষকে সুপণ্ডিত বলা হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে তিনি যথোচিত কার্য করেন, তাই তাঁকে বলা হয় নীতিজ্ঞ। এই দুটি গুণের সমন্বয়কে বলা হয় সুপাণ্ডিত্য।

সান্দীপনি মুনির থেকে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ করার বর্ণনা করে নারদ মুনি বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মহাসাগরের মতো এবং ব্রহ্মা ও অন্য সমস্ত মহান দেবতারা হচ্ছেন সেই সমুদ্রের জলকণা থেকে উদ্ভূত মেঘের মতো। অর্থাৎ, মেঘ যেভাবে সমুদ্রের জল আহরণ করে, ঠিক সেইভাবে ব্রহ্মা প্রথমে বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে। ব্রহ্মার দ্বারা প্রবর্তিত সেই বৈদিক জ্ঞান পুনরায় সান্দীপনি মুনিরূপী শৈলশিখরে সঞ্চিত হয়। সান্দীপনি মুনির শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দেওয়া, বর্ষার জলের নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ মহাসাগরে পতিত হওয়ার মতো।" অর্থাৎ সমুদ্র অন্য কোথাও থেকে জল গ্রহণ করতে পারে না, তার নিজেরই জল তার নিজের কাছে ফিরে আসে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণকে কেউই শিক্ষাদান করতে পারেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নদীগুলি যেন সমুদ্রে জল ঢালছে। সুতরাং এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ব্রহ্মা শিক্ষালাভ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে, এবং ব্রহ্মার থেকে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে এই বৈদিক জ্ঞান প্রবাহিত হচ্ছে। সান্দীপনি মুনিকে পর্বত-শিখর থেকে প্রবাহিত নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যিনি সেই জ্ঞানরূপ জল আবার শ্রীকৃষ্ণরূপী সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছেন।

সিদ্ধলোকের অধিবাসী সিদ্ধরা (যেখানে সকলেই পূর্ণ যোগসিদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন) এবং চারণলোকের অধিবাসী চারণেরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে বলেন, "হে গোবিন্দ! বিদ্যাদেবী সরস্বতী চৌদ্দটি গুণের দ্বারা অলঙ্কৃতা, তাঁর বুদ্ধি চার *বেদের* মাধ্যমে সর্বব্যাপ্ত, তাঁর চিত্ত সর্বদাই মনু আদি মহর্ষি প্রণীত সংহিতায় নিবদ্ধ। তিনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তি, ছন্দ ও জ্যোতিষ—*বেদের* এই ছয়টি অঙ্গরূপ পরিধানে বিভূষিতা। *বেদের* পরিশিষ্ট *পুরাণ* তাঁর নিত্য সহচর, এবং তিনি জ্ঞানের চরম মীমাংসার দ্বারা বিভূষিতা। এখন তিনি গুরুকুলে সহপাঠীরূপে আপনার সঙ্গে একত্রে উপবেশন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, এবং এখন তিনি আপনার সেবায় যুক্ত হয়েছেন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যা অর্জন করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে তাঁর সেবা করার সুযোগ দান করেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে পূর্ণকাম, যদিও তাঁর অসংখ্য ভক্ত রয়েছে, তবুও কোন জীবের সেবায় তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও কৃপাময়, তাই তিনি সকলকেই তাঁকে সেবা করার সুযোগ দেন, যদিও সেই সেবায় তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

তাঁর নীতিজ্ঞতা সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, "তস্করদের কাছে মৃত্যুর মতো, পুণ্যাত্মা পুরুষদের কাছে আনন্দদায়ী বসন্ত বায়ুর মতো, রমণীদের

কাছে পরম মনোহর কামদেবের মতো, বন্ধুবান্ধবদের কাছে আনন্দ-প্রদানকারী পূর্ণচন্দ্রের মতো, দীনজনের কল্যাণের জন্য কল্পবৃক্ষের মতো, শত্রুদের কাছে দেবাদিদেব মহাদেবের মুখনিঃসৃত কালাগ্নির মতো ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরী শাসন করতেন।" সুতরাং নানা রকম মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ নীতিজ্ঞ ছিলেন। তস্করদের কাছে তিনি ছিলেন মৃত্যুর মতো, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি নীতি রহিত অথবা নির্দয় ছিলেন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই কৃপাময়, কারণ তস্করদের মৃত্যুদণ্ড দান করা সর্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত এবং তার ফলে তাদের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*। অর্থাৎ, যে তাঁর প্রতি যে রকম ব্যবহার করে, শ্রীকৃষ্ণও তার প্রতি তেমন ব্যবহার করেন। তাঁর ব্যবহার ভক্ত ও অভক্তদের প্রতি ভিন্ন ভিন্নভাবে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা সর্ব মঙ্গলময়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মঙ্গলের আধার, তাই সকলের সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার পূর্ণ মঙ্গলময়।

## ১২) বুদ্ধিমান

তীক্ষ্ণ স্মৃতি ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বুদ্ধিমান বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, অবন্তীপুরে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে অধ্যয়ন করার সময়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে একবার যা শুনতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতেন। প্রকৃতপক্ষে, সান্দীপনি মুনির গুরুকুলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি জগতের সামনে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, মানুষ যতই মহান অথবা দক্ষ হোন না কেন, বিদ্যা অর্জনের জন্য তাঁকে অবশ্যই শিক্ষক অথবা গুরুদেবের শরণাগত হতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণের সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়, যখন তিনি মথুরাপুরী আক্রমণকারী ম্লেচ্ছরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষত্রিয় রাজাদের ম্লেচ্ছদের স্পর্শ করা উচিত নয়, এমন কি তাদের হত্যা করার সময়েও নয়। তাই ম্লেচ্ছরাজ যখন মথুরা অবরোধ করল, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাকে হত্যা করা সমীচীন হবে না বলে বিবেচনা করলেন। কিন্তু তবুও তাকে হত্যা করা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন, যাতে ম্লেচ্ছরাজ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এইভাবে তিনি ম্লেচ্ছরাজকে একটি পর্বত-গহ্বরে নিয়ে গেলেন, যেখানে মুচুকুন্দ নিদ্রামগ্ন ছিল। মুচুকুন্দ কার্তিকের কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত হয়েছিল যে, ঘুম থেকে ওঠার পর যার দিকে তাকাবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন

ম্লেচ্ছরাজকে সেই গুহায় নিয়ে যেতে, যাতে তার উপস্থিতিতে মুচুকুন্দের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তার দৃষ্টিপাতের ফলে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

## ১৩) প্রতিভাশালী

যিনি নতুন নতুন যুক্তি দিয়ে তর্কে বিপক্ষকে পরাভূত করতে অত্যন্ত পারদর্শী, তাঁকে প্রতিভাশালী বলা হয়। এই সম্পর্কে *পদ্যাবলীতে* রাধা ও কৃষ্ণের একটি বার্তালাপ উল্লেখযোগ্য। একদিন সকালবেলা শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে এলেন, রাধারাণী তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কেশব! তোমার 'বাস' কোথায়?" সংস্কৃত শব্দে *বাস*-এর তিনটি অর্থ হয়—একটি অর্থ হচ্ছে নিবাস, অপরটি হচ্ছে সুগন্ধ, এবং আর একটি অর্থ হচ্ছে বস্ত্র।

প্রকৃতপক্ষে রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার পরিধানের বস্ত্র কোথায়?" কিন্তু সেই বাস-এর অর্থ নিবাস করে শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে উত্তর দিলেন "হে প্রিয়ে, এখন তোমার মনোমুগ্ধকর নেত্র যুগলে বাস করছি।"

এর উত্তরে রাধারাণী বলেছিলেন, "হে চতুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিবাস কোথায় তা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার 'বাস' (বসন) কোথায়।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বাস-এর অর্থ সুগন্ধ করে বললেন, "হে সুভগে! তোমার সঙ্গের সংসর্গে আমি এই বাস (সুবাস) প্রাপ্ত হয়েছি।"

শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ধূর্ত! তুমি কোথায় রাত্রিযাপন করেছ?" এই কথাটির সংস্কৃত হচ্ছে *যামিন্যামুষিতঃ*। *যামিন্যাম্* মানে হচ্ছে 'রাত্রিবেলায়', এবং *উষিতঃ* মানে হচ্ছে 'যাপন করা'। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেই শব্দটিকে ভিন্নভাবে বিভক্ত করলেন, যথা *যামিন্যা* ও *মুষিতঃ।* এই দুটি ভাগে ভাগ করার ফলে তার অর্থ দাঁড়াল, তিনি যামিনী বা রাত্রির দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন। তাই রাধারাণীর প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বলেছিলেন, "হে রাধিকে! রাত্রি কি আমাকে অপহরণ করতে পারে?" এইভাবে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি তাঁর প্রিয়তমা গোপিকাকে আনন্দ দান করতেন।

## ১৪) বিদগ্ধ

যিনি অতিশয় কুশলতার সঙ্গে কলাবিলাস করতে পারেন এবং সাজসজ্জা করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় বিদগ্ধ। এই বিশেষ গুণটি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখা যায়। শ্রীমতী রাধারাণী এক সময় তাঁর এক সখীকে বলেন, "হে সখী, দেখ, কৃষ্ণ কী সুন্দর সঙ্গীত রচনা করে, কী সুন্দরভাবে সে নাচে, সুন্দর সুন্দর কথা বলে

এবং সুন্দর মাল্য ভূষিত হয়ে বাঁশি বাজায়। সে এত সুন্দরভাবে সেজেছে যে, মনে হচ্ছে সে যেন সমস্ত শতরঞ্জ খেলোয়াড়দের পরাজিত করেছে। এইভাবে সর্বোচ্চ কলাবিলাস করে সে অদ্ভুতভাবে বিরাজ করছে।"

## ১৫) চতুর

যিনি একসঙ্গে অনেক কাজ করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় চতুর। একজন গোপী বললেন, "হে সখিগণ! কৃষ্ণের কার্যকলাপ দেখ! গোপবালকদের নিয়ে নানা রকম সঙ্গীত রচনা করে সে গোপদের ও গাভীদের আনন্দ দান করছে, তাঁর নেত্র সঞ্চালন করে সে গোপীদের আনন্দ দান করছে, আর সেই সঙ্গে অরিষ্ট আদি অসুরদের সঙ্গে লড়াই করছে। এইভাবে বিভিন্ন জীবের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আচরণ করে, সে সর্ব অবস্থাতেই আনন্দ উপভোগ করছে।"

## ১৬) সুদক্ষ

কঠিন কার্যকেও যিনি সরলতার সঙ্গে অচিরে সম্পাদন করেন, তাঁকে বলা হয় দক্ষ। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষতা সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যোদ্ধাদের নানান অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিলেন।" প্রাচীনকালে যখন ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ হত, তখন এক পক্ষ বাণ ছুঁড়ত এবং অপর পক্ষ অন্য বাণ দিয়ে সেগুলি প্রতিহত করে তাকে পরাস্ত করত। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, এক পক্ষ যদি আকাশ থেকে জল বর্ষণ করার জন্য বরুণ বাণ ছুঁড়ত, তখন অন্য পক্ষ এমন অস্ত্র নিক্ষেপ করত, যার ফলে সেই জল তৎক্ষণাৎ মেঘে পরিণত হয়ে যেত। অতএব উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ শত্রুদের সমস্ত বাণ প্রতিহত করতে অত্যন্ত দক্ষ। তেমনই, রাসলীলায় যখন প্রত্যেক গোপীই তাঁকে তাঁদের সঙ্গে নৃত্য করবার জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যতজন গোপিকা ছিলেন ততটি রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। তার ফলে প্রতিটি গোপিকাই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পাশে পেয়েছিলেন।

## ১৭) কৃতজ্ঞ

যিনি তাঁর বন্ধুর উপকারের কথা মনে রাখেন এবং কখনই তাঁর সেই সেবার কথা ভুলে যান না, তাঁকে বলা হয় কৃতজ্ঞ। *মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন, "আমি যখন দ্রৌপদীর থেকে দূরে ছিলাম, তখন সে 'হে গোবিন্দ!' বলে আমাকে ডাকে। তার সেই ডাকের ফলে আমি তার কাছে ঋণী হয়ে আছি, এবং সেই ঋণ

আমার হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে!" শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, কেউ যদি কেবল 'হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ!' বলে তাঁকে ডাকে, তা হলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি প্রসন্ন হন।

'মহামন্ত্র' *(হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।)* উচ্চারণ করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শক্তিকে সম্বোধন করা হয়। সুতরাং যিনি নিরন্তর ভগবান ও তাঁর শক্তিকে ডাকছেন, আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞ। এই ধরনের ভক্তকে ভুলে যাওয়া ভগবানের পক্ষে অসম্ভব। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেউ যখন ভগবানকে ডাকেন, তৎক্ষণাৎ তিনি ভগবানের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, এবং ভগবানও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃতজ্ঞতার আর একটি উদাহরণ হচ্ছে জাম্ববানের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার। ভগবান যখন, শ্রীরামচন্দ্ররূপে লীলাবিলাস করছিলেন, তখন বানরদের মহান নায়ক জাম্ববান অতি বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করেন। ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করে তাঁর প্রতি গুরুতুল্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। যে কোনও সৎ মানুষ তাঁর প্রতি তাঁর বন্ধুর কথা কখনও ভোলেন না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সাধুদের উপকারের মুকুটমণি, তাই তিনি তাঁর সেবকের সেবার কথা কিভাবে ভুলতে পারেন?

## ১৮) দৃঢ়ব্রত

যিনি সমস্ত নিয়ম পালন করেন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন, তাঁকে বলা হয় দৃঢ়ব্রত। ভগবানের দৃঢ়ব্রত সম্বন্ধে *হরিবংশে* একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক সময় শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা নন্দনকাননের পারিজাত ফুল চান, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তা এনে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত ফুল দিতে অস্বীকার করেন। তার ফলে পাণ্ডবসহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্বর্গের দেবতাদের এক মহাযুদ্ধ হয়। অবশেষে তাদের সকলকে পরাভূত করে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত ফুল নিয়ে এসে তাঁর মহিষী সত্যভামাকে দেন। সেই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে বলেন, "হে দেবর্ষি নারদ! তুমি ভক্ত ও অভক্ত নির্বিশেষে সকলের কাছে ঘোষণা কর যে, দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, যক্ষ ও পন্নগেরা আমাকে পরাস্ত করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার মহিষীর কাছে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে তারা সক্ষম হয়নি।"

*ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না। সুতরাং যে সমস্ত যথার্থ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের দৃঢ়

বিশ্বাস থাকা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না। যাই হোক না কেন, তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করবেন।

সত্যভামাকে পারিজাত উপহার দিয়ে, দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করে এবং অর্জুনকে সমস্ত শত্রু থেকে রক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ।

গোবর্ধন-লীলায় পরাস্ত হওয়ার পর ইন্দ্র ভগবানের এই প্রতিজ্ঞার সত্যতা স্বীকার করে বলেছিলেন যে, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না। যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের ইন্দ্র উপাসনা করতে নিষেধ করেন, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করে বৃন্দাবনকে প্লাবিত করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছাতার মতো তুলে ধরে সমস্ত ব্রজবাসী ও ব্রজের পশুদের রক্ষা করেন। এই ঘটনার পর ইন্দ্র তাঁর শরণাগত হয়ে নানাভাবে তাঁর স্তুতি করতে থাকেন। তিনি বলেন, "গোবর্ধন পর্বত ধারণপূর্বক ব্রজবাসীদের রক্ষা করে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন যে, আপনার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।"

## ১৯) দেশ-কাল-পাত্রের সুবিচারক

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। দেশ, কাল ও পাত্রের কিভাবে তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন, তা গোপিকাদের সঙ্গে রাসলীলা সম্বন্ধে উদ্ধবের সঙ্গে আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "হে সখে! সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে শারদীয়া পূর্ণিমার রাত্রি, এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে বৃন্দাবন, এবং সব চাইতে সুন্দরী রমণী হচ্ছে গোপিকারা। সুতরাং হে সখে উদ্ধব! আমার মনে হয় যে, এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমার রাসনৃত্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।"

## ২০) শাস্ত্রচক্ষু

যিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কার্য করেন, তাঁকে বলা হয় 'শাস্ত্রচক্ষু'। 'শাস্ত্রচক্ষু' কথাটির অর্থ হচ্ছে, যিনি প্রামাণিক শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু দর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষের যথার্থ জ্ঞান আছে এবং অভিজ্ঞতা আছে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে সব কিছু দর্শন করা। যেমন, আমাদের জড় চক্ষু দিয়ে দর্শন করলে সূর্যমণ্ডলকে কেবল একটি ছোট দেদীপ্যমান পিণ্ড বলে মনে হয়, কিন্তু যখন আমরা বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের মাধ্যমে দর্শন করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, সূর্য এই পৃথিবীর থেকে কত বড় এবং কী অসীম শক্তিশালী। সুতরাং জড় চক্ষু দিয়ে যে দর্শন, তা যথার্থ দর্শন নয়। প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে অথবা সদ্গুরুর শিক্ষার মাধ্যমে যে দর্শন হয়, সেটিই হচ্ছে যথার্থ দর্শন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যদিও

পরমেশ্বর ভগবান এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, তবুও জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সর্বদাই শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করতেন। যেমন, পরম পুরুষোত্তম রূপে যদিও শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতা* অর্জুনকে শোনাচ্ছিলেন, তবুও তিনি *বেদান্ত-সূত্রের* থেকে প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* একটি বর্ণনা রয়েছে, যেখানে একজন পরিহাসছলে বলেছেন যে, কংসারি শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রচক্ষু বলে পরিচিত। কিন্তু এখন তাঁর কর্তৃত্ব প্রদর্শন করার জন্য তিনি গোপিকাদের দর্শন করছেন, যার ফলে সেই গোপিকারা উন্মাদিনীর মতো হয়ে গেছেন।

## ২১) শুচি

পরম শুচিতা দুই প্রকারের। একটি হচ্ছে পাপীর পাপ নাশ করতে সমর্থ হওয়া, এবং অপরটি হচ্ছে কোন রকম অশৌচ কর্ম না করা। যার মধ্যে এই দুটি গুণের একটি রয়েছে, তাকে বলা হয় পরম পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই দুটি গুণই রয়েছে। তিনি সমস্ত পাপাত্মা বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করতে পারেন, সেই সঙ্গে তিনি নিজে কখনও পাপকর্মে লিপ্ত হন না।

এই সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রকে পরিবারের আসক্তি থেকে মুক্ত করার জন্য বিদুর বলছেন, "হে ভ্রাতঃ! ঋষি-মুনিরা উত্তম শ্লোকের দ্বারা যাঁর আরাধনা করেন, সমস্ত পাবকদের মধ্যে যিনি হচ্ছেন পরম পাবক, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের প্রতি আপনার চিত্তকে একাগ্র করুন। নিঃসন্দেহে শিব, ব্রহ্মা এঁরা হচ্ছেন মহান দেবতা, কিন্তু ত্রাণকর্তারূপে তাঁদের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর।" এইভাবে বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় তাঁর চিত্তকে নিবদ্ধ করতে। কেউ যদি কেবল ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তা হলে সেই নামরূপী দেদীপ্যমান সূর্য তাঁর হৃদয়ে উদিত হয়ে তৎক্ষণাৎ পাপরূপ সমস্ত অন্ধকার দূর করবে। তাই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্তা করার কথা বলেছিলেন, যার ফলে পর্বতপ্রমাণ পাপ অচিরেই ভস্ম হয়ে যেতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে 'পরম পবিত্র' বলে সম্বোধন করেছিলেন — *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং।* শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রতার এই রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে।

## ২২) বশী বা আত্মসংযত

যিনি সর্বতোভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় বশী বা আত্মসংযত। এই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষীর প্রত্যেকেই এত রূপসী ছিলেন এবং তাঁদের উদ্যম ভাব, মনোহর

হাস্য ও লজ্জা দেবাদিদেব মহাদেব আদি দেবতাদেরও মোহিত করতে পারত। কিন্তু তবুও তাঁদের কমনীয় হাবভাব শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে একটুও বিচলিত করতে পারে না।" শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষীদের প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রমণীয় রূপে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু আসলে তা সত্য নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয়, এবং সেই জন্য *ভগবদ্গীতায়* তাঁকে হৃষীকেশ অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

## ২৩) স্থির

যিনি অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিরন্তর কার্যে নিয়োজিত থাকেন, তাঁকে বলা হয় স্থির।

জাম্ববানের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি নেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়। জাম্ববান গভীর অরণ্যে লুকোবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতে হতোদ্যম না হয়ে গভীর অরণ্যে তাঁকে খুঁজে বার করে, তাঁর থেকে বলপূর্বক সেই মণি সংগ্রহ করেন, এই ঘটনাটি শ্রীকৃষ্ণের স্থিরতার একটি দৃষ্টান্ত।

## ২৪) দান্ত

যিনি কার্যসিদ্ধির জন্য সব রকম কষ্ট সহ্য করেন, তা যতই দুঃসহ হোক না কেন, তাকে বলা হয় দান্ত।

কৃষ্ণ যখন গুরুকুলে ছিলেন, তাঁর শরীর যদিও ছিল অত্যন্ত কোমল ও কমনীয়, তবুও গুরুসেবার জন্য সব রকম ক্লেশ স্বীকার করতে তাঁর উৎসাহে কখনও ভাঁটা পড়েনি। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে নানা রকম অসুবিধা সত্ত্বেও, গুরুদেবের সব রকম সেবা করা। গুরুকুলে অবস্থান কালে শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে ভিক্ষালব্ধ সব কিছু গুরুদেবকে সমর্পণ করা। প্রসাদ গ্রহণের সময় গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের একে একে আহ্বান করেন। যদি কোন কারণে গুরুদেব প্রসাদ গ্রহণ করতে কোন শিষ্যকে ডাকতে ভুলে যান, শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হলে শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে নিজে নিজে ভোজন না করে বরং সেই দিন উপবাসী থাকা। এই রকম বহু বিধান রয়েছে। কৃষ্ণ কখনও কখনও গুরুদেবের জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করার জন্য বনেও যেতেন।

## ২৫) ক্ষমাশীল

যিনি তাঁর বিরোধীরও সমস্ত অপরাধ সহ্য করেন, তাঁকে ক্ষমাশীল বলা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাশীলতার বর্ণনা *মহাভারতে* রয়েছে—

তাঁর চরণে শিশুপাল যদিও একের পর এক গর্হিত অপরাধ করেছে, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাকে বারবার ক্ষমা করেছেন। শিশুপাল ছিল চেদি নামক প্রদেশের রাজা, এবং যদিও সে ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাসতুতো ভাই, সে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও সে তাই করেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষাপূর্বক তাঁর সেই অপমানের কোন উত্তর দেননি। সেখানে উপস্থিত কিছু রথী-মহারথী শিশুপালকে বধ করতে উদ্যত হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নিরস্ত করেন। তিনি ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমাশীল। কথিত আছে, সিংহ মেঘের গর্জন শুনে হুঙ্কার করে—মূর্খ শৃগালের ডাক শুনে নয়।

শ্রীযামুনাচার্য শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাশীলতার বর্ণনা করে বলেছেন—"হে রঘুবর! জানকীর স্তনে নখ দিয়ে আঘাত করেছিল যে কাক, তাকে আপনি শরণাগত বলে মনে করে ক্ষমা করেছিলেন।" এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র কাকরূপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী জানকীর স্তনে আঘাত করেন। এটি অবশ্যই জগন্মাতা সীতাদেবীর চরণে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। তাই রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই কাকটিকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু যেহেতু সেই কাকটি তখন তাঁর চরণে প্রণতিপূর্বক শরণাগত হয়, তাই শ্রীরামচন্দ্র তাকে ক্ষমা করে দেন। শ্রীযামুনাচার্য তাঁর বন্দনায় বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাশীলতা রামচন্দ্রের থেকেও মহান, কেন না শিশুপাল সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করত—কেবল এক জন্মেই নয়, পর পর তিন জন্ম ধরে। কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, তিনি শিশুপালকে সাযুজ্য মুক্তি দান করেছিলেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা অদ্বৈতবাদীরা করেন, তা লাভ করা খুব একটা কঠিন নয়। শিশুপালের মতো যারা কৃষ্ণবিদ্বেষী, তারাও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সেই মুক্তি লাভ করে।

## ২৬) গম্ভীর

যে ব্যক্তি তাঁর মনোভাব সকলের কাছে প্রকাশ করেন না অথবা যাঁর মনের কথা ও পরিকল্পনা বোঝা অত্যন্ত কঠিন, তাঁকে বলা হয় গম্ভীর। ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ করেন, তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ব্রহ্মা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর স্তব করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সেই স্তবে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েছেন, না তখনও অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন, তা ব্রহ্মা বুঝতে পারেননি। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ এত গম্ভীর ছিলেন যে, তিনি খুব একটা আন্তরিকভাবে ব্রহ্মার প্রার্থনা গ্রহণ করেননি। শ্রীকৃষ্ণের গাম্ভীর্যের আর একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়—রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর প্রেমময় সম্পর্কের বিষয়ে। শ্রীকৃষ্ণ এত নীরব

থাকতেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁর নিত্যসহচর বলরাম পর্যন্ত তাঁর মনোভাব বুঝতে পারতেন না।

## ২৭) আত্মতৃপ্ত

যে ব্যক্তি আপনা থেকেই সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত, যাঁর কোন রকম আকাঙ্ক্ষা নেই এবং যিনি ক্ষোভের গভীর কারণ থাকা সত্ত্বেও অবিচলিত থাকেন, তাঁকে বলা হয় আত্মতৃপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের আত্মতৃপ্তির এক সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে—যখন তিনি, ভীম ও অর্জুন দুর্দান্ত মগধরাজ জরাসন্ধকে যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করার জন্য তার নিকট গিয়েছিলেন, তখন জরাসন্ধকে হত্যা করার সমস্ত কৃতিত্ব তিনি ভীমকে দান করেন। এই থেকে আমরা দেখতে পাই, যদিও শ্রীকৃষ্ণের থেকে যশস্বী অন্য আর কেউ নয়, তবুও তিনি তাঁর নাম-যশের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও অবিচলিত থাকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যখন শিশুপাল তাঁর উদ্দেশ্যে নানা রকম অপশব্দ ব্যবহার করতে থাকে, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা মানসে তাঁর স্তব করতে শুরু করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আচরণে কোন রকম ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়নি।

## ২৮) সমতা

যিনি রাগ, দ্বেষ থেকে মুক্ত, তাঁকে বলা হয় সম।

শ্রীকৃষ্ণের সমতার উদাহরণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৬/৩৩) কালীয়দমন লীলায় পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়কে কঠোরভাবে দণ্ডদান করছিলেন, যখন কালীয়র পত্নীরা ভগবানের কাছে এসে মিনতি করতে থাকে, "হে নাথ! আমাদের এই পাপাত্মা পতি কালীয়কে আপনি যে দণ্ডদান করেছেন, তা সর্বতোভাবে উপযুক্ত হয়েছে, কারণ সব রকম আসুরিক জীবদের নিগ্রহ করবার জন্য আপনি অবতরণ করেছেন। আমরা জানি যে, আপনি আপনার শত্রু ও আপনার পুত্র উভয়কেই সমভাবে দর্শন করেন। আমরা জানি যে, এই অধঃপতিত জীবটির মঙ্গলের জন্যই আপনি তাকে দণ্ডদান করেছেন।"

অন্য আর একটি স্তবে বলা হয়েছে, "হে কৃষ্ণ! হে যদুবর! আপনি এতই সমদ্রষ্টা যে, শত্রু যদি যোগ্য হয়, তা হলে আপনি তাকেও সম্মান করেন এবং পুত্র যদি দুষ্ট হয়, তা হলে আপনি তাকে দণ্ডদান করেন। এমনই মহান আপনার কার্যকলাপ, কেন না আপনিই হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম রচয়িতা। আপনি সব

রকম পক্ষপাত রহিত। যদি কেউ আপনার চরিত্রে কোন পক্ষপাত দর্শন করে থাকে, তা হলে তা কেবল ভ্রমমাত্র।”

## ২৯) বদান্য

যে ব্যক্তি অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে দান করেন, তাঁকে বলা হয় বদান্য।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় রাজত্ব করছিলেন, তখন তাঁর উদারতা ও দানশীলতার কোন অবধি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, দ্বারকায় তাঁর উদারতা এতই মহান ছিল যে, চিন্তামণি, সুরভী ও কল্পবৃক্ষ আদি ঐশ্বর্য সমন্বিত বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যকেও তা অতিক্রম করেছিল। গোলোক-বৃন্দাবন নামক শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে সুরভী গাভীরা অপরিমিত মাত্রায় দুগ্ধামৃত প্রদান করেন। সেখানকার কল্পবৃক্ষগুলি থেকে যে কেউ যত ইচ্ছা ফল পেতে পারে। আর সেখানকার ভূমি হচ্ছে চিন্তামণি, যার স্পর্শে লোহাও সোনায় পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণের দিব্যধাম অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বিরাজমান ছিলেন, তখন তাঁর উদারতা বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যের থেকেও বেশি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই থাকেন, গোলোক-বৃন্দাবনের অনন্ত ঐশ্বর্য সেখানে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বিরাজ করছিলেন, তখন তিনি ১৬,১০৮ রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন, এবং ১৬,১০৮টি প্রাসাদে ১৬,১০৮জন মহিষী সহ লীলাবিলাস করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর মহিষীদের সঙ্গে প্রাসাদে সুখে বসবাসই করছিলেন না, তিনি প্রতিদিন প্রতিটি প্রাসাদ থেকে সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত ১৩,০৫৪টি গাভী দান করতেন। এইভাবে প্রতিদিন ১৬,১০৮×১৩,০৫৪ অর্থাৎ, একুশ কোটি দুই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আট শত বত্রিশটি গাভী দান করতেন। স্বর্ণ-অলঙ্কারে বিভূষিত এতগুলি গাভীর মূল্য কত হতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, কিন্তু দ্বারকায় রাজত্ব করার সময় শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন এতগুলি গাভী দান করতেন।

## ৩০) ধার্মিক

যিনি স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত ধর্মের আচরণ করেন এবং অপরকেও সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেন, তাঁকে বলা হয় ধার্মিক। কেবল কোন মতের প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করাই ধার্মিকতার লক্ষণ নয়। স্বয়ং ধর্ম আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য এবং ব্যক্তিগতভাবে উদাহরণ দিয়ে অপরকে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা উচিত। সেই ধরনের মানুষই হচ্ছেন যথার্থ ধার্মিক।

এই ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণ যখন বিরাজ করছিলেন, তখন সেখানে অধর্মের লেশমাত্রও ছিল না। সেই সম্পর্কে নারদ মুনি একবার পরিহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে গোপেন্দ্র! আপনার ষাঁড়গুলি (ষাঁড় হচ্ছে ধর্মের প্রতীক) গোচারণে ঘাস খাওয়ার সময় অধর্মরূপ সমস্ত আগাছাকেও খেয়ে ফেলেছে।" অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এত ভালভাবে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছিল, তার ফলে কোথাও অধর্ম দেখা যেত না।

কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু নিরন্তর নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন এবং সেই যজ্ঞে স্বর্গের দেবতাদের নিমন্ত্রণ করছিলেন, সেই জন্য স্বর্গের দেবতারা প্রায় সর্বক্ষণই তাঁদের পত্নীদের থেকে দূরে থাকতেন। তাই পতি বিরহে সন্তপ্ত হয়ে তাঁদের স্ত্রীরা শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করেন। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে তাঁরা বুদ্ধদেবের অবতরণের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করেন—যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতার, কেন না পশুহত্যা রোধ করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব বৈদিক যজ্ঞ বন্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হবেন। দেবাঙ্গনারা বিচার করেছিলেন, যদি বুদ্ধদেব অবতরণ করেন, তা হলে যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে তাঁরা তাঁদের পতিদের সব সময় তাঁদের কাছে পাবেন।

কখনও কখনও কেউ জিজ্ঞাসা করেন, আজকাল স্বর্গের দেবতারা পৃথিবীতে কেন আসেন না? এর সরল উত্তর হচ্ছে—বুদ্ধদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান পশুহিংসা বন্ধ করার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান নিষেধ করে গেছেন, তখন থেকে যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তার ফলে আর দেবতারা এখানে আসেন না।

## দ্বাবিংশতি অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের আরও গুণাবলী

### ৩১) শূর

যে ব্যক্তি যুদ্ধ করতে অত্যন্ত উৎসাহী এবং নানা রকম অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ, তাকে শূর বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "হে রিপুনাশন! গজরাজ যেভাবে তার শুঁড়ের আন্দোলনে সরোবরস্থিত সমস্ত কমলকে উচ্ছেদ করে, তেমনই গজ-শুণ্ডতুল্য আপনার বাহুযুগলের আন্দোলনে আপনি কত কমলরূপী শত্রুকে বিনাশ করছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রপ্রয়োগের দক্ষতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যখন তের অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের একটি সৈনিককেও আহত করতে পারেনি। এটি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষ রণকৌশলের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধ করার ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তটি অদ্বিতীয়।

### ৩২) করুণ

যিনি অপরের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না, তাঁকে বলা হয় করুণ।

শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য প্রকট হয়েছিল যখন তিনি মগধেন্দ্র জরাসন্ধের দ্বারা বন্দী রাজাদের মুক্ত করেন। পিতামহ ভীষ্ম তাঁর অন্তিম সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করে বলেন যে, তিনি হচ্ছেন অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হরণকারী সূর্যের মতো। মগধেন্দ্র জরাসন্ধ বহু রাজাকে বন্দী করে অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে তাঁদের রুদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন সেখানে আবির্ভূত হন, তখন সূর্যোদয়ের মতো সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ, মগধেন্দ্র যদিও বহু রাজাকে বন্দী করে রেখেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে তাঁরা সকলেই মুক্ত হন। সেই সমস্ত রাজাদের প্রতি ঐকান্তিক করুণার ফলেই শ্রীকৃষ্ণ তা করেছিলেন।

পিতামহ ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রদর্শিত হয়েছিল। সেই অবস্থায় ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য অত্যন্ত আকুল হয়ে উঠেছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গিয়েছিলেন। ভীষ্মের এই অবস্থা দর্শন করে, তিনি

সাক্ষাৎভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি কোন বক্তৃতাই দিচ্ছিলেন না, করুণাময় হিসেবে তিনি আত্মনিমগ্ন হয়েছিলেন। এটি লক্ষ্য করলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম না করে, ভক্তরা তাঁর করুণাময়ী প্রকৃতিকে প্রণতি জানায়। বস্তুতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, কেনা না তিনি প্রেমের পরোয়া করেন না। কিন্তু ভক্তরা তাঁর করুণাময়ী প্রকৃতির কোমলতার সুযোগ গ্রহণ করেন, যার মূর্ত প্রকাশ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। তাই ভক্তরা রাধারাণীর কাছে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা করেন।

## ৩৩) শ্রদ্ধাবান

গুরু, ব্রাহ্মণ তথা বৃদ্ধদের প্রতি যিনি যথাযথভাবে শ্রদ্ধাশীল, তাঁকে বলা হয় শ্রদ্ধাবান।

যখন গুরুজনেরা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে একত্রিত হতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রম অনুসারে গুরুদেব, পিতা ও অগ্রজ বলরামকে নমস্কার করতেন। এইভাবে অরবিন্দাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্যবহারে সম্পূর্ণ প্রসন্ন এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন।

## ৩৪) বিনয়ী

যিনি ঔদ্ধত্য অথবা অভিমান প্রকাশ করেন না, তাঁকে বলা হয় বিনয়ী।

শ্রীকৃষ্ণের বিনয়ী স্বভাবের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যখন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির মহারাজের আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হন, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জেনে, তাঁকে অভিবাদন করবার জন্য নেমে আসেন। কিন্তু তার আগেই শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে এসে যুধিষ্ঠির মহারাজকে প্রণাম করেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি কখনও তাঁর ব্যবহারে সদাচার পালন করতে ভুলে যান না।

## ৩৫) উদার

যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত মৃদু ও কোমল, তাঁকে বলা হয় উদার।

স্যমন্তক মণি হরণ প্রসঙ্গে উদ্ধবের একটি উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দয়াময় ও উদার। তিনি তাঁর সেবকের মহা অপরাধও গ্রাহ্য করেন না। তিনি কেবল তাঁর ভক্তের সেবারই পূর্ণ গুরুত্ব দেন।

## ৩৬) লাজুক

যে ব্যক্তি কখনও কখনও নম্রতা ও সঙ্কোচ প্রকাশ করেন, তাঁকে বলা হয় লাজুক।

*ললিত-মাধব* গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের লজ্জাভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি যখন তাঁর বাঁ-হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গিরি-গোবর্ধন তুলে ধরেন, তখন সমস্ত গোপীরা তাঁর এই অদ্ভুত কার্য মুগ্ধচিত্তে দর্শন করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। যখন তাঁর দৃষ্টি গোপিকাদের বক্ষঃস্থলের উপর নিবদ্ধ হয়, তখন তাঁর হাত কেঁপে ওঠে এবং তার ফলে গোবর্ধন পর্বতও কম্পিত হয়। সেই পর্বতের নীচে দণ্ডায়মান সমস্ত গোপবৃন্দ তখন একটু বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা চিৎকার করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন। গোবর্ধন পর্বতকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলির অগ্রভাগে কম্পিত হতে দেখে গোপদের সেই ভয়ের কথা বুঝতে পেরে, বলরাম স্মিত হাস্য করেছিলেন। কিন্তু বলরামকে হাসতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেছিলেন যে, বলরাম নিশ্চয়ই গোপিকাদের বক্ষঃস্থল দর্শনের ফলে তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি লজ্জিত হয়ে তখন মস্তক অবনত করেছিলেন।

## ৩৭) শরণাগত পালক

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শরণাগত জীবের রক্ষক।

শ্রীকৃষ্ণের এক শত্রু এই বিচার করে মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, যদি তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে যান, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। শ্রীকৃষ্ণকে কখনও কখনও চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যিনি চণ্ডাল ও অস্পৃশ্যের ঘরেও তাঁর স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করেন।

## ৩৮) সুখী

যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রসন্ন এবং কোন রকম দুঃখ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তাঁকে বলা হয় সুখী।

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ উপভোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর মহিষীদের শ্রীঅঙ্গ যে সমস্ত অলঙ্কারে বিভূষিত, তা স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরেরও স্বপ্নের অতীত। শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের দুয়ারের সামনে নিরন্তর যে নৃত্য হয়, তা স্বর্গের দেবতাদের কল্পনার অতীত। স্বর্গলোকে ইন্দ্র সর্বক্ষণ অপ্সরাদের নৃত্য দর্শন করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের দুয়ারে যে নৃত্য হয়, তার সৌন্দর্য ইন্দ্র পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেন না। গৌরীর থেকেও অধিক সুন্দরী এবং চন্দ্রকলার থেকেও অধিক পূর্ণ রমণীরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে তাঁর সঙ্গে নিবাস করতেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের থেকেও অধিক আনন্দ কে উপভোগ করতে পারে! আনন্দ উপভোগের তিনটি উপকরণ হচ্ছে সুন্দরী রমণী, অলঙ্কার ও ধন। এর সব কয়টিই

শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সেই সম্বন্ধে অনুমান করতে গিয়ে কুবের, ইন্দ্র ও শিবেরও কল্পনা পরাস্ত হয়ে যায়।

লেশমাত্র দুঃখ কখনও শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করতে পারে না। এক সময়ে কয়েকজন গোপিকা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ-পত্নিগণ! তোমরা জেনে রাখো যে, শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখের লেশও স্পর্শ করতে পারে না। কোন কিছুর হানি, কোন কিছুর গ্লানি, কোন অপযশ, ভয়, উদ্বেগ অথবা উৎপাত তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি কেবল ব্রজাঙ্গনা পরিবৃত হয়ে তাঁদের সঙ্গে রাসনৃত্য উপভোগ করেন।"

## ৩৯) ভক্তসুহৃৎ

ভক্তিভরে কেউ যদি একটি তুলসীপত্র অথবা একটু জল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তা হলে ভক্তবৎসল ভগবান তাঁর কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেন।

ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছিল ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধে। মৃত্যুর পূর্বে পিতামহ ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলেন। ভীষ্মের মনে তখন স্মৃতির উদয় হয়েছিল, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কোন পক্ষের হয়ে অস্ত্র ধারণ করবেন না; তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকবেন। অর্জুনের সারথিরূপেও তাঁর পণ ছিল, কোন অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে তিনি অর্জুনের সহায়তা করবেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য একদিন ভীষ্ম অর্জুনের বিরুদ্ধে এমন পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে এসে, একটি ভগ্ন রথের চাকা তুলে পিতামহ ভীষ্মের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি সিংহ গজরাজকে হত্যা করবার জন্য তার দিকে ধাবিত হয়। মৃত্যুশয্যায় এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য স্মরণ করে ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করেছিলেন, তাঁর ভক্ত অর্জুনের প্রতি বাৎসল্যের বশবর্তী হয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে বিচলিত না হওয়ার জন্য।

## ৪০) প্রেমবশ্য

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রেমের দ্বারা বশীভূত হন, তাঁর সেবার দ্বারা নয়। কেউই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে পারে না। তিনি এতই পূর্ণ ও আত্মতৃপ্ত যে, ভক্তের কোন রকম সেবাতেই তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের প্রেম ও স্নেহ তাঁকে বেঁধে রাখে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমবশ্যতার এক সুন্দর

উদাহরণ হচ্ছে, তাঁর প্রাসাদে আগত সুদামা বিপ্রের প্রতি তাঁর আচরণ। সুদামা বিপ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের সহপাঠী। দারিদ্র্য নিবারণের জন্য স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন কিছু সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য। সুদামা বিপ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে আসেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সাদরে তাঁর অভ্যর্থনা করেন এবং মহিষী সহ তিনি ব্রাহ্মণের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর পাদ প্রক্ষালন করেন। সুদামার সঙ্গে শৈশবের দিনগুলির কথা স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণ তখন অশ্রুবর্ষণ করতে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার অন্য আর একটি উদাহরণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৯/১৮) রয়েছে, যেখানে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন, "হে রাজন! মা যশোদা যখন কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গিয়ে, ক্লান্তিবশত ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছিলেন, কৃষ্ণ তখন তাঁর বন্ধন স্বীকার করেছিলেন।" শৈশবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চঞ্চল কার্যকলাপের দ্বারা তাঁর মাকে অত্যন্ত বিরক্ত করতেন। সেই জন্য মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তিনি ঘর থেকে সমস্ত দড়ি এনে তাঁকে বাঁধবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দড়িতে গ্রন্থি দিতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, তা পুরোপুরিভাবে তাঁর উদরকে বেষ্টন করছে না। তখন তিনি ঘর থেকে আরও দড়ি নিয়ে আসেন, কিন্তু প্রতিবারেই দেখেন যে, কৃষ্ণের উদরকে তা বেষ্টন করছে না। এইভাবে ঘরের সমস্ত দড়ি শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তবুও কৃষ্ণকে বাঁধা যায়নি। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রমে তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে ওঠেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর মায়ের রজ্জুবন্ধন স্বীকার করেন। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণকে কেবল প্রেমের দ্বারাই বাঁধা যায়। ভক্ত তাঁর প্রতি প্রেমপরায়ণ, তাই তিনি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

## ৪১) সর্বমঙ্গলময়

যিনি সর্বদাই সকলের মঙ্গল সাধন করেন, তাঁকে বলা হয় সর্বমঙ্গলময়।

এই ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার পর, উদ্ধব তাঁর লীলাসমূহ স্মরণ করে বলতে থাকেন, "শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অদ্ভুত লীলাবিলাসের দ্বারা সমস্ত মহর্ষিদের কৃতার্থ করেছেন। নিষ্ঠুর রাজাদের সমস্ত আসুরিক কার্যকলাপ সমাপ্ত করেছেন, পুণ্যাত্মাদের রক্ষা করেছেন এবং যুদ্ধে সমস্ত নিষ্ঠুর পুরুষদের হত্যা করেছেন। এইভাবে তিনি সকলেরই পরম মঙ্গল সাধন করেন।"

## ৪২) প্রতাপী

শত্রুদের যিনি সংকটে ফেলতে পারেন, তাঁকে বলা হয় প্রতাপী।

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে বিরাজমান ছিলেন, তখন সূর্যের প্রতাপে অন্ধকার যেমন পর্বত-কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁর সমস্ত শত্রুরাও তেমন পালিয়ে গিয়েছিল—তারা পেচকের মতো তাঁর দৃষ্টির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল।

## ৪৩) কীর্তিমান

নির্মল চরিত্রের জন্য যে পুরুষ প্রসিদ্ধ হন, তাঁকে বলা হয় কীর্তিমান।

শ্রীকৃষ্ণের যশের প্রসার সেই চন্দ্রালোকের মতো, যা অন্ধকারকেও শুভ্র জ্যোৎস্নায় রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনামৃত যদি সমস্ত জগৎ জুড়ে প্রচার করা যায়, তা হলে অজ্ঞানের অন্ধকার এবং জড় অস্তিত্বের উৎকণ্ঠা—শুদ্ধতা, শান্তি ও সমৃদ্ধির শুভ্র জ্যোৎস্নায় পরিণত হবে।

দেবর্ষি নারদ যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন দেবাদিদেব মহাদেবের কণ্ঠের নীলিমা দূর হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে তাঁর পত্নী গৌরী মনে করেছিলেন যে, অন্য কোনও পুরুষ তার পতির রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে এসেছে। তাই, ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে চলে যান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করে নীলাম্বরধারী বলরামও দেখেছিলেন যে, তার বস্ত্র সাদা হয়ে গেছে, এবং যমুনার জলকে দুধে পরিণত হতে দেখে গোপীরা তা মন্থন করতে শুরু করেন। অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনার অমৃত অথবা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করা হলে, সব কিছুই শুভ্র ও নির্মল হয়ে ওঠে।

## ৪৪) জনপ্রিয়

যে ব্যক্তি সকলের প্রীতিভাজন হন, তাঁকে বলা হয় জনপ্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণের জনপ্রিয়তার উদাহরণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১১/৯) হস্তিনাপুর থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় বর্ণনা করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দ্বারকায় তাঁর অনুপস্থিতির ফলে, সমস্ত দ্বারকাবাসী অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন সমস্ত দ্বারকাবাসী অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে তাকে অভিবাদন করে বলেছিলেন, "হে নাথ! যখন আপনি এখান থেকে চলে যান, তখন এক-একটি ক্ষণকে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কোটি কোটি বৎসরের মতো বলে মনে হয়েছিল। আমাদের পক্ষে আপনার বিরহ সহ্য করা অসম্ভব।" এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ কত জনপ্রিয় ছিলেন।

এই রকম আর একটি ঘটনা ঘটে যখন শ্রীকৃষ্ণ কংসের যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখা মাত্রই সমস্ত ঋষিরা জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় কিশোর অবস্থায় ছিলেন, তাই সমস্ত ঋষিরা তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

সেখানে আগত দেবতারাও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেছিলেন এবং সেখানে সমবেত সমস্ত মহিলা ও বালিকারা চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। অর্থাৎ, সেখানে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না।

## ৪৫) ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

যদিও পরমেশ্বর ভগবানরূপে শ্রীকৃষ্ণ কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, কিন্তু তবুও *ভগবদ্‌গীতার* বর্ণনা অনুসারে যিনি শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে তাঁর নাম কীর্তন করেন, সেই ভক্তের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই লোকে লীলাবিলাস করছিলেন, তখন এক ভক্ত তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে বলেন, "হে পুরুষোত্তম! যদি আপনি জগতের কল্যাণের জন্য অবতরণ না করতেন, তা হলে অসুরদের ভয়ঙ্কর কার্যকলাপের প্রভাবে না জানি সাধুদের কী অবস্থা হত!" শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আবির্ভাবের প্রথম থেকেই সব রকম আসুরিক জীবদের পরম শত্রু ছিলেন। তবে অসুরদের প্রতি তাঁর দ্বেষ এবং ভক্তদের প্রতি তাঁর প্রেমের মধ্যে কোন ভেদ নেই, কেন না তাঁর হাতে নিহত অসুরেরাও তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করে।

## ৪৬) রমণী-মনোহর

যে পুরুষের মধ্যে বিশেষ গুণ থাকে, তিনি নারীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হন।

দ্বারকার মহিষীদের সম্বন্ধে এক ভক্ত বলেছেন, "সাক্ষাৎ ভগবানের সেবাপরায়ণা দ্বারকার মহিষীদের মহিমা কে বর্ণনা করতে পারে? ভগবানের মহিমা এতই অসীম যে, কেবল তাঁর নাম কীর্তন করার ফলেই নারদ আদি মহর্ষিরা দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। সুতরাং যে সমস্ত মহিষীরা নিরন্তর তাঁকে দর্শন করতেন এবং তাঁর সেবা করতেন, তাঁদের মহিমা কে বর্ণনা করতে পারে?" দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০৮জন মহিষী ছিলেন। তাঁরা সকলেই লোহা যেমন চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঠিক সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এক ভক্ত সেই সম্বন্ধে বলেছেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি হচ্ছেন চুম্বকের মতো, আর ব্রজাঙ্গনারা হচ্ছেন লোহার মতো—আপনি যেখানেই যান, তাঁরাও আপনার পিছু পিছু সেখানে ধাবিত হন।"

## ৪৭) সর্ব-আরাধ্য

যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষ ও দেবতাদের শ্রদ্ধাভাজন হন এবং তাঁদের দ্বারা পূজিত হন, তাঁকে বলা হয় সর্ব-আরাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণ কেবল ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত জীবদেরই নন, তিনি বলদেব, শেষ আদি বিষ্ণুতত্ত্বদেরও আরাধ্য। বলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ, এবং সেই বলদেবও তাঁকে আরাধ্য বলে মনে করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত সমস্ত ঋষি ও দেবতা সহ সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিলেন এবং সকলেই তাঁর আরাধনা করেছিলেন।

## ৪৮) সর্ব-ঐশ্বর্যশালী

শ্রীকৃষ্ণ বৈভব, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই সমস্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বিরাজ করছিলেন, তখন যদুবংশে ছাপ্পান্ন কোটি সদস্য ছিলেন। তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত ছিলেন। নগরবাসীদের বসবাসের জন্য নয় লক্ষ প্রাসাদ ছিল এবং সেখানে সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরম আরাধ্য বলে মনে করতেন। ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের এই অতুল ঐশ্বর্য দর্শন করে বিস্ময়ান্বিত হতেন।

*কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বৃন্দাবনের ঐশ্বর্যের কথা আমি কি বলব? ব্রজাঙ্গনাদের ঐশ্বর্যের কথা আমি কি বলব? ব্রজাঙ্গনাদের চরণের আভরণ চিন্তামণির থেকেও মূল্যবান মণিরাজির দ্বারা রচিত, তাঁরা পারিজাত ফুল দিয়ে শৃঙ্গার (অঙ্গরাগ) করেন এবং সেখানকার গাভীগুলি গোলোক ধামের সুরভী গাভীদের মতো। আহা! তোমার ঐশ্বর্য সমুদ্রের মতো অসীম।"

## ৪৯) বরীয়ান

যিনি সমস্ত মান্য পুরুষদের মধ্যে প্রধান, তাঁকে বলা হয় বরীয়ান।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বিরাজ করছিলেন, তখন শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাগণ তাঁকে দর্শন করবার জন্য সেখানে আসতেন। একদিন সেখানকার দ্বাররক্ষী বলতে থাকেন, "হে ব্রহ্মা, হে শিব! কিছুক্ষণের জন্য আপনারা এই আসনে উপবেশন করে প্রতীক্ষা করুন। হে ইন্দ্র! আপনার স্তবপাঠ এখন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করুন, কেন না তার ফলে কোলাহলের সৃষ্টি হচ্ছে। দয়া করে আপনি নিঃশব্দে একটু অপেক্ষা করুন। হে বরুণ! আপনি এখন এখান থেকে চলে যান। হে দেববৃন্দ! আপনারা অনর্থক আপনাদের সময় নষ্ট করবেন না, শ্রীকৃষ্ণ এখন অত্যন্ত ব্যস্ত, তিনি এখন আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না!"

## ৫০) পরম নিয়ন্তা

নিয়ন্তা দুই প্রকারের—যিনি স্বাধীন তাঁকে বলা হয় নিয়ন্তা, এবং যাঁর আদেশ অমান্য করা যায় না, তাঁকেও বলা হয় নিয়ন্তা।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ স্বতন্ত্রতা ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, যদিও কালীয় ছিল মহা অপরাধী, তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাকে তাঁর চরণচিহ্ন প্রসাদরূপে দান করেছিলেন, অথচ ব্রহ্মার নানা রকম স্তুতি সত্ত্বেও তিনি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেননি।

শ্রীকৃষ্ণের এই বিচিত্র ব্যবহার সর্বতোভাবেই যোগ্য, কেন না বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই তাঁকে *স্বরাট্* বলে যে অভিহিত করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'সম্পূর্ণরূপে' স্বাধীন, সেটিই হচ্ছে পরব্রহ্মের স্থিতি। পরমতত্ত্ব কেবল চেতনই নন, তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২/২১) উদ্ধব বিদুরকে বলছেন, "শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ত্রিগুণময়ী মায়ার অধীশ্বর। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের ভোক্তা, তাই তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে মহান আর কেউ হতে পারেন না।" সমস্ত রাজা-মহারাজারা যখন নানা রকম উপহার প্রদান করে ভগবানের চরণে প্রণতি নিবেদন করতেন, তখন নানা রকম দুর্লভ মণিমাণিক্য খচিত তাঁদের মুকুট তাঁর চরণ স্পর্শ করত। একজন ভক্ত বলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করার আদেশ দিয়ে এবং শিবকে সংহার করার আদেশ দিয়ে আপনি সৃষ্টি ও সংহার করছেন। আপনি কেবল আপনার আদেশের দ্বারা এবং আপনার অংশপ্রকাশ বিষ্ণুর দ্বারা সৃষ্টি ও পালন করেন। হে কংসারি! কত ব্রহ্মা ও কত শিব কেবল আপনার আদেশ পালন করছেন!"

## ৫১) অপরিবর্তনীয়

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের কখনও পরিবর্তন হয় না, এমন কি এই প্রাকৃত জগতে অবতরণ করলেও তাঁর স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। সাধারণ জীবের অপ্রাকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে। সে নানা দেহ ধারণপূর্বক দেহাত্মবুদ্ধি অনুসারে কর্ম করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি তাঁর আদি স্বরূপেই প্রকাশিত হন, তাই তিনি প্রকৃতির গুণের অধীন নন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১১/৩৮) বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি মায়ার গুণের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে, ভগবানের শরণাগত ভক্তও জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। মায়ার

প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যে সমস্ত ভক্ত ও মহাত্মা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভগবান স্বয়ং রক্ষা করেন, তাই তাঁরা মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। সুতরাং স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? যদিও ভগবান কখনও কখনও এই প্রাকৃত জগতে প্রকট হন, কিন্তু প্রাকৃতিক গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করেন। এটি ভগবানের একটি বিশেষ গুণ।

## ৫২) সর্বজ্ঞ

যিনি সকলের মনোভাব এবং সকল সময়ে সকল স্থানের সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবগত, তাঁকে বলা হয় সর্বজ্ঞ।

ভগবানের সর্বজ্ঞতার এক সুন্দর উদাহরণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১৫/১১) বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্যোধনের চক্রান্ত অনুসারে দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্বাসা মুনি বনবাসী পাণ্ডবদের গৃহে উপস্থিত হন। দুর্যোধন এমন ব্যবস্থা করেছিল, যার ফলে পাণ্ডবদের ভোজন হয়ে যাওয়ার পর দুর্বাসা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তা হলে পাণ্ডবেরা শিষ্যসহ দুর্বাসা মুনিকে ভোজন করাতে পারবেন না এবং তার ফলে ক্রোধপরায়ণ দুর্বাসার অভিশাপে পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হবেন—এটাই ছিল দুর্যোধনের অভিপ্রায়। দুর্যোধনের এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে এসে বলেন যে, তিনি খুব ক্ষুধার্ত এবং তিনি কিছু খেতে চান। দ্রৌপদী তখন তাঁর সামনে খালি পাত্রগুলি এনে দেখালেন যে, আহার্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, একটি পাত্রের গায়ে এক টুকরো শাক লেগে রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি খেয়ে ঢেকুর তুললেন। দুর্বাসার দল তখন নদীতে স্নান করছিল। দ্রৌপদীর অর্পিত খাবার খেয়ে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি হওয়ার ফলে সকলেই তৃপ্ত হয়েছিল। তাই দুর্বাসা সহ তাঁর দশ হাজার শিষ্যরাও তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে লাগলেন। তাঁরা ভোজন করার জন্য যুধিষ্ঠিরের গৃহে আর ফিরে এলেন না। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসার ক্রোধাগ্নি থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন। দুর্যোধন মনে করেছিল যে, পাণ্ডবেরা এত শিষ্যসহ দুর্বাসার অতিথি-সৎকার করতে পারবেন না এবং তখন দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদের অভিশাপ দেবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিচক্ষণতা ও সর্বজ্ঞতার দ্বারা এই অবশ্যম্ভাবী বিপদ থেকে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন।

## ৫৩) নিত্য নব-নবায়মান

ভক্তরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ ও নামকীর্তন করেন, কিন্তু তবুও তাঁরা তাতে তৃপ্ত হন না। তার ফলে তাঁদের অরুচি হয় না; তাঁরা নিত্য নব নব উৎসাহ

সহকারে ভগবানের স্মরণ আর নামকীর্তন করতে থাকেন। তার কারণ হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নব-নবায়মান। কেবল শ্রীকৃষ্ণই নন, তাঁর জ্ঞানও নিত্য নতুন। *ভগবদ্গীতা* পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শোনান হয়েছিল, কিন্তু আজও কোটি কোটি মানুষ বারবার তা পাঠ করেন, তবুও প্রতিবারই তার থেকে নতুন উপলব্ধি হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নাম, যশ, গুণ ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই নিত্য নবীন।

দ্বারকার সমস্ত মহিষীরা ছিলেন লক্ষ্মীদেবী। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১১/৩৩) বর্ণনা করা হয়েছে যে, লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত চঞ্চলা, তাই কেউই তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। সেই জন্য কারও ভাগ্য স্থির থাকে না। কিন্তু সেই লক্ষ্মীদেবীরাই যখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবস্থান করেছিলেন, তখন তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যেতে পারেননি। এর অর্থ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ নিত্য নব-নবায়মান। এমন কি, লক্ষ্মীদেবীরা পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে যেতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নতুন আকর্ষণ সম্বন্ধে *ললিত-মাধব* গ্রন্থে রাধারাণীর একটি উক্তি রয়েছে। রাধারাণী সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ তিনি তাঁর মাধুরীর যন্ত্র দিয়ে তাঁদের পাতিব্রত্যরূপ পাথরকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। বৈদিক নিয়ম অনুসারে পত্নীরা পতিব্রতা হতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাটালি সদৃশ মাধুর্য সেই স্ত্রীলোকদের পাথরের মতো দৃঢ় পাতিব্রত্যকেও ভেঙ্গে দিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের অধিকাংশ সখীদের বিবাহ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিবাহের পূর্বে তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাই তাঁরা তাঁর অতি আকর্ষণীয় রূপ-মাধুরীর কথা ভুলতে পারেননি। বিবাহের পরেও তাঁর সেই রূপ তাঁদের চিত্ত হরণ করত।

## ৫৪) সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণের দিব্যরূপ সচ্চিদানন্দময়। *সৎ* কথাটির অর্থ হচ্ছে সর্বস্থানে ও সর্বকালে নিত্য বিরাজমান। *চিৎ* কথাটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞানময়। শ্রীকৃষ্ণের কারও থেকে জানবার মতো কিছুই নেই। তিনি স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ জ্ঞানময়। *আনন্দ* কথাটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত সুখানুভূতির উৎস। নির্বিশেষবাদীরা 'সৎ' ও 'চিন্ময়' ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে পরম আনন্দ রয়েছে, তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। মোহ, ভ্রান্তি, দেহাত্মবুদ্ধি, রাগ, দ্বেষ ও বিষয়াসক্তির বিকার থেকে মুক্ত হওয়ার পর ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হওয়ার দিব্য সুখ অনুভব করা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এটিই হচ্ছে প্রাথমিক যোগ্যতা। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা

হয়েছে, *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা*—অর্থাৎ ব্রহ্মভূত অবস্থায় স্থিত হলে আত্মা প্রসন্ন হয় এবং সব রকম উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত আনন্দের অনুভূতি কেবল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের প্রভাবেই লাভ করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাই নির্বিশেষ ব্রহ্মে যে সুখানুভূতি রয়েছে, তা তাতে সমাবিষ্ট রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দররূপে নির্বিশেষবাদীরাও মোহিত হয়ে যায়।

*ব্রহ্ম-সংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি; ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির উৎস। সেই সম্বন্ধে তিনি নিজেই *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'*। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপই চরম তত্ত্ব নয়; শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্বের চরম অবধি।

বৈষ্ণবেরা তাই কখনও ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চান না। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে আত্ম-উপলব্ধির চরম লক্ষ্য বলে জানেন। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম ও পরম ঈশ্বর বলা হয়। শ্রীযামুনাচার্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে বলেছেন, "হে প্রভু! আমি জানি যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত দেশ, কাল, প্রকৃতির আটটি উপাদানের দ্বারা আবৃত, যেগুলি ক্রমান্বয়ে একটি অপরটি থেকে দশ গুণ প্রশস্ত। প্রকৃতির তিনটি গুণ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু এবং তারও ঊর্ধ্বে ব্রহ্মজ্যোতি সমন্বিত চিদাকাশ এবং সেখানকার চিন্ময় লোক বৈকুণ্ঠধাম—এই সবই আপনার শক্তির অতি নগণ্য প্রকাশ।"

## ৫৫) সর্ব সিদ্ধিসম্পন্ন

সিদ্ধি অনেক রকমের রয়েছে। সিদ্ধ যোগীরা যে সর্বোচ্চ প্রাকৃত সিদ্ধি লাভ করেন, তা আট রকমের—অণিমা, মহিমা ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রাকৃত সিদ্ধি ও সব রকম অপ্রাকৃত সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণরূপে রয়েছে।

## ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি

শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত। তিনি কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডেই নয়, সমস্ত জীবের হৃদয়েই নয়, পরন্তু প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজ করছেন। মহারাণী কুন্তী তাঁর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণের এই অচিন্ত্য শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কুন্তীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেই সময় তিনি যুগপৎভাবে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতাদেরও মোহিত করতে পারেন, এবং তাঁর শরণাগত ভক্তদের অমঙ্গলময় পাপকর্ম বিনাশ করতে পারেন। এগুলি কেবল তাঁর অচিন্ত্য শক্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে বলেছেন, "সম্পূর্ণ অপরা প্রকৃতি নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামাত্র। তিনি অসংখ্য গাভী, গোবৎস ও গোপবালকরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাকে আত্মবিদ্যা প্রদান করেছেন, তাই তিনি কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরদেরই নন, তিনি সকলেরই আরাধ্য। অতএব সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে পারিজাত হরণ করেছিলেন, তখন নারদ ইন্দ্রকে তিরস্কার করে বলেন, "হে দেবরাজ ইন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও শিবকে পরাজিত করেছেন, সুতরাং তোমার মতো একজন নগণ্য দেবতার কি কথা?" দেবর্ষি নারদ পরিহাসছলে ইন্দ্রকে তিরস্কার করেছিলেন এবং ইন্দ্র তাতে খুশি হয়েছিলেন। নারদের এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রকেও মোহিত করতে পারেন। সুতরাং অন্য সমস্ত জীবকে যে তিনি মোহিত করতে পারেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

ভক্তকে তার পাপ থেকে মুক্ত করা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তির বিবরণ *ব্রহ্ম-সংহিতায়* আছে— "ইন্দ্র থেকে শুরু করে ইন্দ্রগোপ নামক কীট পর্যন্ত সমস্ত জীব তাদের কর্মফল ভোগ করছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণভক্ত তা থেকে মুক্ত হতে পারেন।" তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* একটি বর্ণনায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর গুরুদেবকে গুরুদক্ষিণা দিতে চান, তখন তাঁর গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, তাঁর মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে আনতে। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ যমালয়ে গিয়ে যমরাজকে আদেশ দেন, "আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি এই আত্মাটিকে তুমি ফিরিয়ে দাও।" এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে যমের দ্বারা দণ্ডনীয় প্রাণীও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির বর্ণনা করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলেছেন, "যিনি অজ হওয়া সত্ত্বেও নন্দ মহারাজের পুত্র, সর্বব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও যশোদার প্রেমরজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হয়েছেন, বহুরূপী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজ ও মাতা যশোদার সামনে এক কৃষ্ণরূপে বিরাজ করছেন, সেই অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ আমার বুদ্ধিকে বিমোহিত করছেন।" *ব্রহ্ম-সংহিতাতে* উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যকাল বিরাজ করেন, তবুও তিনি সর্বব্যাপক, এমন কি পরমাণুর মধ্যেও তিনি বিরাজমান।

## ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৪/১১) ব্রহ্মা বলছেন, "হে প্রভো! অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি—এই প্রাকৃত উপাদানগুলি দিয়ে এই বৃহৎ অণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা এই তুচ্ছ শরীরবিশিষ্ট আমি কোথায়, আর কোথায় আপনি, যাঁর রোমকূপ থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকট ও অপ্রকট হচ্ছে। আপনার মহত্ত্বের সামনে আমি অত্যন্ত নগণ্য, তাই আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। দয়া করে আপনি আমাকে কৃপা করুন।"

কেউ যদি কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডকে বিচার করে দেখতে চান, তা হলে তিনি দেখবেন যে, সেখানে কত অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, দেবতাদের আবাস, অসংখ্য জীব আদি কত অদ্ভুত বস্তু রয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে চার শত কোটি মাইল, এবং তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অনেক অতলস্পর্শ পাতাললোক। শ্রীকৃষ্ণ যদিও এই সমস্ত কিছুর উৎস, কিন্তু তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শন করে বৃন্দাবনে সর্বদা দৃষ্ট হন। সুতরাং এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন সর্বশক্তিমান ভগবানের আরাধনা যথাযথভাবে কে করতে পারে?

## ৫৮) সমস্ত অবতারগণের আদি উৎস

*গীতগোবিন্দ* নামক কাব্যগ্রন্থে শ্রীল জয়দেব গোস্বামী গেয়েছেন, "ভগবান মৎস্যরূপে *বেদ* উদ্ধার করেছেন, কূর্মরূপে সমস্ত জগৎ বহন করেছেন, বরাহরূপে পৃথিবীকে জল থেকে তুলে এনেছেন, নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছেন, বামনরূপে বলি মহারাজকে ছলনা করেছেন, পরশুরামরূপে সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশ বিনাশ করেছেন, রামরূপে সমস্ত অসুরদের বধ করেছেন, বলরামরূপে বিশাল হল ধারণ করেছেন, বুদ্ধদেবরূপে পশুহিংসা বন্ধ করেছেন, এবং কল্কি অবতাররূপে নাস্তিকদের সংহার করবেন।" এগুলি কেবল শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি অবতারের বর্ণনা, এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে সাগরের তরঙ্গের মতো নিরন্তর অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হচ্ছেন। সাগরের তরঙ্গ যেমন কেউ গণনা করতে পারে না, তেমনই ভগবানের দেহনির্গত সমস্ত অবতারদের গণনা কেউই করতে পারে না।

## ৫৯) শ্রীকৃষ্ণ শত্রুদের বিনাশ করে মুক্তিদান করেন

মুক্তির আর এক নাম হচ্ছে অপবর্গ। অপবর্গ হচ্ছে প-বর্গ বা নানা প্রকার প্রাকৃত দুঃখের বিপরীত। প-বর্গে পাঁচটি অক্ষর রয়েছে—প, ফ, ব, ভ ও ম। এই অক্ষরগুলি নিম্নলিখিত পাঁচটি দুঃখের দ্যোতক—'প' হচ্ছে পরাভব। এই জগতে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে করতে জীব পরাভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে,

আমাদের সব চাইতে বড় কর্তব্য হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি জয় করা। কিন্তু এই ক্লেশদায়ক অবস্থাগুলি আমরা জয় করতে পারি না, তাই মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমরা পরাভূত হচ্ছি। তার পরের অক্ষর 'ফ' আসছে ফেনা কথাটি থেকে। কেউ যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোয় (ঘোড়াদের মুখে যা প্রায়ই দেখা যায়)। 'ব' অক্ষরটি আসছে বন্ধন থেকে। 'ভ' অক্ষরটি আসছে ভীতি থেকে এবং 'ম' অক্ষরটি আসছে মৃত্যু থেকে। সুতরাং 'প'-বর্গ বলতে বেঁচে থাকার সংগ্রামে পরাভব থেকে শুরু করে ক্লান্তি, বন্ধন, ভীতি এবং পরিণামে মৃত্যু পর্যন্ত জড় জগতের নিরর্থক অস্তিত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যার ফলে এই সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায়, তাকে বলা হয় অপবর্গ। শ্রীকৃষ্ণকে এই অপবর্গ অথবা মুক্তির প্রদাতা বলা হয়।

নির্বিশেষবাদী এবং শ্রীকৃষ্ণের শত্রুদের কাছে মুক্তির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। অসুরেরা ও নির্বিশেষবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবুও শ্রীকৃষ্ণ এতই দয়াময় যে, তিনি তাঁর শত্রুদের ও নির্বিশেষবাদীদেরও মুক্তিদান করেন। এই সম্পর্কে বলা হয়েছে, "হে মুরারে! দেবতাদের প্রতি সর্বদাই ঈর্ষাপরায়ণ অসুরেরা আপনার সেনাবাহিনী ভেদ করতে পারেনি, কিন্তু তারা মিত্রমণ্ডল ভেদ করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, এটি কী আশ্চর্যের বিষয়!" এখানে *মিত্র* কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। *মিত্র* কথাটির অর্থ হচ্ছে সূর্যমণ্ডল, এবং মিত্র বলতে বন্ধুকেও বোঝায়। অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করে তাঁর সৈন্যব্যূহ ভেদ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পক্ষান্তরে যুদ্ধে তাদের মৃত্যু হয় এবং তার ফলে তারা মিত্রলোক বা সূর্যমণ্ডল অতিক্রম করে। পক্ষান্তরে, তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবিষ্ট হয়। এখানে সূর্যগ্রহের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, কেন না সূর্যের স্বয়ং প্রকাশ অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক সমন্বিত চিদাকাশের মতো জ্যোতির্ময়। শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা নিহত হয়েছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহ ভেদ করার পরিবর্তে তারা ব্রহ্মজ্যোতির মিত্র পরিবেশে প্রবিষ্ট হয়েছিল। এত কৃপালু বলে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর শত্রুদেরও মুক্তিদাতা বলা হয়।

## ৬০) মুক্ত পুরুষদের আকর্ষণকারী

শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার) আদি মুক্ত মহাত্মাদের আকর্ষণ করেন, তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই সম্পর্কে চতুঃসনরা বলেছেন, "কী আশ্চর্যের বিষয়! সর্বতোভাবে মুক্ত, কামনা-বাসনা রহিত ও পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা রাধা-কৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।"

## ৬১) বিস্ময়কর লীলাবিলাস পরায়ণ

*বৃহৎ-বামন পুরাণে* ভগবান বলেছেন, "যদিও আমার অনেক মনোহর লীলা রয়েছে, কিন্তু তবুও গোপীদের সঙ্গে রাসলীলার কথা যখন আমার স্মরণ হয়, তখন আমার মন আকুল হয়ে ওঠে।"

এক ভক্ত বলেছেন, "আমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণের কথা জানি এবং ভগবানের অন্যান্য অবতারের কথাও জানি। এই সমস্ত অবতারদের লীলাবিলাস অবশ্যই আমার চিত্তে গভীর আনন্দের সঞ্চার করে, কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বিলাস অদ্ভুতভাবে আমার চিত্তকে দিব্য আনন্দে প্লাবিত করে।"

## ৬২) শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় ভক্ত পরিবেষ্টিত

আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, তখন 'কৃষ্ণ' বলতে কেবল একলা শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝানো হয় না। তাঁর নাম, রূপ, গুণ, যশ, পার্ষদ, সামগ্রী, পরিকর ইত্যাদি সব কিছু বোঝায়। রাজা যেমন সর্বদাই তাঁর মন্ত্রী, সচিব, সেনাপতি তথা অন্য অনেক পার্ষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ কখনও একলা থাকেন না। বিশেষ করে তাঁর বৃন্দাবন লীলায় তিনি গোপিকা, গোপবালক, পিতা, মাতা ও অন্য সমস্ত বৃন্দাবনবাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩১/১৫) গোপিকারা বিলাপ করেছেন, "হে কৃষ্ণ! দিনের বেলায় তুমি যখন বৃন্দাবনের বনে তোমার গাভীদের নিয়ে গোচারণে যাও, তখন এক নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হয়। তারপর দিনের শেষে তুমি যখন ফিরে আসো, তখন তোমার অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শন করে আমরা এতই আকৃষ্ট হই যে, নিরন্তর তোমাকে না দেখে আমরা থাকতে পারি না। সেই সময় যখন চোখের পলক পড়ে, তখন তা অসহ্য বলে মনে হয়। তখন মনে হয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বুদ্ধি নিতান্তই জড়, কেন না তিনি যথার্থ নেত্র সৃষ্টি করতে পারেননি!" অর্থাৎ, তাঁদের চোখের পলক পড়ায় গোপিকারা বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ সেই ক্ষণকালের জন্য যখন তাঁদের চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাননি। এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের প্রেম এত গভীর ও ঐকান্তিক ছিল যে, তাঁর ক্ষণকালের বিরহও তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। আবার যখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন, তখনও তাঁরা তাঁকে পেয়ে হারাবার ভয়ে আক্ষেপ করতেন। এ এক আপাতবিরোধী অবস্থা।

একজন গোপিকা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করে বলেছেন, "রাত্রিবেলা তোমার সঙ্গে যখন আমার মিলন হয়, তখন মনে হয় রাত্রি যেন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। শুধু এই রাত্রিই কেন? ব্রহ্মার রাত্রিও যদি আমরা পেতাম

(চার শত বত্রিশ কোটি বছরে ব্রহ্মার বারো ঘণ্টা বা এক রাত্রি হয়) তা হলেও আমাদের মনে হত তা যেন অতি অল্পক্ষণ।" ব্রহ্মার এক দিনের অনুমান আমরা *ভগবদ্গীতা* (৮/১৭) থেকে পাই—"মানুষের গণনা অনুসারে এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সেই গণনা অনুসারে তাঁর এক রাত্রি হয়।" গোপিকারা বলেছিলেন যে, সেই রকম রাত্রি পেলেও তা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করার জন্য পর্যাপ্ত হবে না।

## ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণীয় বেণুমাধুরী

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৫/১৫) গোপিকারা মা যশোদাকে বলছেন, "যখন আপনার পুত্রটি তাঁর বাঁশি বাজায়, তখন শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি মহাপণ্ডিত মহাত্মারাও মোহিত হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের সেই বাঁশি শুনে তাঁরা গম্ভীর হয়ে যান এবং বিনয়ভাবে তাঁদের মস্তক অবনত হয়ে যায়।"

*বিদগ্ধ-মাধব* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির বর্ণনা করে বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির অপূর্ব সুন্দর সুরের প্রভাবে শিবের ডমরু বাজানো বন্ধ হয়ে গেছে, এবং চতুঃসন আদি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেছে। সেই বংশীধ্বনির প্রভাবে সৃষ্টিকার্যে লিপ্ত কমলাসীন ব্রহ্মা চমকিত হয়ে উঠেছেন, এবং অবিচলিতভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলিকে ধারণ করে আছেন যে অনন্ত শেষনাগ, তিনিও সেই বাঁশির সুরে তাঁর মস্তক আন্দোলন করতে শুরু করেছেন। এই বংশীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে বৈকুণ্ঠলোকে ধ্বনিত হচ্ছে।"

## ৬৪) শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপমাধুরী

*শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২/১২) উদ্ধব বিদুরকে বলছেন, "হে বিদুর! শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকট হয়ে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তাঁর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত পরম আকর্ষণকারী রূপ এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন, যা দেখে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্রীঅঙ্গের মাধুরী এতই অপূর্ব ছিল যে, সেই শরীরে অলঙ্কার ধারণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত হওয়ার পরিবর্তে, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য সমস্ত অলঙ্কারকে বিভূষিত করত।"

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য এবং তাঁর বাঁশির আকর্ষণ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২৯/৪০) গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার প্রতি প্রেমাতুর হয়ে আমরা আমাদের লজ্জা শরম বিসর্জন দিয়ে তোমার প্রতি

আকৃষ্ট হয়েছি, কিন্তু ত্রিভুবনে এমন কোন্ রমণী আছে যে, তোমার বংশীধ্বনি শুনে তার পাতিব্রত্য ধর্ম থেকে বিচলিত হয় না? রমণীদের কী কথা, কঠিন-হৃদয় পুরুষদের চিত্তও তোমার বেণুরবের দ্বারা দ্রবীভূত হয়ে যায়। তোমার মধুর মুরলীর তান এবং মনোহর রূপমাধুরীর প্রভাবে বৃন্দাবনের গাভী, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষরাও মুগ্ধ ও পুলকিত হয়ে ওঠে।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ললিত-মাধব* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'একদিন শ্রীকৃষ্ণ রত্নখচিত গৃহতলে তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপের প্রতিবিম্ব দর্শন করে বিস্ময়ান্বিত হয়ে বলেন, "কী আশ্চর্য, এই রকম সুন্দর রূপ তো আমি কখনও দেখিনি। যদিও এটি হচ্ছে আমারই রূপ, কিন্তু তবুও রাধারাণীর মতো আমিও ঐ রূপটিকে আলিঙ্গন করে দিব্য আনন্দ অনুভব করার জন্য আকুল হয়ে উঠেছি।" এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিবিম্ব এক ও অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ছবির মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য স্থিতি।

উপরোক্ত বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি অদ্ভুত রসমাধুরী ও দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলীর সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করা যায়—সমুদ্রের বিশালত্ব কেউই মাপতে পারে না। কিন্তু তবুও কেবল সমুদ্রের একবিন্দু জল আস্বাদন করে যেমন সমুদ্রের উপাদানগুলি জানা যায়, তেমনই এই সমস্ত বিবরণগুলি থেকে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী এবং তাঁর দিব্য স্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা জানা যায়।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৪/৭) ব্রহ্মা বলেছেন, "হে প্রভু! ধরাধামে প্রকট হয়ে আপনি যে আপনার অচিন্ত্য গুণ, সৌন্দর্য ও লীলাসমূহ প্রকাশ করেছেন, তার হিসাব কেউই করতে পারে না। এমন কি, কেউ যদি কল্পনা করতে চেষ্টা করে, "শ্রীকৃষ্ণ হয়ত এই রকম", তাও অসম্ভব। জন্ম-জন্মান্তর ধরে সাধনা করার পর একদিন জড় বৈজ্ঞানিকেরা হয়ত এই জগতের সমস্ত পরমাণুগুলি অথবা নভোমণ্ডলের তারকারাশির গণনা করতে পারে, কিন্তু তারা সমস্ত দিব্য আনন্দের পরম উৎস আপনার গুণাবলীর গণনা করতে পারবে না।"

# ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অনন্ত রসের আধার এবং সমস্ত নায়কদের শিরোমণি, কিন্তু তবুও তিনি তিনভাবে তাঁর ভক্তের উপর নির্ভরশীল। ভক্তের ভাবানুসারে ভগবান পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ—এই তিন রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। সমস্ত গুণসহ তিনি যখন তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন, মহাজ্ঞানী তত্ত্ববিদেরা তাঁর সেই রূপকে পূর্ণতম বলেন। যখন তিনি তাঁর সমস্ত গুণ থেকে কিছু কম গুণসহ স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাকে বলা হয় পূর্ণতর এবং আরও কম গুণসহ প্রকাশিত তাঁর স্বরূপকে পূর্ণ বলা হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতার তিন স্তরে উপলব্ধ হন। গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, দ্বারকায় পূর্ণতর এবং মথুরায় পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—তিনি ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, একজন পুরুষ কিভাবে এই সমস্ত বিপরীতধর্মী ভাব সমন্বিত হতে পারেন? তার উত্তর হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী এবং কার্যকলাপের পরম উৎস। বিভিন্ন লীলা অনুসারে তিনি বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করেন, সুতরাং সেগুলি পরস্পর-বিরোধী নয়।

## ধীরোদাত্ত

যিনি স্বভাবতই অত্যন্ত গম্ভীর, নম্র, ক্ষমাশীল, দয়াময়, দৃঢ়ব্রত, নিরভিমান, গুণবান, বীর ও রূপবান, তাঁকে বলা হয় ধীরোদাত্ত নায়ক।

এই সম্পর্কে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি সুন্দর উক্তি রয়েছে, "হে প্রভু! আমি অবশ্যই আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি, কিন্তু আপনার অসাধারণ বীরত্ব, ভক্তবাৎসল্য, গোবর্ধন পর্বত ধারণে আপনার দৃঢ়তা, আপনার শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য, এবং আপনার ভক্ত ও অপরাধীদের বন্দনায় প্রসন্ন হওয়ার বিস্ময়কর গুণ—এই সব দেখে আমার বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তাই আমি আমার গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করতে অসমর্থ হয়েছি।"

দেবরাজ ইন্দ্রের এই বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণের ধীরোদাত্ত ভাবের সমস্ত লক্ষণ ব্যক্ত করেছে। অনেক তত্ত্বজ্ঞানী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকেও ধীরোদাত্ত নায়ক বলে স্বীকার করেন, তবে শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত গুণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেও প্রকাশিত হয়।

## ধীরললিত

যিনি স্বভাবতই অত্যন্ত পরিহাস-নিপুণ, নিত্য নবযৌবন-সম্পন্ন, নিরুদ্বিগ্ন ও কৌতুকপ্রিয়, তাঁকে বলা হয় ধীরললিত নায়ক। এই রকম নায়ক সাধারণত প্রেয়সীর বশীভূত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে এই ধীরললিত গুণের বর্ণনা করে এক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের পত্নী বৃন্দাবনে তাঁর সখীকে বলছেন, "একদিন সখীদের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণী যখন উদ্যানে বিশ্রাম করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এসে সকলের সামনে পূর্বরাত্রে রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর লীলা-বিলাসের কথা বর্ণনা করতে থাকেন। তখন শ্রীমতী রাধারাণী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। এই সুযোগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তনযুগলে নানা রকম তিলক এঁকে দেন। এই শিল্পকলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন।" এইভাবে ধীরললিত রূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে কৈশোরোচিত লীলাবিলাস করেন।

সাধারণত সুদক্ষ নাট্যকারেরা কামদেবকে ধীরললিত নায়করূপে বর্ণনা করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে ধীরললিত নায়কের সমস্ত লক্ষণগুলি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

## ধীরপ্রশান্ত

যে ব্যক্তি অত্যন্ত শান্ত, সহনশীল, বিবেচক ও বিনীত, তাঁকে বলা হয় ধীরপ্রশান্ত। শ্রীকৃষ্ণের ধীরপ্রশান্ত স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে। তাঁর প্রতি পাণ্ডবদের ঐকান্তিক ভক্তির ফলে, তিনি তাঁদের সারথি, উপদেষ্টা, সখা, দূত এবং কখনও তাঁদের দেহরক্ষীও হয়েছেন। ভগবানের প্রতি ভক্তির ফলে যে কি লাভ হয়, এটি তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তাঁর অনুজরূপে তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে কথা বলছিলেন, যার ফলে তাঁর দেহের সৌন্দর্য আরও মনোরম হয়ে উঠেছিল। তাঁর চোখের ভঙ্গি এবং তাঁর কথা বলার ধরন থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, নৈতিক উপদেশ দানে তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ। পণ্ডিতেরা কখনও কখনও যুধিষ্ঠির মহারাজকেও ধীরপ্রশান্ত নায়ক বলে বর্ণনা করেন।

## ধীরোদ্ধত

যে নায়ক ঈর্ষালু, অহঙ্কারী, সহজেই ক্রুদ্ধ, চঞ্চলচিত্ত ও পরিতৃপ্ত, পণ্ডিতেরা তাঁকে ধীরোদ্ধত নায়ক বলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে এই সমস্ত গুণগুলি দেখা যায়। তিনি যখন কালযবনকে চিঠি লিখেছিলেন, তখন তিনি একটি পাপী মণ্ডূক বলে

সম্বোধন করেন। সেই চিঠিতে শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে বলেন, কোন অন্ধকূপে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে, কেন না কৃষ্ণ নামক এক কালসর্প এই ধরনের পাপী মণ্ডূকদের গ্রাস করতে অত্যন্ত আগ্রহী। শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে মনে করিয়ে দেন যে, তিনি কেবলমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি ভস্মীভূত করে দিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে মাৎসর্যদোষ প্রতীত হয়, কিন্তু দেশ, কাল ও লীলা অনুসারে এই মাৎসর্যকেও একটি মহান গুণ বলে স্বীকার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের ধীরোদ্ধত ভাবকে মহান বলে স্বীকার করা হয়েছে, কেন না তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এই ভাব প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবদ্ভক্তিতে অবাঞ্ছিত বৃত্তিগুলিও মহৎ গুণে পর্যবসিত হয়।

কখনও কখনও দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকেও ধীরোদ্ধত নায়ক বলে বর্ণনা করা হয়।

শ্রীদামের সঙ্গে খেলাচ্ছলে যুদ্ধ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেন, "হে শ্রীদামহরিণ! কৃষ্ণ নামক এক গজরাজরূপে আমি তোমার সামনে এসেছি। হয় তুমি পরাজয় স্বীকার করে এই রণক্ষেত্র থেকে চলে যাও, অথবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।" শ্রীকৃষ্ণের এই নিরঙ্কুশ মানসিকতা তাঁর মহৎ গুণাবলীর বিরোধী নয়; কারণ তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাই তাঁর চরিত্রে সব কিছুই থাকতে পারে।

পরমেশ্বর ভগবানের চরিত্রে এই সমস্ত আপাতবিরোধী গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করে *কূর্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান অতি স্থূলও নন, আবার অতি ক্ষীণও নন; তিনি সর্বদাই সমস্ত জড়-জাগতিক গুণাবলীর অতীত, বর্ণহীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অঙ্গকান্তি ঘনশ্যাম, তাঁর নেত্র রক্তবর্ণ, তিনি সর্বশক্তিমান এবং তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত। ভগবানের মধ্যে এই সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম দেখতে পাওয়া আশ্চর্যজনক নয়। এই সমস্ত বিরোধগুলি আপাতদৃষ্টিতে প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তবে তাঁর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাই ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা আচার্যদের শ্রীমুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর তত্ত্ব জানা উচিত। তখন বুঝতে পারা যায় যে, ভগবানের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এই গুণগুলি প্রকাশিত হয়।

*মহাবরাহ-পুরাণে* প্রমাণিত হয়েছে যে, ভগবানের ও তাঁর অবতারদের দিব্য শরীর সচ্চিদানন্দময়। তাঁদের রূপ কখনই জড় নয়; তা সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময় ও পূর্ণ জ্ঞানময়। তা সব রকম দিব্য গুণাবলীর আধার। *বিষ্ণুযামল-তন্ত্রে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান ও তাঁর অবতারেরা সর্ব অবস্থাতেই সচ্চিদানন্দময়, সর্ব অবস্থাতেই তাঁরা আঠারোটি জড়-জাগতিক দোষ থেকে মুক্ত। সেই দোষগুলি হচ্ছে—মোহ, শ্রান্তি, ভ্রম, রুক্ষতা, কাম, চাঞ্চল্য, মদ, মাৎসর্য, হিংসা,

অমর্যাদা, অবসাদ, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতা, জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা, বিষমতা ও পরাপেক্ষা।

উপরোক্ত আলোচনা সম্বন্ধে এটি বুঝতে হবে যে, মহাবিষ্ণু হচ্ছেন প্রাকৃত জগতের সমস্ত অবতারের উৎস। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আরও অধিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও মহত্ত্বপূর্ণ, তিনি মহাবিষ্ণুরও উৎস। সেই তত্ত্ব *ব্রহ্ম-সংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, "মহাবিষ্ণু যাঁর অংশ সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" মহাবিষ্ণুর সুবিশাল রূপ হচ্ছে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের উৎস। অগণিত ব্রহ্মাণ্ডগুলি তাঁর নিঃশ্বাস থেকে নির্গত হচ্ছে এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডগুলি আবার তাঁর প্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। সেই মহাবিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ অর্থাৎ কলা।

# চতুর্বিংশতি অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ঐশ্বর্যের বর্ণনা করে রূপ গোস্বামী আরও আটটি অপ্রাকৃত মাধুর্য ও গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। সেগুলি হচ্ছে—শোভা, বিলাস, মাধুর্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য, তেজ, লালিত্য ও ঔদার্য। এই আটটি গুণ সাধারণত মহাপুরুষদের লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়।

## শোভা

দীনজনের প্রতি দয়া, শ্রেষ্ঠত্ব, বীরত্ব, উৎসাহ, দক্ষতা ও সত্য—এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা শোভিত ব্যক্তিকে মহাপুরুষ বলে গণ্য করা হয়। গোবর্ধন ধারণ লীলার সময় এই সমস্ত শোভা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় বৃন্দাবন ধামের উপর ইন্দ্রের মেঘ মুষলধারায় বারিবর্ষণ করেছিল। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভেবেছিলেন, ইন্দ্রের এই স্পর্ধার যথার্থ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সমস্ত স্বর্গলোক বিনাশ করবেন। কিন্তু পরে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের তুচ্ছতা বিবেচনা করে তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং ইন্দ্রের প্রতি দয়ার্দ্র হন। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ কেউই সহ্য করতে পারে না। তাই ইন্দ্রের স্পর্ধার প্রতিকার করার পরিবর্তে তিনি ব্রজবাসীদের রক্ষা করবার জন্য গিরি-গোবর্ধন ধারণ করে ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

## বিলাস

যে পুরুষ সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন, এবং মিষ্ট হেসে কথা বলেন, তাঁকে বিলাসী বলে বিবেচনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই গুণটি প্রকাশিত হয়েছিল, যখন তিনি কংসের যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হন। সেই সময় কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ মল্লদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন না করে তাদের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং স্থির দৃষ্টিতে তাদের অবলোকন করেন। তাঁর সেই দৃষ্টিপাত দেখে তাদের মনে হয়েছিল যে, গজরাজ যেন অবলীলাক্রমে গাছপালা উৎপাটন করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখনও তিনি হাসছিলেন এবং এইভাবে বীরদর্পে তিনি রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন।

## মাধুর্য

কারও চরিত্র যখন অত্যন্ত মধুর ও স্পৃহনীয় হয়, তখন তাঁকে বলা হয় মাধুর্য। শ্রীকৃষ্ণের মধুর প্রকৃতি বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, "একদিন শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনার তীরে শ্রীমতী রাধারাণীর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন তিনি একটি কদম্ব ফুলের মালা গাঁথছিলেন। ইত্যবসরে শ্রীমতী রাধারাণী সেখানে এসে উপস্থিত হন, তখন মুরারি অত্যন্ত মধুরভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর দিকে তাকালেন।"

## মাঙ্গল্য

যিনি সর্ব অবস্থাতেই বিশ্বাসভাজন, তাঁকে বলা হয় মাঙ্গল্য। এই সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, অসুরেরা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করত, কেন না তারা নিশ্চিত ছিল যে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাদের আক্রমণ করবেন না। তাই তারা নির্ভয়ে তাদের দ্বার খুলে রাখত। আর দেবতারা যদিও অসুরের ভয়ে ভীত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা দৃঢ় নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রক্ষা করবেন। তাই ভীতিজনক অবস্থাতেও তাঁরা ক্রীড়ামত্ত থাকতেন। যাঁরা কখনও বৈদিক বিধি আচরণ করেননি, তাঁরাও এটি জেনে নিশ্চিত থাকতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্বীকার করেন এবং তাই তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতেন এবং তার ফলে সব রকম উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতেন। অর্থাৎ, দেবতাদের থেকে শুরু করে অসভ্য মানুষ পর্যন্ত সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার উপর নির্ভর করতে পারেন।

## স্থৈর্য

যে পুরুষ নানা রকম বিঘ্ন উপস্থিত হলেও বিচলিত হন না, তাঁকে বলা হয় স্থির। এই স্থৈর্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বাণাসুরের নিধনে পরিলক্ষিত হয়। বাণাসুরের অসংখ্য হাত ছিল। সেই বাণাসুরকে বধ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ একে একে তার হাতগুলি কাটছিলেন। এই বাণাসুর ছিল শিব ও দুর্গার খুব বড় ভক্ত। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে বাণাসুরকে দণ্ড দিচ্ছিলেন, তখন শিব ও দুর্গা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতে ভ্রূক্ষেপও করেননি।

## তেজ

যিনি সকলের চিত্ত প্রভাবিত করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় তেজস্বী। শ্রীকৃষ্ণের তেজ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৪৩/১৭) শুকদেব

গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন, "হে রাজন! মল্লদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর, সাধারণ মানুষের কাছে নরশ্রেষ্ঠ, রমণীদের কাছে মূর্তিমান কামদেব, গোপ-গোপিকাদের কাছে পরম আত্মীয়, আসুরিক রাজাদের কাছে পরম দণ্ডদাতা শাসক, নন্দ ও যশোদা মায়ের কাছে একটি শিশু, ভোজরাজ কংসের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যু, মন্দমতি মূর্খের কাছে পাষাণ, যোগীদের কাছে পরতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদের কাছে পরমেশ্বর ভগবান। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে মল্লযুদ্ধের স্থানে উপস্থিত হলেন।" সমস্ত রসের আধার শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, তখন বিভিন্ন মানুষ তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন রস অনুসারে তাঁকে ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শন করেছিলেন। *ভগবদ্গীতাতেও* তিনি বলেছেন যে, তিনি জীবের কাছে প্রকাশিত হন তাঁর প্রতি তাদের সম্বন্ধ অনুসারে।

কখনও কখনও বিদ্বানরা বলেন, 'তেজ' বা 'প্রভাব' মানে হচ্ছে অনাদর সহ্য করতে অসামর্থ্য। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়, যখন কংস নন্দ মহারাজকে অপমান করছিল। কংসকে বধ করার জন্য বসুদেব যখন কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন, কৃষ্ণ তখন বারবনিতার মতো আকাঙ্ক্ষাযুক্ত দৃষ্টিতে কংসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলেন।

## ললিত

যিনি শৃঙ্গার করতে অত্যন্ত নিপুণ, তাঁকে বলা হয় ললিত। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই গুণটি দুটিভাবে দেখা যায়—কখনও কখনও তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গকে সাজান, এবং কখনও কখনও অরিষ্ট আদি অসুরদের বধ করতে উদ্যত হওয়ার সময় তিনি খুব মনোরমভাবে তাঁর কোমরবন্ধনী বেঁধে নেন।

## উদার

যিনি যে কারও কাছে নিজেকে সর্বতোভাবে বিলিয়ে দিতে পারেন, তাঁকে বলা হয় উদার। শ্রীকৃষ্ণের থেকে অধিক উদার আর কেউ হতে পারে না। তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করতে তৎপর। এমন কি যাঁরা ভক্ত নন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তাদের কাছে পর্যন্ত তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তাদের মুক্ত করেছেন।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র, কিন্তু তবুও তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ধর্ম উপদেশ লাভ করার জন্য তিনি গর্গ মুনির উপর নির্ভর করেছিলেন, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য সাত্যকির উপর নির্ভর করেছিলেন এবং সৎ পরামর্শের জন্য তাঁর সখা উদ্ধবের উপর নির্ভর করেছিলেন।

# পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

# কৃষ্ণভক্ত

যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত, তাঁকে বলা হয় কৃষ্ণভক্ত। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, পূর্বে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত দিব্য গুণগুলি কৃষ্ণভক্তের মধ্যেও দেখা যায়। কৃষ্ণভক্তদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—যাঁরা দিব্যধামে প্রবেশ করার জন্য ভগবদ্ভক্তির সাধন করেন, এবং যাঁরা ইতিমধ্যেই ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন।

যাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির উদয় হয়েছে এবং জড়-জাগতিক অনর্থগুলি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারলেও যিনি ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁকে সাধক বলা হয়। *সাধক* কথাটির অর্থ হচ্ছে যিনি কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২/৪৬) এই ধরনের ভক্তের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভগবানের প্রতি যিনি অনন্য ভক্তিপরায়ণ, ভগবদ্ভক্তের প্রতি যিনি মৈত্রী ভাবাপন্ন, অজ্ঞানদের যিনি ভক্তিমার্গে নিয়ে এসে কৃপা করেন এবং ভগবৎ-বিদ্বেষীদের উপেক্ষা করেন, তিনিই হচ্ছেন ভগবদ্ভক্তির সাধক।

কেউ যখন ভগবানের লীলা শ্রবণ করে অশ্রু বিসর্জন করেন, তখন বুঝতে হবে যে, এই জলধারার প্রভাবে ভব-মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়ে যাবে। যাঁর শরীর পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়, তিনি অচিরেই সিদ্ধিলাভ করবেন বলে বুঝতে হবে। সাধক-ভক্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে যাঁর কোন রকম পরিশ্রম অনুভব হয় না এবং যিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কার্যকলাপে যুক্ত থেকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিরন্তর অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেন, তাঁকে বলা হয় সিদ্ধ। এই সিদ্ধ অবস্থা দুভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়—ভগবদ্ভক্তির সাধন দ্বারা ধীরে ধীরে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধের অনুশীলন না করেই শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/১৫/২৫) নিয়মিতভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার ফলে ভক্তের সিদ্ধি লাভের বর্ণনা রয়েছে—"জড় অস্তিত্বের মিথ্যা অহঙ্কার থেকে মুক্ত পুরুষ অথবা উন্নত স্তরের যোগী বৈকুণ্ঠ নামক

ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারেন। এই ধরনের যোগী বৈধীভক্তির নিরন্তর আচরণ করে অত্যন্ত উৎফুল্ল হন এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেন। যমরাজ এই ধরনের ভক্তের কাছে যেতেও ভয় পান।" সুতরাং এর থেকে আমরা উত্তম ভক্তের শক্তি অনুমান করতে পারি, বিশেষ করে ভক্তরা যখন একত্রিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা আলোচনা করেন। সেই সমস্ত ভক্তরা এমনভাবে তাঁদের অন্তরের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন যে, আপনা থেকেই তাঁদের হৃদয় দিব্য আনন্দে দ্রবীভূত হয় এবং তাদের শরীরে নানা রকম দিব্য লক্ষণ দেখা যায়। যে মানুষ ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধনে অভিলাষী, তাকে এই ধরনের ভক্তদের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, উত্তম ভক্তদের পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত না হলে ভক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। মার্কণ্ডেয় ঋষির মতো তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরাও বৈধীভক্তি অনুশীলন করে ভক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

কৃপাসিদ্ধির উদাহরণ হচ্ছেন *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত যজ্ঞপত্নীরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ব্রাহ্মণ-পত্নীদের ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হতে দেখে ব্রাহ্মণেরা পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করেছিলেন, "কী আশ্চর্যের বিষয়! এই মহিলারা উপনয়ন সংস্কার ব্যতীত, গুরুকুলে বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত, ব্রহ্মচর্য, তপ, ত্যাগ, মীমাংসা, শৌচ অথবা শুভকর্মের আচরণ না করেই, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে মহাযোগীদেরও দুর্লভ সুদৃঢ় ভক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। আর আমরা ব্রাহ্মণেরা যদিও নানা রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছি, তবুও আমরা তা লাভ করতে পারিনি!"

নারদ মুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে সম্বোধন করেছেন, "হে শুকদেব! তুমি কখনও গুরুর কাছে বিদ্যা অধ্যয়ন করনি, কিন্তু তবুও তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছ। তুমি কখনও কঠোর তপস্যা করনি, তবুও কী আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি ভগবৎ-প্রেমের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছ!"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও যজ্ঞপত্নীরা হচ্ছেন কৃপাসিদ্ধ ভক্তের প্রতীক।

## নিত্যসিদ্ধ

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মতো সৎ, চিৎ, আনন্দ আদি গুণ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যাঁরা প্রেমপূর্ণ সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারেন, তাঁদের বলা হয় নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। জীব দুই প্রকারের—নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ জীব কখনও ভগবানকে ভুলে না গিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকেন, আর নিত্যবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে।

*পদ্ম-পুরাণে* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা সংবাদে নিত্যসিদ্ধ অবস্থার বিবরণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলেছেন, "হে সত্যভামা দেবী! ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে আমি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছি। যারা যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা সকলেই আমার নিত্য পার্ষদ। প্রিয়ে! আমার পার্ষদেরা কখনও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; তারা আমারই প্রকাশ এবং তারা প্রায় আমার মতোই শক্তিশালী। তাদের দিব্য গুণাবলীর জন্য তারা যেমন আমার অত্যন্ত প্রিয়, ঠিক তেমনই আমিও তাদের অত্যন্ত প্রিয়।" যিনি এই ধরাধামে অবস্থানকালে পার্ষদ সহ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস শ্রবণ করে উৎফুল্ল হন, তিনি অবশ্যই নিত্যসিদ্ধ।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৪/৩২) বলা হয়েছে, "আহা! নন্দগোপ আদি বৃন্দাবনবাসীরা কী পরম সৌভাগ্যবান! পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের পরম আত্মীয়রূপে লীলা বিলাস করছেন!"

এই রকম আর একটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২৬/১০) শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন ধারণলীলা সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেন, তখন তাঁর আশ্রিত গোপেরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে নন্দ মহারাজকে প্রশ্ন করেন, "হে মহারাজ নন্দ! কৃষ্ণের প্রতি আমরা যে এত গভীরভাবে অনুরক্ত এবং সেও যে আমাদের প্রতি এইভাবে অনুরক্ত, তার কারণ কি? তার অর্থ কি এই নয় যে, তিনি হচ্ছেন সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা?"

সমস্ত ব্রজবাসী ও দ্বারকাবাসীরা অর্থাৎ গোপেরা ও যদুবংশীয়রা—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। ভগবান যেমন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জগতে অবতরণ করেন, তেমনই তাঁর লীলায় সহায়তা করার জন্য এই সমস্ত ভক্তরাও তাঁর সঙ্গে এখানে আসেন। তাঁরা সাধারণ জীব নন অথবা বদ্ধ জীব নন; তাঁরা সকলেই নিত্যমুক্ত ভগবৎ-পার্ষদ। এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান যেমন একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন, তেমনই ব্রজবাসী ও যাদবেরাও ঠিক সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরাও সাধারণ মানুষ নন; তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মতোই মুক্ত।

*পদ্ম-পুরাণের* উত্তর খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে, "রামচন্দ্র যেমন সঙ্কর্ষণের অংশ লক্ষ্মণ ও প্রদ্যুম্নের অংশ ভরত সহ অবতরণ করেন, তেমনই যদুবংশীয়রা ও বৃন্দাবনের গোপেরাও শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলায় অংশগ্রহণ করবার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতরণ করেন। পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে তাঁর ধামে ফিরে যান, তাঁর পার্ষদেরাও তখন তাঁর সঙ্গে তাঁদের স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। আমাদের সব সময়ই মনে রাখা উচিত, তাঁরা কখনই জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা বদ্ধ জীব নন, তারা সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

*ভগবদ্গীতায়* ভগবান নিজেই বলেছেন যে, তাঁর জন্ম ও সমস্ত কার্যকলাপ দিব্য। তেমনই তাঁর পার্ষদদের জন্ম-কর্মও দিব্য। নিজেকে কৃষ্ণ বলে মনে করা যেমন অপরাধ, তেমনই নিজেকে যশোদা, নন্দ অথবা অন্য কোন ভগবৎ-পার্ষদ বলে মনে করাও অপরাধ। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা নিত্যমুক্ত; কোন অবস্থাতেই তাঁরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ নন।

শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কংসের অরি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ৬৪টি দিব্য গুণ রয়েছে এবং যে সমস্ত নিত্যমুক্ত জীব তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম ৫৫টি রয়েছে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই ধরনের ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য—এই পাঁচটি রসের যে কোনও একটি রসের দ্বারা সম্পর্কিত। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁদের এই সম্পর্ক নিত্য, এবং তাই নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের বৈধী ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে তাঁরা সর্বতোভাবে যোগ্য।

# ষড়বিংশতি অধ্যায়

# প্রেমের উদ্দীপন

যা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম উদ্দীপ্ত করে, তাকে উদ্দীপন বিভাব বলা হয়। যেমন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যগুণ, অসাধারণ কার্যকলাপ, তাঁর হাস্যোজ্জ্বল অবয়ব, তাঁর বস্ত্র, মালা, বংশী, শৃঙ্গ, তাঁর পায়ের নূপুর, তাঁর শঙ্খ, তাঁর পদচিহ্ন, বৃন্দাবন আদি লীলাস্থল, তাঁর প্রিয়া তুলসী, তাঁর ভক্ত এবং তাঁকে স্মরণ করার বিশেষ বিশেষ দিবস। তাঁকে স্মরণ করার একটি দিন হচ্ছে একাদশী, মাসে দুবার শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে এই একাদশী তিথির আবির্ভাব হয়। সেই দিন ভক্তরা অহোরাত্র উপবাস করে নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন।

## শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী, তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপ ও মধুর হাস্য

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কায়িক, বাচিক ও মানসিক।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স, তাঁর দিব্য শ্রীঅঙ্গ, তাঁর সৌন্দর্য ও তাঁর মৃদুতা হচ্ছে তাঁর কায়িক গুণ। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শ্রীঅঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। তাই তাঁর কায়িক গুণ সাক্ষাৎ তাঁরই স্বরূপ। কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত গুণগুলি ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের উদ্দীপন করে, তাই তাদের প্রেমের বিভিন্ন কারণ বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার অর্থ শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া, কেন না শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গুণাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণের নাম, শ্রীকৃষ্ণের যশ, শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ—সবই শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই যা কৃষ্ণপ্রেম উদ্দীপ্ত করে, তা সবই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু আমাদের বোধগম্য করার জন্য এই সমস্ত বিষয়গুলি আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দিব্য আনন্দের আলম্বন। তাই কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপক বস্তুগুলি ভিন্ন বলে প্রতিপন্ন হলেও বাস্তবে তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নাম, যশ, গুণ আদি কৃষ্ণপ্রেমের আলম্বন ও উদ্দীপন উভয় রূপেই প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাঁর আবির্ভাব থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবস্থাকে বলা হয়

কৌমার, ছয় থেকে দশ বৎসর বয়সকে বলা হয় পৌগণ্ড, এবং একাদশ থেকে পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত বয়সকে বলা হয় কৈশোর। ষোড়শ বৎসর থেকে শ্রীকৃষ্ণ যৌবনে প্রবেশ করেন, তারপর তাঁর বয়সের কোন পরিবর্তন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রধানত কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর অবস্থাতে সম্পাদিত হয়। নন্দ-যশোদার সঙ্গে তাঁর বাৎসল্য রসময়ী লীলা কৌমার অবস্থায় প্রকাশিত হয়। গোপবালকদের সঙ্গে সখ্যরসের প্রকাশ পৌগণ্ড অবস্থাতে এবং গোপবধূদের সঙ্গে তাঁর প্রেমবিলাস কৈশোর অবস্থায় প্রকাশিত হয়। পঞ্চদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করেন এবং তারপর তিনি মথুরা ও দ্বারকায় লীলাবিলাস করতে যান।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী অখিল রসের আশ্রয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের বিশদ বর্ণনা করেছেন, যা আংশিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর অবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—আদ্য, মধ্য ও শেষ কৈশোর। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর শুরু হওয়ার পর, অর্থাৎ এগারো বছর বয়সে তাঁর শ্রীঅঙ্গ এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, তার ফলে প্রেমের উদ্দীপন হয়। তেমনই, তাঁর নয়নযুগল তখন আরক্তিম হয় এবং তাঁর শ্রীঅঙ্গে রোমাবলী দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণের এই আদি কৈশোরের বর্ণনা করে বৃন্দাবনে কুন্দলতা তাঁর সখীকে বলছেন, "হে সখী! আমি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে এক অসাধারণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হতে দেখেছি। তাঁর শ্যাম অঙ্গকান্তি ঠিক ইন্দ্রনীল মণির মতো, তাঁর চোখ দুটি ঈষৎ আরক্তিম, তাঁর দেহে কোমল রোমরাজি উদিত হচ্ছে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি তাঁকে অপূর্ব সুন্দর করে তুলেছে।"

এই সম্পর্কে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২১/৫) শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন, "হে রাজন! ব্রজগোপিকাদের মন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। নটবর বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণচিহ্নের দ্বারা ভূমি অঙ্কিত করতে করতে বনে প্রবেশ করেন, আর তাঁরা তাঁর সেই রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। মাথায় শিখিপুচ্ছ, কর্ণযুগলে কুণ্ডল ও পীতবসন পরিহিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান তাঁরা করতেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনকারী গোপসখা পরিবৃত এবং বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানও করতেন।" গোপিকারা নিরন্তর এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতেন।

কখনও কখনও গোপিকারা তাঁর নখাগ্রের কোমলতা, তাঁর চঞ্চল ভ্রূযুগল ও তাম্বূল রাগে রঞ্জিত দন্তাবলীর ধ্যান করতেন। জনৈকা গোপী তাঁর সখীকে বললেন, "হে সখী! দেখ, অঘারি কী অভিনব সৌন্দর্য ধারণ করেছেন, তাঁর ভ্রূযুগল ঠিক কামদেবের বাণের মতো এবং তারা যেন নিরন্তর নৃত্য করছে। তাঁর

নখাগ্র শুষ্ক বংশপত্রের মতো কোমল। তাঁর দন্তপঙ্‌ক্তি আরক্তিম এবং তা দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন ক্রুদ্ধ হয়েছে। কোন্ যুবতী তাঁর এই রূপে আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে? কোন্ যুবতী এই সৌন্দর্যের কাছে সর্বস্ব হারাবার ভয়ে ভীত না হয়ে থাকতে পারে?"

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরীর বর্ণনা স্বয়ং বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী গোপী বৃন্দাদেবীও করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে মাধব, তোমার অভিনব স্মিত হাসি এমনভাবে গোপিকাদের হৃদয় হরণ করেছে যে, তারা আর তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারছে না। তারা এত মুগ্ধ হয়ে গেছে যে, তারা আর কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছে না, যেন তারা তাদের প্রাণ ধারণের আশা জলাঞ্জলি দিয়েছে। তোমাকে দর্শন করে তারা যেন তাদের বেঁচে থাকার সমস্ত আশা ত্যাগ করেছে।" বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে মৃত ব্যক্তির শরীরে অঞ্জলি ভরে জল ছেটানো হয়। বৃন্দাদেবীর এই উক্তির অভিপ্রায় হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুরীতে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গোপিকারা তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারছিলেন না, তাই তাঁরা আত্মহত্যা করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মধ্য-কৈশোরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর ঊরুদ্বয়, বাহুদ্বয়, ও বক্ষঃস্থল এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ধারণ করে এবং তাঁর সেই রূপ পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণের ঊরুদ্বয় যেন হাতির শুঁড়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে, তাঁর উন্নত বক্ষ মণিরত্ন খচিত কপাটের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে, এবং তাঁর বাহুযুগল অর্গলকে তিরস্কার করে। শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত রূপমাধুরীর বর্ণনা কে করতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের বিশেষ সৌন্দর্য হচ্ছে তাঁর মৃদু হাস্য, তাঁর চঞ্চল নেত্রদ্বয় এবং তাঁর ত্রিভুবন বিমোহিনী গীত। এইগুলি এই বয়সের বিশিষ্ট লক্ষণ।

এই সম্বন্ধে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই বয়সে পদার্পণ করার পর, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এমন এক অপূর্ব রূপের বিকাশ হয়েছিল যেন তাঁর চঞ্চল নেত্র কামদেবের ক্রীড়াস্থলী হয়ে উঠেছিল, আর তাঁর স্মিত হাস্য নব-বিকশিত পদ্মের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনোহর সঙ্গীতের ধ্বনি যুবতীদের পাতিব্রত্য ধর্মের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল।

এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করে যমুনার তীরে কুঞ্জবনে রাসলীলা বিলাস করেন।

সেই সম্বন্ধে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "বৃন্দাবন নামক ধামের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের চরণচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। কোথাও ময়ূরের পুচ্ছ ছড়িয়ে রয়েছে, কোথাও কুঞ্জবনের লতাবিতানে সুন্দর শয্যা বিছানো রয়েছে, এবং কোথাও

আবার গোপিকাদের সঙ্গে গোবিন্দের নৃত্য করার ফলে ধূলি জমে আছে।" এগুলি বৃন্দাবন নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কতকগুলি দৃষ্টান্ত।

এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণের বর্ণনা করে জনৈকা গোপী বলেছেন — "হে সখী! দেখ কিভাবে অকস্মাৎ হৃদয়রূপ গগনে মাধুর্য প্রবাহরূপে প্রচণ্ড সূর্যের উদয় হয়েছে, যা আমাদের পাতিব্রত্য ধর্মরূপী চন্দ্রকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এতই প্রবল যে, তা আমাদের বিবেকরূপী কমলকে শুষ্ক করে দিচ্ছে, এখন আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমরা কি আমাদের সতীত্ব বজায় রাখব, না শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের শিকার হব। হে সখী! আমার মনে হয়, আমার যেন আর বেঁচে থাকার কোন আশা নেই!"

একাদশ বর্ষের প্রারম্ভ থেকে পঞ্চদশ বর্ষের শেষ পর্যন্ত কৈশোর অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগল, পদযুগল ও ঊরুদ্বয়ে তিনটি বিশিষ্ট রেখা দেখা যায়। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল মরকত মণির পর্বতের শোভাকে তিরস্কার করে, তাঁর বাহুযুগল ইন্দ্রনীল মণির স্তম্ভকে তিরস্কার করে। তাঁর কটিদেশের ত্রিবলী রেখা যমুনার ঢেউকে লজ্জা দেয় এবং তাঁর ঊরুদ্বয় কদলীবৃক্ষের সৌন্দর্যকে তিরস্কার করে। জনৈকা গোপী বলেন, "তাঁর শ্রীঅঙ্গের সেই অপূর্ব সুন্দর রূপ কৃষ্ণকে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে এবং তাই আমি নিরন্তর তাঁর ধ্যান করছি যাতে তিনি আমাকে রক্ষা করেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত অসুরদের নিধনকারী।"

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ অসুরদের আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করেছেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রতি তাঁদের এই আকর্ষণ উপশম করার জন্য তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিলেন, কেন না তিনি হচ্ছেন সমস্ত অসুরদের হন্তা। তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কেন না তাঁরা একে তো শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং দ্বিতীয়ত, এই আকর্ষণরূপী অসুরের হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণই কেবল তাঁদের উদ্ধার করতে পারতেন।

শ্রীকৃষ্ণের শেষ কৈশোর সম্বন্ধে গোপিকারা বলেন, "কৃষ্ণ কামদেবের আকর্ষণের হন্তা, আর তিনি নববধূদের ধৈর্য বিচলিত করেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গ এমনই সৌন্দর্য ধারণ করেছে যে, তা দেখে মনে হচ্ছে তা যেন সর্বোচ্চ কলাবিলাস। তাঁর নৃত্যরত আঁখিযুগল সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তককে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে, এবং তাই কৃষ্ণের সৌন্দর্যের কোন তুলনা করা যায় না।" বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই বয়সে তাঁর দেহসৌষ্ঠবকে নবযৌবন বলে বর্ণনা করেন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য, ব্রজ-গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর মাধুর্য লীলাবিলাস এবং তদনুগ লীলাগুলি অতিশয় প্রাধান্য লাভ করে।

কুঞ্জনৃপতি শ্রীকৃষ্ণ নীতিশাস্ত্র বর্ণিত ষড়গুণ (সন্ধি, বিরহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব) সহকারে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গাররাজ্য শাসন করছেন। তিনি কখনও কান্তাদের সঙ্গে কলহ (বিরহ) করেন, কখনও শুক পাখিদের দ্বারা কন্দর্প লেখা পাঠান (দ্বৈধ), কখনও অভিসারে উদ্যম করেন (যান), কখনও সখীদ্বারা 'আশ্রয়' গ্রহণ করেন, আবার কোন সময় 'সন্ধি' করেন (কুঞ্জনৃপতি পদ হচ্ছে 'আসন')।

কোন গোপী তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার কৈশোর বয়সের প্রভাবে তুমি সমস্ত যুবতী রমণীর গুরু হয়েছ এবং তুমি তাদের কানাকানি করতে শিক্ষা দিচ্ছ। তুমি তাদের পতিদের প্রতারণা করে, গুরুজনদের উপদেশ অবজ্ঞা করে, গভীর রাত্রে কুঞ্জবনে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে শিক্ষা দিচ্ছ। তোমার মধুর মুরলীধ্বনির দ্বারা তুমি তাদের অনুপ্রাণিত কর, আর তাদের গুরুরূপে তুমি তাদের প্রেমবিলাসের রহস্য শিক্ষা দাও।"

যদিও শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ বছর বয়সেই এই নবযৌবন প্রকট করেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত বয়স না হওয়ার ফলে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা তার বিশ্লেষণ করেননি। শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত, কেন না তাঁর শ্রীবিগ্রহের প্রতিটি অঙ্গই নিখুঁত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "হে কংসারি! তোমার আয়ত-নয়ন, উন্নত বক্ষ, স্তম্ভসদৃশ তোমার বাহুযুগল এবং তোমার কটিদেশ নিরন্তর প্রতিটি কমলনয়না সুন্দরী যুবতীকে মুগ্ধ করে।" শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারগুলি তাঁর শোভাবর্ধন করে না—পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য অলঙ্কারগুলিকে বিভূষিত করে।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত কোমল স্পর্শও সহ্য করতে পারে না, তাকে বলা হয় মৃদু। বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ এত কোমল যে, নবীন পল্লবের স্পর্শেও তাঁর বর্ণ পরিবর্তিত হয়। এই কৈশোর বয়সে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রচেষ্টা বৃন্দাবনের বনে রাসোৎসব এবং অসুর সংহারের জন্য নিয়োজিত হত। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের বনে গোপবালক ও গোপবালিকাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন, তখন কংস তার অনুচরদের পাঠাত শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাদের সংহার করে তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করতেন।

## শ্রীকৃষ্ণের পরিধান ও মালা

শ্রীকৃষ্ণের দেহে সাধারণত চার প্রকার পরিধান থাকে—কুর্তা, উষ্ণীষ, কটিবন্ধ ও ধুতি। বৃন্দাবনে তিনি রক্তিম বসন, সোনালী কুর্তা আর কমলা রঙের উষ্ণীয় ধারণ করতেন। তাঁর বিভিন্ন কোমরবন্ধ তাঁর মনোমুগ্ধকর হাসির সঙ্গে

মিলিত হয়ে নিরন্তর তাঁর সঙ্গীদের অপ্রাকৃত আনন্দ বর্ধন করত। শ্রীকৃষ্ণের এই বেশভূষাকে অত্যন্ত চমৎকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গজশিশু যেমন কখনও কখনও নানা রঙে রাঙান পরিধানে সুশোভিত হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র শোভা পেত।

শ্রীকৃষ্ণের কেশরাশি, চন্দনচর্চিত ফুলমালায় শোভিত সুন্দর পোশাক পরিহিত তাঁর শ্রীঅঙ্গ, তাঁর তিলক ও তাঁর তাম্বূল-চর্বণকে *আকল্প* বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের মধ্যভাগে কখনও কখনও ফুল গোঁজা থাকে, আর তাঁর চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত এলিয়ে থাকে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কেশবিন্যাস করেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গের চন্দনের প্রলেপ সাধারণত সাদা, আর তা যখন জাফরান মিশ্রিত হয়, তখন তার রঙ হয়ে যায় হলুদ।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করেন। বৈজয়ন্তী মালা অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন রংয়ের ফুল দিয়ে তৈরি হয়। এই মালা সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের জানু অথবা চরণ স্পর্শ করে। এই মালা ছাড়া অন্য কোন ফুলের মালাও কখনও তাঁর মস্তকে শোভা পায়—কখনও বা তাঁর গলদেশ ও বক্ষঃস্থল বেষ্টন করে বিরাজ করে। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে চন্দনের ফোঁটা আর নানা রঙে রাঙানো চন্দনের গুঁড়ো দিয়ে নানা রকম সুচারু কারুকার্য আঁকা থাকে।

জনৈকা গোপী তাঁর এক সখীর কাছে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের প্রশংসা করছিলেন। তিনি তাঁর ঘনশ্যাম অঙ্গকান্তি, তাম্বূলচর্চিত রক্তিম ওষ্ঠাধর, যা তাঁর সৌন্দর্য শতগুণে বর্ধিত করেছিল, তাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি, তাঁর শ্রীঅঙ্গে কুমকুমের ফোঁটা এবং তাঁর কপালে তিলক—এই সব সৌন্দর্যের প্রশংসা করছিলেন।

তাঁর কিরীট, কুণ্ডল, কণ্ঠহার, তাঁর চতুর্বিধ পরিধান, তাঁর মাথায় বলয়, তাঁর অঙ্গুরীয়, তাঁর পায়ের নূপুর ও তাঁর বাঁশি—এগুলি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অলঙ্কার। অতুলনীয় কিরীট, হীরকখচিত কুণ্ডল, মুক্তার কণ্ঠহার, তাঁর হাতের বালা, তাঁর নক্‌শাকাটা বস্ত্র ও সুন্দর অঙ্গুরীয় দ্বারা শোভিত হয়ে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণকে কখনও কখনও বনমালী বলা হয়। ফুল ও মালায় তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ বিভূষিত থাকে বলে, তাঁকে বনমালী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ কেবল বৃন্দাবনেই এই রকম বেশভূষায় সজ্জিত ছিলেন না, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেও তিনি এইভাবে সজ্জিত ছিলেন। তাঁর বহুবর্ণ বসন ও বিভিন্ন ফুল দিয়ে গাঁথা মালা দর্শন করে সমবেত মহর্ষিরা প্রার্থনা করেন, "শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করবার জন্য কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যাচ্ছিলেন না, তাঁর উপস্থিতির দ্বারা সমস্ত ভক্তদের কৃপা করবার জন্য তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন।"

## শ্রীকৃষ্ণের বংশী

শ্রীকৃষ্ণের বংশী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সেই অদ্ভুত যন্ত্রটির ধ্বনি মহর্ষিদেরও ধ্যান ভঙ্গ করে দিতে পারে। এইভাবে সমগ্র জগতে তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা ঘোষণা করে, শ্রীকৃষ্ণ কামদেবকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন।

শ্রীকৃষ্ণ তিন প্রকারের বাঁশি ব্যবহার করেন। তার একটিকে বলা হয় বেণু, অন্যটি মুরলী এবং তৃতীয়টি বংশী। বেণু অত্যন্ত ছোট, তা ছয় ইঞ্চির বেশি দীর্ঘ নয়, এবং তাতে ছয়টি ছিদ্র থাকে। মুরলীর দৈর্ঘ প্রায় আঠার ইঞ্চি। তার একপ্রান্তে একটি ছিদ্র থাকে এবং তার গায়ে চারটি ছিদ্র থাকে। এই মুরলী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর সুর সৃষ্টি করে। বংশী প্রায় পনের ইঞ্চি লম্বা, এবং তাতে নয়টি ছিদ্র থাকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন অনুসারে এই তিন রকমের বাঁশি বাজান। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি বংশী আছে যা আরও লম্বা, যাকে বলা হয় মহানন্দ বা সম্মোহিনী। তা যখন তার থেকেও লম্বা হয়, তখন তাকে বলা হয় আকর্ষণী। তা যখন তার থেকে আরও লম্বা হয়, তখন তাকে বলা হয় আনন্দিনী। এই আনন্দিনী বংশীধ্বনি গোপবালকদের অত্যন্ত প্রিয়। এর আর একটি নাম বংশুলী। এই বাঁশিগুলি কখনও কখনও মণিরত্ন খচিত থাকে, কখনও তা মর্মর দিয়ে তৈরি হয় এবং কখনও কখনও বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। বাঁশি যখন মণিরত্ন দিয়ে তৈরি হয়, তখন তাকে বলা হয় সম্মোহিনী। আর যখন তা স্বর্ণ দিয়ে তৈরি হয়, তাকে বলা হয় আকর্ষণী।

## শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ মহিষের শিঙকে শৃঙ্গরূপে ব্যবহার করেন। এই যন্ত্রটি সর্বদাই খুব সুন্দর করে পালিশ করা থাকে এবং তা সোনার পাত দিয়ে বাঁধান থাকে এবং তার মাঝে একটি ছিদ্র থাকে। এই যন্ত্রটি নিয়ে তারাবলী নামক গোপিকার সম্বন্ধে একটি রূপকাত্মক উক্তি রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরূপ পরম বিষধর সর্প তারাবলীকে দংশন করেছিল। তখন সেই বিষ নিরসন করবার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের হাতের শৃঙ্গ থেকে নিঃসৃত দুগ্ধ পান করেন। কিন্তু তার ফলে বিষক্রিয়ার উপশম না হয়ে তা সহস্রগুণে বর্ধিত হয়। এইভাবে গোপিকারা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন।

## শ্রীকৃষ্ণের নূপুরের আর্কষণ

জনৈকা গোপিকা তাঁর সখীকে বলেন, "হে সখী! আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনি, তৎক্ষণাৎ আমি তাঁকে দেখবার জন্য বাড়ি থেকে

বেরিয়ে আসি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমার গুরুজনেরা তখন আমার সামনে ছিলেন এবং তাই আমি বাইরে যেতে পারিনি।"

## শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ

শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। *ভগবদ্গীতাতেও* এই পাঞ্চজন্য শঙ্খের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ এই শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর এই দিব্য শঙ্খে ফুৎকার করেন, তখন অসুর-পত্নীদের গর্ভপাত হয়, এবং সুর-পত্নীরা সমস্ত মঙ্গলময় আশীর্বাদের দ্বারা পুষ্ট হন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি সমস্ত জগৎ জুড়ে স্পন্দিত হয়।

## শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন

*শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে, অক্রূর যখন কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আসেন, তখন বৃন্দাবনের সর্বত্র তিনি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করেন। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেম এতই বর্ধিত হয় যে, তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তাঁর নয়নযুগল অশ্রুধারায় প্লাবিত হয় এবং আনন্দের আতিশয্যে তিনি রথ থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন, "কী অপূর্ব! কী অপূর্ব!"

যমুনায় যাওয়ার পথে মাটিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে গোপিকারাও এই রকম ভাব ব্যক্ত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের ভূমিতে পদক্ষেপ করতেন, তখন সেখানে তাঁর পায়ের চিহ্ন—ধ্বজ, বজ্র, মীন, অঙ্কুশ ও পদ্ম অঙ্কিত হত। ভূমিতে সেই চিহ্নগুলি দর্শন করে গোপিকারা গভীরভাবে অভিভূত হতেন।

## শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী

এক ভক্ত বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেন, "হায়! যে সমস্ত স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলাবিলাস করেছেন, সেই স্থানগুলি আমি এখনও দর্শন করিনি। কিন্তু কেবল মথুরা নামটি শোনা মাত্রই আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছি।"

## শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া তুলসী

তুলসীপত্র ও মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। যেহেতু তুলসী মঞ্জরী সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে নিবেদন করা হয়, তাই এক ভক্ত তুলসী মঞ্জরীর কাছে প্রার্থনা করেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সংবাদ যেন তিনি তাঁকে দেন। সেই

ভক্তটি আশা করেছিলেন যে, তুলসী মঞ্জরী নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম সম্বন্ধে অবগত আছেন।

## কৃষ্ণভক্ত

কখনও কখনও কোন ভগবদ্ভক্তকে দেখে মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। ধ্রুব মহারাজ যখন নারায়ণের দুই পার্ষদকে তাঁর কাছে আসতে দেখেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐকান্তিক শ্রদ্ধাভরে ও ভক্তিভরে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং করজোড়ে তাঁদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু তাঁদের দেখে ভগবৎ-প্রেমে এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁদের যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করতে অসমর্থ হন।

জনৈকা গোপী শ্রীকৃষ্ণের সখা সুবলকে বলেন, "হে সুবল! আমি জানি যে, কৃষ্ণ হচ্ছে তোমার সখা এবং তুমি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করার আনন্দ উপভোগ কর। সেদিন আমি দেখছিলাম যে, তোমরা দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার বাহু কৃষ্ণের গলদেশ বেষ্টন করে ছিল এবং তোমরা দুজনেই আনন্দোচ্ছল হয়ে হাসছিলে। একটু দূর থেকে তোমাদের দুজনকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, আমার চক্ষুদ্বয় তৎক্ষণাৎ অশ্রুপ্লাবিত হয়।"

## শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের বিশেষ দিন

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার সঙ্গে সম্বন্ধিত মহোৎসবের দিনগুলির অনেক উল্লেখ আছে। সেই রকমই একটি মহোৎসবের দিন হচ্ছে জন্মাষ্টমী—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি। ভক্তদের কাছে এই জন্মাষ্টমী হচ্ছে সব চাইতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত মহোৎসব এবং ভারতবর্ষের প্রতিটি হিন্দুর গৃহে আজও মহা সমারোহে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। কখনও কখনও অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভক্তরাও এই মঙ্গলময় মহোৎসবে যোগদান করে গভীর আনন্দে মগ্ন হন। একাদশী আদি কৃষ্ণবাসরেও কৃষ্ণপ্রেম উদ্দীপ্ত হয়।

## সপ্তবিংশতি অধ্যায়

# ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ

কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করে ভক্তের শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় অনুভাব। অনুভাবের বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছে—নাচা, ভূমিতে লুটানো, উচ্চৈঃস্বরে গান করা, আড়মোড়া দেওয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা, হাই তোলা, দীর্ঘশ্বাস ফেলা, অন্যের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করা, মুখ থেকে লালা ঝরা, উন্মাদের মতো অট্টহাস্য করা, মাথা ঘোরা ও হিক্কা তোলা। এই সমস্ত লক্ষণ সব যখন ভগবৎ-প্রেমের আতিশয্য দেখা দেয়, তখন দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়।

এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে শীত ও ক্ষেপণ। হাই তোলা আদি লক্ষণগুলিকে বলা হয় শীত এবং নৃত্য আদি লক্ষণগুলিকে বলা হয় ক্ষেপণ।

### নৃত্য করা

গোপীদের সঙ্গে রাস-নৃত্যরত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যভঙ্গি দর্শন করে শিব ডিম্ ডিম্ রবে ডমরু বাজাতে বাজাতে নৃত্য করতে শুরু করেন। দেবাদিদেব মহাদেবকে এইভাবে আনন্দমগ্ন হয়ে নৃত্য করতে দেখে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশও তাঁর সঙ্গে নাচতে শুরু করেন।

### ভূমিতে লুটানো

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে (৩/১/৩২) বিদুর উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে সখে! অক্রুর কুশলে আছেন তো? তিনি কেবল একজন নিষ্পাপ মহাপণ্ডিতই নন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত। আমি নিজে দেখেছি যে, কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন অঙ্কিত ভূমিতে লুটিয়েছিলেন।" তেমনই কোন একজন গোপিকা শ্রীকৃষ্ণকে এসে বলেন যে, তাঁর বিরহে কাতর হয়ে এবং তাঁর গলার মালার সুগন্ধে মত্ত হয়ে, তাঁর প্রতি অতিশয় অনুরাগবতী রাধারাণী কঠিন ভূমিতে লুটিয়ে লুটিয়ে তাঁর কোমল শরীরকে আহত করছেন।

## উচ্চৈঃস্বরে গান করা

একজন গোপিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর মহিমা কীর্তন করছেন। তাঁর সেই কীর্তন শুনে সখীরা এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তাঁরা পাথরের মতো জড় ও অচেতন হয়ে পড়েছেন। আর সেখানকার পাষাণগুলি সেই প্রেমে গলে যাচ্ছে।

নারদ মুনি যখন 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করছিলেন, তখন তিনি এত উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করছিলেন যে, তা শুনে মনে হচ্ছিল যেন নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছেন। তখন সমস্ত অসুরেরা চতুর্দিকে পালাতে শুরু করে।

## আড়মোড়া দেওয়া

উল্লেখ আছে যে, কখনও কখনও উদাসী নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে গভীর আবেগে এমন ভাবে দেহে আড়মোড়া দেন যে, তাঁর যজ্ঞোপবীত ছিঁড়ে যায়।

## উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন

একজন গোপিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে নন্দনন্দন, তোমার বাঁশির সুরে শ্রীমতী রাধারাণী এতই ব্যাকুল ও ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন যে, রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কুররী পক্ষীর মতো ক্রন্দন করছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে চকিত হয়ে, দেবাদিদেব মহাদেব এত উচ্চৈঃস্বরে মহানন্দে গর্জন করেন যে, সেই শব্দ শুনে দানবদের বিনাশ হয় এবং ভক্তরা আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন।

## হাই তোলা

সূর্যদেবের উদয়ে যেমন পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধারাণীর সামনে উপস্থিত হন, তখন শ্রীমতী রাধারাণীর কমলসদৃশ মুখমণ্ডল হাই তোলার ফলে বিকশিত হয়।

## দীর্ঘশ্বাস

দীর্ঘশ্বাস সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "ললিতা সখী হচ্ছেন ঠিক একটি চাতক পক্ষীর মতো, যা কেবল বর্ষার মেঘের জল পান করে।" এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বর্ষার কালো মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং ললিতাকে চাতক পক্ষীর সঙ্গে

তুলনা করা হয়েছে, যিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপী মেঘের সঙ্গ লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত। সেই সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে "প্রবল বায়ু যেমন বলবান মেঘকে দূরে ঠেলে দেয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ললিতা সখী দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, কেন না শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে চলে গেছেন।"

## অপরের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করা

মথুরার যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীরা যখন শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই কোথাও রয়েছেন, তখন তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা তাঁদের বিদ্বান পতিদেবতাদের কথা বিবেচনা না করে গৃহত্যাগ করেন। তাঁদের পতিরা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকেন, "শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ কী অদ্ভুত যে, এই রমণীরা কোন কিছু বিবেচনা না করে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে!" এই রকমই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, যা রুদ্ধদ্বার গৃহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই গৃহ ব্রাহ্মণ-পত্নীরা উপেক্ষা করেছিলেন।

*পদ্যাবলীতে* জনৈক ভক্তের উক্তি রয়েছে, "আমরা কারও চিন্তা করব না। তারা যদি আমাদের উপহাস করে, তবুও আমরা তাদের গ্রাহ্য করব না। আমরা কেবল 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের দিব্যরস আস্বাদন করব এবং গভীর নৃত্য করব অথবা ভূমিতে গড়াগড়ি দেব। এইভাবে আমরা নিত্যকাল দিব্য আনন্দ উপভোগ করব।"

## মুখ থেকে লালা ঝরা

কখনও কখনও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে করতে নারদ মুনি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান এবং তাঁর মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ে।

## উন্মত্তের মতো অট্টহাস্য করা

অন্তরের দিব্য প্রেমের আতিশয্যে ভক্ত কখনও কখনও উন্মত্তের মতো অট্টহাস্য করেন। এই অট্টহাস্য হৃদয়ের এক বিশিষ্ট অবস্থার অভিব্যক্তি। এই মনোভাবের দ্বারা ভক্ত যখন প্রভাবিত হন, তখন সেই প্রেম তাঁর ওষ্ঠাধরে প্রকাশিত হয়। তা যেন ভক্তের হৃদয়ের ভক্তিলতায় প্রস্ফুটিত ফুলের মতো। সেই ফুলগুলি ঝরে পড়ে হাসির লহরীরূপে। *চৈতন্য-চরিতামৃতেও* ভগবদ্ভক্তিকে একটি লতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা বর্ধিত হতে হতে গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে গিয়ে পৌঁছায়।

## মাথা ঘোরা

জনৈকা গোপিকা তাঁর সখীকে বলেন, "হে সখী! মনে হচ্ছে যে, অঘাসুর নিধনকারী শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর মুখ থেকে এক ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করেছে, যা তোমার মাথায় দেখা দিয়েছে এবং এখন ধীরে ধীরে তা সমস্ত কমলনয়না গোপিকাদের সেই দশার সৃষ্টি করবে।"

## হিক্কা

কখনও কখনও কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণরূপে হিক্কা তুলতে দেখা যায়। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, পৌর্ণমাসী রাধারাণীর এক ক্রন্দনরতা সহচরীকে বলেন, "হে পুত্রী! শ্রীমতী রাধারাণীকে হিক্কা তুলতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমি এক্ষুণি তাঁর প্রতিকারের ব্যবস্থা করছি। তুমি এভাবে ক্রন্দন করো না। এই হিক্কার জন্য তাকে কোন ঔষধ দিও না; এটি কৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমের একটি লক্ষণ। আমি এখনই এর নিরাময়ের বন্দোবস্ত করছি। সেই জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না।" পৌর্ণমাসীর এই বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, কৃষ্ণপ্রেমানন্দ কখনও কখনও হিক্কা তোলার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

কখনও কখনও কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণরূপে সমস্ত শরীরে কম্পন এবং শরীরের কোন অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। কিন্তু এই ধরনের লক্ষণগুলি অত্যন্ত বিরল, এবং তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই সম্পর্কে অধিক আলোচনা করেননি।

# অষ্টবিংশতি অধ্যায়

# সাত্ত্বিক ভাব

ভক্ত যখন সাক্ষাৎভাবে অথবা একটু ব্যবধানে থেকে কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা গভীরভাবে অভিভূত হন, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ তিন প্রকার—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ।

কৃষ্ণপ্রেমের স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাবকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। রাধারাণী এক সময় কুন্দ ফুলের একটি মালা গাঁথছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ মালা গাঁথা বন্ধ করে দেন। এটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের একটি উদাহরণ। পরোক্ষ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের বর্ণনা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়, "চাতক পক্ষীর চোখে বর্ষার জলভরা মেঘ যেমন, মা যশোদার চক্ষে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও তেমন। শ্রীকৃষ্ণকে যখন মথুরায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে মা যশোদা মথুরার রাজাকে তিরস্কার করতে থাকেন।"

দিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাবকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—একদিন মা যশোদা স্বপ্নে দেখলেন যে, পূতনার বিশাল শরীর তাঁর গৃহের প্রাঙ্গণে পড়ে রয়েছে, তা দেখে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে শুরু করলেন।

ভাবের লক্ষণ যখন অভক্তের শরীরে প্রকাশিত হতে দেখা যায়, তখন তাদের বলা হয় রুক্ষ লক্ষণ। অভক্ত সাধারণত বিষয়ী, কিন্তু কোন শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের মধ্যে কখনও কখনও দিব্যভাব প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ভক্তিতত্ত্ব বিশারদেরা সেই লক্ষণকে রুক্ষ সাত্ত্বিক ভাব বলে বর্ণনা করেন।

সাত্ত্বিক ভাবের আটটি লক্ষণ রয়েছে—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্পন, বিবর্ণতা, অশ্রুধারা ও প্রলয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী এই সমস্ত ভাবের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিয়েছেন। প্রাণশক্তি যখন পৃথিবীতে স্থির হয়, তখন স্তম্ভের উৎপত্তি হয়। সেই শক্তি যখন জলের সংস্পর্শে আসে, তখন অশ্রুধারা ঝরে পড়ে। সেই শক্তি যখন অগ্নির সংস্পর্শে আসে, তখন স্বেদ ও বৈবর্ণ দেখা দেয়। তা যখন আকাশের সংস্পর্শে

আসে, তখন মূর্ছা উৎপন্ন হয়। আর সেই শক্তি যখন বায়ুর সংস্পর্শে আসে, তখন কম্প, স্বরভেদ এবং শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দেয়।

এই সাত্ত্বিক ভাব কখনও বাহ্যরূপে এবং কখনও আভ্যন্তরীণরূপে প্রকাশিত হয়। শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত ভাবগুলি নিরন্তর হৃদয়ে অনুভব করেন কিন্তু বহির্মুখ মানুষদের ভয়ে তাঁরা সাধারণত সেগুলি বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করেন না।

## স্তম্ভ

স্তম্ভের উৎপত্তি হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, শোক ও ক্রোধ থেকে হয়। প্রাণীর স্তব্ধতা, নিশ্চলতা, শূন্যতা ও গভীর বিরহের অনুভূতি এই ভাবের লক্ষণ।

উদ্ধব যখন বিদুরের কাছে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি বলেন, "একদিন শ্রীকৃষ্ণ এক মালিনীর রূপ ধারণ করে উদ্যানে প্রবেশ করে, হাস্য-পরিহাসের দ্বারা গোপিকাদের আনন্দিত করেন। গোপিকারা তখন স্তম্ভিত হয়ে যান। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই উদ্যান পরিত্যাগ করে চলে যান, তখন তাঁরা এমনভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছিলেন, যেন তাঁদের চিত্ত ও দৃষ্টি উভয়ই তাঁর অনুগমন করছিল। এই লক্ষণগুলি থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের কার্য সমাপন না হলেও কৃষ্ণপ্রেমে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

স্তম্ভিত হওয়ার আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে মল্ল-পরিবৃত হয়েছিলেন, তখন তাঁর মা দেবকী স্তম্ভিত হয়ে যান এবং তাঁর নেত্রদ্বয় শুষ্ক হয়ে যায়।

স্তম্ভিত হওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৩/৫৬)। ব্রহ্মা যখন বুঝতে পারেন যে, এই গোপ-শিশুটি হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, তখন তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমস্ত গোপবালকদের দর্শন করে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন চতুর্মুখ-বিশিষ্ট একটি স্বর্ণমূর্তি। ব্রজবাসীরা যখন দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাঁ-হাতে গিরি-গোবর্ধন তুলে ধরেছেন, তখন তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বকাসুরের মুখ-বিবরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতারা শোকাভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। অশ্বত্থামাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতে উদ্যত হতে দেখে, ক্রোধে অর্জুন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

## স্বেদ

হর্ষ থেকে উৎপন্ন স্বেদের উদাহরণ *শ্রীমদ্ভাগবতে* আছে। একজন গোপী শ্রীমতী রাধারাণীকে সম্বোধন করে বলেন, "হে রাধে! তুমি কেন অনর্থক

সূর্যকিরণকে দোষারোপ করছ? আমি জানি যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখে কামপীড়িতা হয়ে তুমি এইভাবে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছ।"

শ্রীকৃষ্ণের সেবক রক্তককে ভয়ে স্বেদাপ্লুত হতে দেখা গিয়েছিল। একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর পতি অভিমন্যুর বেশ ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধারাণীর মেলামেশা অভিমন্যু পছন্দ করতেন না এবং তাই অভিমন্যু-বেশী শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে না পেরে, রক্তক তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করতে থাকেন। অবশেষে রক্তক যখন বুঝতে পারেন যে, ইনিই হচ্ছেন অভিমন্যু-বেশী শ্রীকৃষ্ণ, তখন তিনি স্বেদাপ্লুত হন। এই স্বেদের কারণ হচ্ছে ভয়।

ক্রোধে স্বেদাপ্লুত হতে দেখা গিয়েছিল বিষ্ণুবাহন গরুড়কে। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র বৃন্দাবনের উপর মুষলধারায় বারিবর্ষণ করছিলেন। মেঘের উপর থেকে সেই ঘটনা দর্শন করে, ক্রোধে গরুড়ের শরীর থেকে স্বেদ নিঃসৃত হতে থাকে।

## রোমাঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণের মুখে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে মা যশোদার রোমাঞ্চ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ মাটি খেয়েছেন কি না দেখবার জন্য মা যশোদা তাঁর মুখ হাঁ করতে বলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যখন হাঁ করলেন, তখন তিনি তাঁর মুখে কেবল এই পৃথিবীই দর্শন করলেন না, তাঁর মুখের মধ্যে তিনি সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করলেন। তার ফলে তাঁর রোমাঞ্চ হয়েছিল।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩০/১০) রাসনৃত্য পরায়ণ গোপীদের হর্ষজনিত রোমাঞ্চের বর্ণনা করা হয়েছে। রাসনৃত্যের সময় শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ রাধারাণী সহ অন্তর্হিত হয়ে যান, এবং গোপিকারা তখন তাঁকে খুঁজতে থাকেন। সেই সময় ধরিত্রীকে সম্বোধন করে তাঁরা বলেন, "হে ধরিত্রী! তুমি কত তপস্যা করেছ, যার ফলে তুমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের স্পর্শ লাভ করছ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন আনন্দের আতিশয্যে তুমি অত্যন্ত পুলকিত হয়েছ, কেন না এই সমস্ত গাছপালাগুলি, যারা হচ্ছে তোমার শরীরের লোমসদৃশ, তারা রোমাঞ্চিত হয়ে তোমার শরীরে শোভা পাচ্ছে। তোমার মধ্যে প্রেমের এই লক্ষণ প্রথম কবে বিকশিত হয়েছিল? তোমার এই আনন্দ-মহোৎসব বামন অবতারের স্পর্শে প্রথম প্রকাশিত হয়, না ভগবান যখন বরাহ অবতার রূপে তোমাকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন প্রকাশিত হয়?"

শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও গোপবালকদের সঙ্গে খেলাচ্ছলে যুদ্ধের আয়োজন করতেন। সেই সময় যখন তিনি তাঁর শৃঙ্গ বাজাতেন, তখন বিরোধী পক্ষে শ্রীদামের উৎসাহের আতিশয্যে রোমাঞ্চ হত। তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুনের ভয়ে রোমাঞ্চ হয়েছিল।

## স্বরভেদ

অক্রূর-চালিত রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় যাচ্ছিলেন, তখন মা যশোদা ও সমস্ত গোপীরা তাঁকে যেতে না দিতে চেয়ে তাঁর পথ রোধ করেছিলেন। সেই সময় রাধারাণী এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, স্খলিত কণ্ঠে তিনি মা যশোদাকে অনুরোধ করতে থাকেন যাতে তিনি অক্রূরকে নিরস্ত করেন।

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ব্রহ্মার স্বরভেদ হয়েছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৩/৬৪) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রণত হওয়ার পর যখন ব্রহ্মা উঠে দাঁড়ালেন, তখনি তিনি গদ্‌গদ স্বরে ভগবানের উদ্দেশ্যে বন্দনা করেন।

দশম স্কন্ধে (১০/২৯/৩০) স্বরভেদের অন্য একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা গোপিকারা প্রর্দশন করেছিলেন। গোপিকারা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করার জন্য তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ঘরে ফিরে যেতে বলেছিলেন। গোপিকারা তখন তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে স্খলিত কণ্ঠে তাঁকে তিরস্কার করেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৯/৫৬ ও ৫৭) হর্ষজনিত স্বরভেদের দৃষ্টান্ত রয়েছে। অক্রূর যখন যমুনার জলে সমস্ত বৈকুণ্ঠজগৎ দর্শন করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে তাঁর মস্তক অবনত করে, করজোড়ে গদ্‌গদ স্বরে তাঁর বন্দনা করতে শুরু করেন।

ভীতিবশত স্বরভেদের দৃষ্টান্তও রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের এক সখা তাঁর প্রশংসা করে বলেন, "হে সখে! তোমার বংশী তোমার সেবক পত্রককে দেওয়া হয়েছিল, এবং আমি যখন তাঁকে সেটি ফিরিয়ে দিতে বলি, তখন তাঁর স্বরভেদ হয় এবং তাঁর অঙ্গ বিবর্ণ হয়ে যায়।"

## কম্প

শ্রীকৃষ্ণ যখন শঙ্খাসুরকে ধরবার চেষ্টা করেন, তখন ভয়ে রাধারাণী কাঁপতে শুরু করেন। শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করছিলেন, তখন কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব ক্রোধবশত কাঁপতে থাকেন।

গভীর দুঃখে রাধারাণীকে কাঁপতে দেখা গিয়েছিল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি একজন গোপীকে বলেন, "এই নিষ্ঠুর বালকের সঙ্গে পরিহাস করো না! ওকে বলে দাও সে যেন কখনও আমার কাছে না আসে, কেন না সে সব সময় আমাদের দুঃখই দেয়।"

## বৈবর্ণ

কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের ফলে গভীর বিষাদে দেহ বিবর্ণ হয়ে যায়। তাই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে বৃন্দাবনের সকলেই বিবর্ণ হয়ে গেছে, এবং তাই দেবর্ষি নারদ বৃন্দাবনকে শ্বেতদ্বীপ বলে ভুল করছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে রঙ্গমঞ্চে আসতে দেখে ভয়ে কংসের দেহ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তেমনই শ্রীকৃষ্ণকে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করে সমস্ত ব্রজবাসীদের রক্ষা করতে দেখে, ইন্দ্রের মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আনন্দের আতিশয্যে যদি বৈবর্ণ দেখা দেয়, তা হলে তা রক্তিম হয়ে ওঠে। এই বিকার অত্যন্ত দুর্লভ, তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই বিষয়ে অধিক আলোচনা করেননি।

## অশ্রু

হর্ষ, রোষ অথবা বিষাদের ফলে চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল এবং ক্রোধজনিত অশ্রু উষ্ণ হয়। সব রকমের অশ্রুপাতেই নেত্রদ্বয় আলোড়িত হয় এবং সাধারণত তা রক্তিম হয়ে ওঠে। তখন চোখে চুলকানির অনুভূতি হওয়ায় মানুষ চোখ রগড়ায়।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী কমলনয়না রুক্মিণী যখন আনন্দের আতিশয্যে অশ্রুপাত করছিলেন, তখন সেই অশ্রু তাঁর কাছে অপ্রিয় বলে মনে হয়েছিল, কেন না তা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে বাধা সৃষ্টি করছিল। *হরিবংশের* একটি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগবশত সত্যভামা অশ্রুপাত করছিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের সময় শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে দেখে, ক্রোধে ভীমসেন অশ্রুপাত করেছিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ শিশুপালকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু তাঁকে সেই আদেশ দেননি, তাই ক্রোধে তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন। সেই সময় উষ্ণ অশ্রু তাঁর আঁখি দুটিকে আচ্ছাদিত করেছিল। হালকা মেঘ যখন সন্ধ্যার চাঁদকে আচ্ছাদিত করে, তখন তা দেখতে খুব সুন্দর লাগে, তেমনই ভীম যখন অসহ্য ক্রোধে অশ্রুপাত করছিলেন, তখন তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৬০/২৩) শোকবিহ্বল হয়ে রুক্মিণীর অশ্রুপাতের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণী যখন বাক্যালাপ করছিলেন, তখন কৃষ্ণ-বিরহের আশঙ্কায় রুক্মিণী অত্যন্ত ভীতা হন এবং তাই তিনি কমল-সদৃশ রক্তিম নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। তাঁর অশ্রুধারায়

চোখের কাজল ধৌত হয়ে কুমকুমলিপ্ত বক্ষঃস্থলে পতিত হচ্ছিল। তিনি তখন এতই বিষাদমগ্ন হয়েছিলেন যে, তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল।

## প্রলয়

কেউ যখন একই সঙ্গে দুঃখ ও সুখের আতিশয্যের ফলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং বুঝতে পারে না তার কি করা উচিত, সেই বিভ্রান্ত অবস্থাকে বলা হয় প্রলয়। এই প্রলয়ের অবস্থায় ভক্ত কখনও কখনও মাটিতে পড়ে যান এবং প্রেমের সমস্ত লক্ষণ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। গোপিকারা যখন শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজছিলেন এবং হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ বন থেকে তাঁদের সামনে বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁরা হতচেতন হয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় গোপীদের অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এটি আনন্দের আতিশয্যে প্রলয়ের একটি দৃষ্টান্ত।

দুঃখজনিত প্রলয়েরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৩৯/১৫) শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলছেন, "হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় এতই তন্ময় হয়েছিলেন যে, তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁরা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের দেহের চেতনা হারিয়ে ফেলেন। যেন তাঁরা সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।"

## সাত্ত্বিক ভাবের ন্যূনাধিক তারতম্য

শরীরে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে স্তম্ভনের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। স্তম্ভনের মাত্রা অনুসারে দেহস্থ প্রাণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং তার ফলে ভগবৎ প্রেমজনিত বিবিধ ভাবের তারতম্য দেখা দেয়। এই দিব্যভাব ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং এই বিকাশের মাত্রা অনুসারে তাদের ধূমায়িত, জ্বলিত ও উদ্দীপ্ত বলা হয়। এই তিনটি স্তর বহু বর্ষ ধরে উপলব্ধি হয় এবং তা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যাপ্ত থাকে। স্তম্ভনের প্রভাব সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, যা অশ্রুপাত বা স্বরভেদে হয় না। অশ্রুপাত ও স্বরভেদ কেবল নির্দিষ্ট স্থানে প্রকাশিত হয়।

অশ্রুপাতের ফলে কখনও কখনও চোখ ফুলে যায় এবং সাদা হয়ে যায়, আর চোখের তারা কেন্দ্রচ্যুত হয়। স্বরভেদের ফলে কখনও কখনও কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এবং চরম ব্যাকুলতা দেখা দেয়। এই সাত্ত্বিক ভাবগুলির লক্ষণ বিশেষ কোন অঙ্গে প্রকাশিত হয়, এবং তাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়; যেমন স্বরভেদের ফলে যখন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, তখন ঘড় ঘড় শব্দ হয়। এই শব্দের ফলে কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এবং বিভিন্নভাবে গভীর মানসিক ব্যাকুলতা দেখা দেয়। এই সমস্ত লক্ষণগুলি রুক্ষ সাত্ত্বিক ভাবের ধূমায়িত অবস্থা, এবং সেগুলি বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়।

কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের মহোৎসবে অথবা ভক্তসমাজে আনন্দমুখর নৃত্য হয়। এই ভাবকে জ্বলিত বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যতীত উপরোক্ত এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হতে পারে না। এই সাত্ত্বিক ভাব যখন ধূমায়িত অবস্থায় প্রকাশিত হয়, তখন তা লুকানো যায়। নন্দ মহারাজের গৃহে গর্গ মুনি যখন বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন তিনি এই লক্ষণগুলি উপলব্ধি করেন। যখন তিনি শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে নিধন করেছেন, তখন তাঁর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তাঁর কণ্ঠস্বর কম্পিত হচ্ছিল এবং তাঁর সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হয়েছিল। এইভাবে গর্গ মুনির সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হয়েছিল।

যখন দুই অথবা তিনের অধিক সাত্ত্বিক ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় জ্বলিত। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের এক সখা যখন তাঁকে বলেন, "হে সখে! বনের মধ্যে থেকে আমি যখন তোমার বাঁশির শব্দ শুনতে পাই, তখন আমার হাত দুটি প্রায় অবশ হয়ে যায় এবং আমার চোখ দুটি এত অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, আমি তোমার ময়ূরপুচ্ছ পর্যন্ত চিনতে পারি না। আমার ঊরুযুগল তখন এত স্তম্ভিত হয়ে যায় যে, আমি তখন নড়তে পারি না। তাই, হে সখে! আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, তোমার অপ্রাকৃত বংশীধ্বনির সুর অতি অদ্ভুত।"

তেমনই, এক গোপী অপর এক গোপীকে বলেন, "হে সখী! কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনার পর, আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার অনেক চেষ্টা করি। কিন্তু তবুও আমার শরীরের কম্পন আমি রোধ করতে পারি না, এবং তার ফলে গৃহে আমার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কৃষ্ণের প্রতি আমার অনুরাগ ধরা পড়ে যায়।"

যখন চার-পাঁচ রকম সাত্ত্বিক ভাব একসঙ্গে প্রকাশিত হয় এবং তাদের লুকানো যায় না, তখন তাদের 'উদ্দীপ্ত' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নারদ মুনি এত স্তম্ভিত হয়ে যান যে, তিনি বীণা বাজাতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং তাঁর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেও অক্ষম হন।

এই সমস্ত ভাবগুলি যখন অত্যন্ত প্রবলভাবে রাধারাণীর মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর কয়েকজন সখী তাঁর সমালোচনা করে বলেন, "হে সখী! তুমি তোমার নেত্রের অশ্রুধারার জন্য ফুলের পরাগরেণুর দোষ দিচ্ছ, তোমার শরীরের রোমাঞ্চের জন্য বায়ুকে তিরস্কার করছ, এবং তোমার ঊরুযুগল স্তম্ভিত হওয়ার জন্য বনবিহারকে অভিসম্পাত করছ। কিন্তু তোমার স্বরভেদ বলে দিচ্ছে যে,

এগুলির আসল কারণ হচ্ছে অন্য কিছু—কৃষ্ণের প্রতি তোমার প্রেমই এগুলির কারণ।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, পাঁচ, ছয় অথবা সব কয়টি সাত্ত্বিক ভাব একসঙ্গে প্রকাশিত হয়ে যখন পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে 'উদ্দীপ্ত' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের এক সখা তাঁকে বলেন, "হে পীতাম্বর! তোমার বিরহের ফলে সমস্ত বৃন্দাবনবাসী স্বেদযুক্ত হয়ে উঠেছে, তারা নানা স্বরে বিলাপ করছে, তাদের শরীরে কম্প, রোমাঞ্চ ও স্তম্ভন দেখা দিচ্ছে, তাদের নেত্র অশ্রুধারায় প্লাবিত হচ্ছে। তারা সকলেই অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।"

প্রেমের চরম লক্ষণকে বলা হয় 'মহাভাব'। এই মহাভাব কেবল রাধারাণীর মধ্যেই সম্ভব। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারাণীর প্রেম আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর মধ্যেও মহাভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, ভগবৎ-প্রেম যখন সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন তা মহাভাব রূপে প্রকাশিত হয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী চার প্রকার সাত্ত্বিকাভাসেরও বিশ্লেষণ করেছেন।

কখনও কখনও নির্বিশেষবাদীরা, যারা প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরহিত, তারাও এই সমস্ত ভাবগুলি প্রকাশিত করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ভাব নয়, সেগুলি ভাবের আভাস মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্বিশেষবাদীদের পীঠস্থান বারাণসীতে কখনও কখনও দেখা যায়, ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে, কোন মায়াবাদী সন্ন্যাসী ক্রন্দন করছে। মায়াবাদীরা কখনও কখনও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে নৃত্য করে, কিন্তু ভগবানের সেবা করা তাদের লক্ষ্য নয়। তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন যে, কীর্তনের ফলে নির্বিশেষবাদীদের শরীরে এই সমস্ত বিকারগুলি দেখা গেলেও, সেগুলিকে কখনই ভগবানের প্রতি অনুরাগের লক্ষণ বলে মনে কার উচিত নয়। সেগুলি প্রতিবিম্ব মাত্র, ঠিক যেমন অন্ধকার ঘরে পালিশ করা কাঁচে কখনও কখনও সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের প্রভাব এতই প্রবল ও দিব্য যে, তা নির্বিশেষবাদীদেরও হৃদয় দ্রবীভূত করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন যে, নির্বিশেষবাদীদের মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি ভগবৎ-প্রেমের প্রতিবিম্ব মাত্র, তা যথার্থ প্রেম নয়।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, ভক্তি ও ভগবৎ-কীর্তির লেশমাত্র জ্ঞানরহিত তার্কিকেরাও যখন ভগবানের গুণগান শুনতে বসে, তখন দ্রবীভূত চিত্তে তাদের চোখ দিয়েও অশ্রু ঝরে পড়ে। সেই সম্বন্ধে এক ভক্ত ভগবানকে বলছেন, "হে মুকুন্দ! আপনার লীলামৃতের মহিমা সম্বন্ধে আমি কী বলতে পারি, যা শ্রবণ করে

অভক্তরা পর্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তাদের নেত্রদ্বয় অশ্রুধারায় প্লাবিত হয় এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়!" এই ধরনের অভক্তদের হৃদয় কখনই দ্রবীভূত হয় না; তাদের হৃদয় কঠিন। কিন্তু ভগবানের গুণগানের এমনই মহিমা যে, তার প্রভাবে অনেক সময় অভক্তরাও অশ্রুপাত করে।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভক্তির রসবিহীন অভক্ত, যে কখনই শাস্ত্রবিধির নিয়ম পালন করেনি, সে-ও কখনও কখনও অভ্যাসের ফলে ভক্তমণ্ডলীতে অশ্রু আদি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ প্রদর্শন করে। এই অশ্রুবিসর্জন ভগবৎ প্রেমজনিত নয়। তা কেবল অভ্যাসেরই ফল। এই সমস্ত ভাব-আভাস বর্ণনা করার যদিও কোন প্রয়োজন নেই, তবুও শ্রীল রূপ গোস্বামী এই সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, যেখানে যথার্থ ভক্তি ব্যতীতই এই রকম কয়েকটি ভাব প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

# উনত্রিংশতি অধ্যায়

# কৃষ্ণপ্রেমের ব্যভিচারী ভাব

কৃষ্ণপ্রেমের ব্যভিচারী ভাব প্রকাশ করে শরীরে কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। সেগুলি হচ্ছে নিম্নলিখিত তেত্রিশটি ভাব—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রান্তি, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মত্ততা, অপস্মার, ব্যাধি, বিহ্বলতা, মৃত্যু, আলস্য, জড়তা, লজ্জা, গোপনীয়তা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, ঈর্ষা, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ।

## নির্বেদ

অত্যন্ত আর্তি, বিয়োগ, ঈর্ষা, সৎ-বিবেক (অবাঞ্ছিত কর্ম করার ফলে এবং কর্তব্যকর্ম না করার ফলে যে শোচনা) প্রভৃতির প্রভাবে যে গ্লানি অনুভব হয় এবং অপমানিত বোধ হয়, সেই অনুভূতিকে বলা হয় নির্বেদ। নির্বেদে উৎকণ্ঠা, অশ্রু, বিবর্ণতা, দৈন্য ও দীর্ঘশ্বাস আদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কালীয়কে দণ্ডদান করার সময় যখন মনে হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ বিষাক্ত যমুনার জলে ডুবে গেছেন, তখন নন্দ মহারাজ মা যশোদাকে বলেন, "হে দেবী! কৃষ্ণ গভীর জলে নিমগ্ন হয়েছে, তাই এখন আর আমাদের এই পাপময় শরীর ধারণ করে কি লাভ! চল, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ আমরাও যমুনার বিষাক্ত জলে নিমজ্জিত হই।" এটি গভীর আঘাতে ভক্তের গভীর নির্বেদের দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যান, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ সখা সুবলও সেখান থেকে চলে যেতে মনস্থ করেছিলেন। যেতে যেতে সুবল চিন্তা করছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে বৃন্দাবনে কোন আনন্দই আর নেই। ভ্রমর যেমন নীরস পুষ্পকে পরিত্যাগ করে, তেমনই সুবল যখন বুঝতে পারলেন যে, বৃন্দাবনে আর কোন রকম দিব্য রসের আনন্দ নেই, তখন তিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

*দানকেলি কৌমুদী*তে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর এক সখীকে বলেছেন, "হে সখী! আমি যদি কৃষ্ণের মহিমামণ্ডিত কীর্তি শ্রবণ করতে না পারি, তা হলে আমার বধির হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। এবং যেহেতু আমি এখন তাঁর দর্শনে বঞ্চিত হয়েছি, তাই আমার পক্ষে অন্ধ হয়ে যাওয়াই শ্রেয়।" এটি শ্রীকৃষ্ণবিরহে নির্বেদের একটি দৃষ্টান্ত।

*হরিবংশে* বর্ণনা করা হয়েছে, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা তাঁর পতিকে বলছেন, "হে কৃষ্ণ! যেদিন আমি নারদ মুনিকে তোমার কাছে রুক্মিণীর গুণগান করতে শুনলাম, তখন থেকেই আমি বুঝেছি যে, আমার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন!" এটি ঈর্ষাবশত নির্বেদের একটি দৃষ্টান্ত। রুক্মিণী ও সত্যভামা উভয়েই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, তাই তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী-সুলভ ঈর্ষা প্রকাশিত হতে দেখা যেত। তাই সত্যভামা যখন রুক্মিণীর গুণগান শ্রবণ করলেন, তখন তিনি ঈর্ষাবশত নির্বেদ অনুভব করেছিলেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৫১/৪৭) মুচুকুন্দ বলেন, "হে কৃষ্ণ! এমন নয় যে, অন্যরাই কেবল জড় বিষয়ে আসক্ত, কেন না আমিও দেহাত্মবুদ্ধিতে গভীরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমি সর্বক্ষণ আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পরিজন, গৃহ, সম্পদ, ভূমি, রাজ্য ইত্যাদির বিষয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত; এবং যেহেতু আমি জড় আসক্তিতে এত মত্ত হয়ে পড়েছি, তাই আমার এখন মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ হয়েছে।" এটি শোকজনিত নির্বেদের একটি দৃষ্টান্ত।

ভরত মুনির মতে, এই নির্বেদ অমঙ্গলজনক। কিন্তু অন্যান্য তত্ত্ববিদেরা এই নির্বেদকে শান্তরসের অন্তর্গত এবং প্রেমের স্থায়িভাব বলে স্বীকার করেছেন।

## বিষাদ

অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের অক্ষমতা, কার্যে অসাফল্য, বিরূপ অবস্থা এবং অপরাধ বোধের ফলে যে অবস্থা হয়, তাকে বলা হয় বিষাদ। বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় মানুষ জিজ্ঞাসু, চিন্তাশীল, অশ্রুপূর্ণ ও অনুতপ্ত হয়। সেই সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ হয়, দেহে বৈবর্ণ দেখা দেয় এবং মুখ শুষ্ক হয়ে যায়।

একজন বৃদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, "হে কৃষ্ণ! হে অঘনাশন! বার্ধক্যের প্রভাবে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমার বাণী ক্ষীণ হয়েছে, আমার কণ্ঠস্বর ভঙ্গ হয়েছে, আমার মন দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং স্মৃতি শক্তি লোপ পাচ্ছে। কিন্তু হে প্রিয় প্রভু! আমার প্রকৃত অনুতাপ হচ্ছে যে, দুর্ভাগ্যবশত আমি আপনার মুখচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারলাম না।" এটি অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে অক্ষমতাজনিত বিষাদের একটি দৃষ্টান্ত।

এক ভক্ত বলেন, "আজ রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আমি বাগান থেকে নানা রকম ফুল তুলছিলাম এবং আমি মনে মনে ভাবছিলাম, সেই ফুল দিয়ে একটি মালা গেঁথে আমি শ্রীকৃষ্ণকে তা অর্পণ করব। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, হঠাৎ আমার সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হল এবং আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না।" এই উক্তিটি কার্যে অসিদ্ধিজনিত বিষাদের একটি দৃষ্টান্ত।

নন্দ মহারাজ যখন তার পালিত পুত্র কৃষ্ণকে কংসের যজ্ঞশালায় দর্শন করেন, তখন তিনি বলেন, "আমি কী দুর্ভাগা যে, আমার পুত্রসন্তানকে আমি ঘরে আবদ্ধ করে রাখিনি। দুর্ভাগ্যবশত আমি তাকে মথুরায় নিয়ে এসেছি এবং আমি এখন দেখছি যে, কুবলয়াপীড় নামক এই বিশাল হস্তী তাকে আটকে রেখেছে। কৃষ্ণরূপী চন্দ্র যেন রাহুগ্রস্ত হয়েছে।" এটি বিপত্তিবশত বিষাদের একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৪/৯) ব্রহ্মার একটি উক্তি রয়েছে, "হে প্রভু! আমার বাতুলতা দর্শন করুন! আপনি অনন্ত, আদি পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান, পরমাত্মা — এবং আপনি সম্পূর্ণ মায়াশক্তির পরম নিয়ন্তা! অথচ আমার ধৃষ্টতা দেখুন! আমার তুচ্ছ শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে আমি আপনাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলাম। আগুন থেকে বেরিয়ে আসা একটি ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের কোন ক্ষতি করতে পারে না, তেমনই আমার অতি নগণ্য মোহিনী শক্তি আপনার দৈবী মায়াকে প্রতিহত করতে পারে না। তাই আমি নিজেকে এখন সব চাইতে তুচ্ছ এবং নিরর্থক বলে মনে করছি।" ব্রহ্মার এই উক্তি অপরাধজনিত শোকের একটি দৃষ্টান্ত।

## দৈন্য

দুঃখ, ত্রাস, অপরাধ আদির ফলে যে দুর্বলতা, তাকে বলা হয় দৈন্য। এই অবস্থায় চাটুকারিতা, হৃদয়ের সংকীর্ণতা, চিত্তের মলিনতা, চিন্তা ও জড়তা আদি দেখা দেয়।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৫১/৫৭) মহারাজ মুচুকুন্দ বলছেন, "হে প্রভু! আমার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে আমি নিরন্তর দুঃখ ভোগ করছি। কামনা-বাসনার দ্বারা আমি নিরন্তর উৎপীড়িত হচ্ছি, তবুও আমার ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় সুখভোগে তৃপ্ত হচ্ছে না। কিন্তু তবুও আপনার কৃপার প্রভাবে আমি এখন শান্ত হয়েছি, কেন না আমি এখন আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যা শোক, ভয়, ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করে। হে পরম পরিত্রাতা, হে পরম আত্মা! হে পরমেশ্বর! আমি এই জড় জগতের বন্ধনে এতই আবদ্ধ হয়ে পড়েছি, আপনি এখন আমাকে রক্ষা করুন!" মুচুকুন্দের এই উক্তিটি জড় অস্তিত্বের দুর্দশাজনিত দৈন্যের একটি দৃষ্টান্ত।

উত্তরা যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তান মহারাজ পরীক্ষিৎকে হারাবার ভয়ে ভীত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, "হে প্রভু! আমার এই সন্তানটিকে আপনি রক্ষা করুন। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে যদি আমার মৃত্যু হয় তাতে কোন ক্ষতি

নেই, কিন্তু আমার গর্ভস্থ সন্তানটিকে আপনি রক্ষা করুন!" এটি ভয়জনিত দৈন্যের একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৪/১০) ব্রহ্মা বলেছেন, "হে অচ্যুত! রজোগুণে আমার জন্ম হয়েছে, তাই নিজেকে এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে মিথ্যা অহঙ্কারে আমি মত্ত হয়েছি। আমার এই অহঙ্কার গভীর অন্ধকারের মতো, এবং সেই অন্ধকারে আমি অন্ধ হয়েছি। সেই অন্ধ অবস্থায়, হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি নিজেকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে অহঙ্কার করেছি। আমি আপনার নিত্য সেবক। তাই দয়া করে আমার প্রতি আপনি নিরন্তর কৃপা করুন এবং আমার অপরাধ মার্জনা করুন।" ব্রহ্মার এই উক্তি অপরাধজনিত দৈন্যের একটি দৃষ্টান্ত।

কখনও কখনও লজ্জাবশত দৈন্য প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনায় স্নানরতা গোপীদের বস্ত্র হরণ করেন, তখন সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে এই অন্যায় আচরণ না করার জন্য অনুনয় করেন। গোপীরা তাঁকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! আমরা জানি যে, তুমি হচ্ছ নন্দনন্দন ও ব্রজবল্লভ। তুমি আমাদেরও অত্যন্ত প্রিয়! কিন্তু তবুও তুমি কেন আমাদের এইভাবে দুঃখ দিচ্ছ? দয়া করে তুমি আমাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দাও। দেখ, এই প্রচণ্ড শীতে আমরা কিভাবে কাঁপছি!" এটি শ্রীকৃষ্ণের সামনে নগ্ন হওয়ার লজ্জাজনিত দৈন্য।

## গ্লানি

কোন অনুচিত কার্য করার জন্য নিজেকে অপরাধী বলে মনে করাকে গ্লানি বলা হয়।

একদিন শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের জন্য দধিমন্থন করছিলেন। তখন তাঁর হাতের রত্নখচিত কঙ্কনগুলি থেকে সংঘর্ষজনিত সুমধুর শব্দ উত্থিত হচ্ছিল এবং তিনি কৃষ্ণনাম কীর্তন করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, "আমি কৃষ্ণনাম কীর্তন করছি, আর আমার গুরুজনেরা—আমার শাশুড়ি, ননদিনী—এরা তা শুনে ফেলতে পারে!" এই চিন্তা উদয় হওয়ার ফলে রাধারাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। এটি কৃষ্ণপ্রেমজনিত গ্লানির একটি উদাহরণ।

একদিন মৃগনয়না শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের জন্য মালা বানাবার ফুল সংগ্রহ করতে বনে প্রবেশ করলেন। ফুল চয়ন করতে করতে তাঁর মনে হল কেউ তাঁকে দেখে ফেলতে পারে, এবং তার ফলে তিনি অবসাদ ও দুর্বলতা অনুভব করলেন। এটি শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রমজনিত গ্লানি।

*রস-সুধাকরে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাত্রিযাপন করবার পর রাধারাণী এত দুর্বল বোধ করলেন যে, তিনি শয্যাত্যাগ করে উঠতে পারলেন

না। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর হাত ধরে তাঁকে উঠতে সাহায্য করলেন, তখন তাঁর সঙ্গে রাত্রিযাপন করবার জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর মনে গ্লানির উদয় হল।

## শ্রান্তি

দীর্ঘ পথ চলা, নৃত্য করা এবং রতিক্রিয়ার ফলে শ্রান্তির উৎপত্তি হয়। নিন্দা, বিহ্বলতা, স্বেদ, অঙ্গের নিষ্ক্রিয়তা, জৃম্ভণ ও দীর্ঘশ্বাস শ্রান্তির লক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে, মা যশোদা একদিন গৃহের অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার জন্য তাঁর পিছনে পিছনে ছুটছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি অত্যন্ত শ্রান্তি অনুভব করলেন এবং তার ফলে তাঁর দেহে স্বেদবিন্দু দেখা দিল এবং তাঁর কেশকবরী স্খলিত হল। এটি পরিশ্রম জনিত শ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত।

কখনও কখনও বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণের গোপসখারা মহোৎসবে নৃত্য করতেন। সেই সময় তাঁদের গলার মালা আন্দোলিত হত এবং তাঁরা ঘর্মাক্ত কলেবর হতেন। সেই আনন্দমুখর নৃত্যের ফলে তাঁদের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যেত। এটি নৃত্যজনিত শ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৩/২০) বর্ণনা করা হয়েছে—নৃত্য করে, আলিঙ্গন করে এবং চুম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমবিলাস আস্বাদন করে, গোপিকারা কখনও কখনও অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়তেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর অহৈতুকী করুণা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তাঁর কমলসদৃশ হস্ত দ্বারা তাঁদের মুখের ঘাম মুছে দিতেন। এটি রাসনৃত্য-জনিত শ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত।

## মদ

আসব পান করে অথবা কামার্ত হওয়ার ফলে কেউ যখন অহঙ্কারে মত্ত হয়, তখন তার কথা জড়িয়ে যায়, চোখ ফুলে যায় এবং দেহ আরক্তিম হয়। *ললিতমাধবে* বর্ণনা করা হয়েছে, এক সময় অত্যধিক মধু পান করে মত্ত হওয়ার ফলে বলরাম পিপীলিকাদের সম্বোধন করে বলেন, "হে পিপীলিকার রাজাগণ! তোমরা কেন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছ?" সেই সময় তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও সম্বোধন করে বলেন, "হে দেবরাজ ইন্দ্র! শচীর সঙ্গে ক্রীড়া করতে করতে তুমি কেন হাসছ? আমি এখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করতে প্রস্তুত হয়েছি, এবং আমি জানি যে, কৃষ্ণ তাতে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না।"* তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, "হে প্রিয় কৃষ্ণ। এক্ষুণি তুমি আমাকে বলো সমস্ত জগৎ

---

* বলদেব বা বলরাম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা। তিনি পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রকাশ এবং তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্রে তাঁকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করা হয়েছে।

কেন কম্পিত হচ্ছে! চন্দ্র কেন লম্বা হয়ে গেছে! তোমরা যাদবেরা কেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছ? কদম্বের মধু থেকে তৈরি মদিরা আমাকে ফিরিয়ে দাও!" শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রার্থনা করছেন, এইভাবে মদমত্তের মতো আচরণ করছেন যে ভগবান বলরাম, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

এইভাবে মদমত্ত অবস্থায় ক্লান্তি অনুভব করে বলরাম ভূমিতে শায়িত হলেন। সাধারণত উত্তম পুরুষেরা মদমত্ত অনুভব করলে শুয়ে পড়েন, মধ্যম পুরুষেরা মদমত্ত হলে উচ্চৈঃস্বরে হাসেন এবং গান করেন, আর অধম পুরুষেরা অপশব্দ ব্যবহার করে এবং কখনও কখনও ক্রন্দন করে। বয়স ও মনোভাবের ভেদের ফলে এই মদ নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়। এই বিষয়ের শ্রীল রূপ গোস্বামী আর অধিক বর্ণনা করেননি, কেন না এই ধরনের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে রাধারাণীর মদমত্ত হওয়ার একটি বর্ণনা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে একদিন শ্রীমতী রাধারাণী ইতস্তত বিচরণ করছিলেন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে হাসছিলেন, কখনও বা তাঁর বসনাঞ্চল দিয়ে মুখ আচ্ছাদন করছিলেন, কখনও অর্থহীন প্রলাপ বকছিলেন এবং কখনও তাঁর সখীদের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই অবস্থা দেখে গোপীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকেন, "দেখ! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে রাধারাণী কী রকম প্রমত্ত হয়ে পড়েছে!" এটি প্রেমজনিত মত্ততার একটি লক্ষণ।

## গর্ব

অত্যধিক সৌভাগ্য, অনিন্দ্য সৌন্দর্য, উত্তম নিবাস অথবা অভীষ্ট সিদ্ধির ফলে গর্ব ভাবের উদয় হয়। অপরের অবহেলাকে গ্রাহ্য না করাকেও গর্ব বলে বিবেচনা করা হয়।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, "হে প্রিয়তম কৃষ্ণ! জোর করে তুমি আমার হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছ, কিন্তু তুমি আমার হৃদয় থেকে বেরিয়ে যাও দেখি! তা হলে বুঝব তোমার বীরত্ব কতখানি!" এটি কৃষ্ণপ্রেম-জনিত গর্বের একটি দৃষ্টান্ত।

একদিন রাসনৃত্যের সময় শ্রীমতী রাধারাণী রাসমণ্ডলী ছেড়ে চলে যান এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে খুঁজতে থাকেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এক সখী তখন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের রাধারাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর অনেক সেবা করেছ এবং এখন তাঁকে খোঁজবার জন্য তুমি অন্য সমস্ত গোপীদের ত্যাগ করেছ। দয়া করে তুমি আমাকে বল, তাঁর কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার তুমি প্রত্যাশা কর।" অনিন্দ্য সৌন্দর্য-জনিত গর্বের এটি একটি দৃষ্টান্ত।

রাধারাণী কখনও কখনও অন্তরে গর্ব অনুভব করে বলতেন, "গোপবালকেরা যদিও শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা তৈরি করে, তবুও আমি যখন তাঁকে আমার তৈরি মালা দিই, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হন এবং তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেন।"

তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২/৩৩) ব্রহ্মা বলছেন, "হে মধুসূদন! আপনার শুদ্ধ ভক্তরা আপনার সখ্য উপভোগ করেন এবং তাঁদের শত্রুরা কখনও তাঁদের পরাভূত করতে পারে না। তাঁরা জানেন যে, আপনি সর্বদাই তাঁদের রক্ষা করছেন এবং তাঁরা হেলাভরে তাঁদের শত্রুদের মাথার উপর দিয়ে হেঁটে চলে যান।" পক্ষান্তরে বলা যায়, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমলে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা সর্বদাই তাঁদের সমস্ত শত্রুদের পরাভূত করার গর্ব অনুভব করেন।

মথুরার এক তন্তুজীবী শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে বৃন্দাবন-নাথ! আমার প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলে আমি এত গর্ব অনুভব করছি যে, গভীর ধ্যানমগ্ন মহর্ষিদের অভিলষিত বৈকুণ্ঠনাথের অনুগ্রহ লাভের অপেক্ষাও আমি করি না।" অর্থাৎ, যোগী ও মহর্ষিরা যদিও বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত এতই গর্বিত যে, তাঁরা এই ধ্যানের অধিক মাহাত্ম্য দেন না। জীবনের পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার ফলে এই গর্বের উদয় হয়।

## শঙ্কা

শ্রীকৃষ্ণের গাভী, গোবৎস ও গোপ-সখাদের ব্রহ্মা হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সহসা তাঁর চৌর্যকর্মের বিষয়ে শঙ্কার উদয় হওয়ার ফলে, সংশয়-বিস্ফারিত আটটি নেত্রের দ্বারা তিনি চতুর্দিক অবলোকন করতে থাকেন। এটি চৌর্য থেকে উৎপন্ন শঙ্কাজনিত প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের জন্য অক্রূর পর্যাপ্ত মাত্রায় স্বর্ণ উৎপাদনক্ষম স্যমন্তক মণি চুরি করেন। কিন্তু তাঁর সেই চৌর্যকর্মের জন্য তিনি অনুতপ্ত হন। এটি শ্রীকৃষ্ণের জন্য চৌর্যজনিত শঙ্কার একটি দৃষ্টান্ত।

দেবরাজ ইন্দ্র যখন বৃন্দাবনে প্রবলভাবে বারিবর্ষণ করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হওয়ার জন্য তাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়। সেই সময় গভীর শঙ্কায় ইন্দ্রের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল।

## ত্রাস

আকাশে বিদ্যুৎ দেখে, হিংস্র পশু দেখে অথবা প্রচণ্ড শব্দ শুনে হৃদয় যখন ক্ষুব্ধ হয়, তাঁকে বলা হয় ত্রাস। এই ত্রস্ত অবস্থায় মানুষ কোন আশ্রয় অবলম্বন

করতে চায়। তখন দেহে রোমাঞ্চ, কম্পন ও ভ্রম দেখা দেয়। কখনও আবার স্তম্ভন দেখা দেয়।

*পদ্যাবলীতে* একজন গোপী বলেছেন, "হে সখী! অসুরদের রাজা কংসের রাজধানী মথুরায় অসুর পরিবৃত হয়ে কৃষ্ণের অবস্থানের কথা মনে করে আমি ভয়ে সন্ত্রস্ত হচ্ছি।" এটি শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করে ত্রাসজনিত ভগবৎ-প্রেম।

একটি বৃষের রূপ ধারণ করে বৃষাসুর যখন বৃন্দাবনে আসে, তখন গোপিকারা অত্যন্ত ভীত হন। এইভাবে বিচলিত হয়ে তাঁরা তমাল বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরেন। এটি হিংস্র পশুর ভয়ে উৎপন্ন ত্রাস এবং আশ্রয়ের অন্বেষণে কৃষ্ণস্মৃতিজনিত প্রেম। বৃন্দাবনে শিয়ালের ডাক শুনে মা যশোদার ভয় হত যে, তারা হয়ত কৃষ্ণকে আক্রমণ করবে। তাই খুব সাবধানতার সঙ্গে তিনি তাঁকে আগলে রাখতেন। এটি ভয়ঙ্কর শব্দ থেকে উদ্ভূত ত্রাসজনিত কৃষ্ণপ্রেমের একটি দৃষ্টান্ত। এই ত্রাস ভয় থেকে ভিন্ন। ভয়ে পূর্বাপর বিচার থাকে, কিন্তু প্রেম থেকে উৎপন্ন এই ত্রাসে কোন রকম চিন্তার অবকাশ থাকে না।

## আবেগ

প্রিয় বস্তু থেকে, অপ্রিয় বস্তু থেকে, অগ্নি, বায়ু, বর্ষণ, প্রাকৃতিক উৎপাত, বিশালকায় হস্তী দর্শন অথবা শত্রুদর্শনের ফলে আবেগের উদয় হয়। প্রিয় বস্তু দর্শন থেকে উৎপন্ন আবেগের ফলে বাণীর চপলতা ও মধুরতা প্রকাশ পায়। অপ্রিয় বস্তু দর্শনজনিত আবেগের ফলে চিৎকার ও ক্রন্দন হয়। অগ্নিজনিত আবেগের ফলে পলায়ন হয়, তার ফলে দেহে কম্পন, চক্ষু মুদিত করা এবং অশ্রু দেখা দিতে পারে। প্রবল বায়ুর প্রভাবে যে আবেগ উৎপন্ন হয়, তার ফলে দ্রুত গমন এবং চক্ষু মর্দন দেখা দেয়। প্রবল বর্ষণজনিত আবেগের ফলে ছত্রধারণ করা এবং শরীরে সংকোচন আদি দেখা দেয়। আকস্মিক উৎপাত-জনিত আবেগের ফলে মুখের বিবর্ণতা, বিস্ময় ও দেহের কম্পন দেখা যায়। বিশালকায় হস্তী দর্শনজনিত আবেগের ফলে লম্ফ আদি ভীতির বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায় এবং পিছন ফিরে তাকাতে দেখা যায়। শত্রুজনিত আবেগের ফলে ধারাল অস্ত্রের অন্বেষণ এবং পলায়ন করার চেষ্টা দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের বন থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন মা যশোদা তাঁর পুত্রকে দেখে এতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন যে, তাঁর স্তন থেকে দুধ ঝরে পড়ত। এটি প্রিয় বস্তু দর্শনজনিত আবেগের একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২৩/১৮) শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন, "হে রাজন! দ্বিজপত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে

স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে দর্শন করার জন্য সর্বদাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁরা যখন শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অদূরেই রয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁকে দেখার জন্য এতই আকুল হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের গৃহ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন।" এটি প্রিয় পাত্রের উপস্থিতি-জনিত আবেগের একটি দৃষ্টান্ত।

পূতনা রাক্ষসী যখন শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়, মা যশোদা তখন অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন এবং আবেগপূর্ণ স্বরে বলতে থাকেন, "এটি কি? এটি কি?" যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর শিশুসন্তান কৃষ্ণ মৃত রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে খেলা করছে, মা যশোদা তখন সম্পূর্ণভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকেন। এটি বীভৎস কোন দৃশ্য দর্শনজনিত আবেগের উদাহরণ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন যমলার্জুন উৎপাটন করেন এবং মা যশোদা যখন সেই বৃক্ষ দুটির পতনের শব্দ শোনেন, তখন তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি উপরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। এটি প্রচণ্ড শব্দ শ্রবণজনিত আবেগের একটি দৃষ্টান্ত।

বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে দেখে সমস্ত গোপেরা একত্রিত হয়ে ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আবেদন করতে থাকেন, তিনি যেন তাঁদের রক্ষা করেন। এটি অগ্নি থেকে উৎপন্ন আবেগের একটি দৃষ্টান্ত।

তৃণাবর্তাসুর এক সময় মস্ত বড় বড় বৃক্ষসহ শ্রীকৃষ্ণকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। সেই সময় মা যশোদা তাঁর পুত্রকে না দেখতে পেয়ে এতই অধীর হয়ে পড়েন যে, তিনি ইতস্তত তাঁকে খুঁজতে থাকেন। এটি প্রচণ্ড বায়ুজনিত আবেগের একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২৫/১১) বৃন্দাবনে ইন্দ্রের মুষলধারায় বারিবর্ষণের বর্ণনা রয়েছে। সেই সময় সমস্ত গাভী ও গোপবালকেরা প্রচণ্ড বায়ু ও ঠাণ্ডায় এত কাতর হয়ে পড়ে যে, তারা একত্রিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এটি প্রচণ্ড বারিবর্ষণ জনিত আবেগের দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে বাস করছিলেন, তখন একদিন প্রবল শিলাবৃষ্টি হয়। তখন সেখানকার প্রবীণেরা তাঁকে বলতে থাকেন, "হে কৃষ্ণ! এখন কোথাও যেও না। তোমার থেকে অধিক বলশালী বয়স্করাও যখন এখান থেকে বেরোতে পারেন না, আর তুমি তো একটি ছোট্ট শিশু। সুতরাং তুমি এখানেই বসে থাক!" এটি প্রবল শিলাবৃষ্টি জনিত আবেগের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয় দমন করার জন্য যমুনার বিষাক্ত জলে প্রবেশ করেন, তখন গভীর আবেগভরে মা যশোদা বলতে থাকেন, "দেখ, পৃথিবী কিভাবে কম্পিত হচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে এবং আকাশে উল্কাপাত হচ্ছে!

আমার শিশুপুত্র যমুনার জলে প্রবেশ করেছে। এখন আমি কি করি?" এটি প্রাকৃতিক উৎপাতজনিত আবেগের একটি দৃষ্টান্ত।

কংসের রঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশালকায় মত্ত হস্তীদের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন সেখানে সমবেত পুরস্ত্রীরা তাঁকে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, "হে বালক! দয়া করে এখনই এখান থেকে তুমি চলে যাও! তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, বিশালকায় হস্তীগুলি তোমাকে আক্রমণ করতে আসছে? তুমি যে সরল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছ, তা দেখে আমরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছি।" শ্রীকৃষ্ণ তখন মা যশোদাকে বললেন, "হে মাতঃ! যে সমস্ত হস্তী এবং অশ্বগুলি প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসছে, তাদের পদক্ষেপে চতুর্দিক ধুলায় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং তার ফলে এই সমস্ত কমলনয়না স্ত্রীলোকেরা কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। এই সমস্ত হস্তী ও অশ্বদের ভয়ে তোমরা ভীত হয়ো না। আমার সামনে কেশী দৈত্য আসুক না কেন, আমার বাহুযুগল তাদের পরাভূত করবার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং বিচলিত হয়ো না।"

*ললিত-মাধবে* একজন সখী মা যশোদাকে বলছেন, "পর্বতের মতো বিশাল ও বলশালী শঙ্খচূড় অসুর যখন তোমার কন্দর্পসদৃশ মনোহর শিশুপুত্রকে আক্রমণ করে, তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য বৃন্দাবনে কেউই ছিল না। কিন্তু তবুও তোমার শিশুপুত্রটি সেই বিশাল অসুরকে নিধন করে। পূর্বজন্মে তুমি নিশ্চয়ই কঠোর তপস্যা করে প্রভূত পুণ্যফল অর্জন করেছিলে, যার ফলে তোমার পুত্রটি এই রকম বিপদ থেকে উদ্ধার পেল।"

*ললিত-মাধবে* স্বয়ম্বর সভা থেকে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীকে হরণ করার একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে—সেই সময় উপস্থিত সমস্ত রাজা ও রাজকুমারেরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে থাকেন, "আমাদের হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনুক, বাণ ও তলোয়ার রয়েছে, সুতরাং আমরা কেন কৃষ্ণের ভয়ে ভীত হব? চল, আমরা সকলে মিলে তাকে আক্রমণ করি! ও তো একটি কামার্ত গোপবালক ছাড়া আর কিছু নয়। সে এইভাবে রাজকুমারীকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারে না! চল, আমরা সকলে মিলে তাকে আক্রমণ করি!" এটি শত্রুর উপস্থিতি জনিত আবেগের একটি দৃষ্টান্ত।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সমস্ত কার্যকলাপই সবিশেষ।

## উন্মত্ততা

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে প্রার্থনা করে বলেছেন, "শ্রীমতী রাধারাণী সমস্ত জগৎকে পবিত্র করুন, কেন না তিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের

কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে তিনি কখনও কখনও পাগলিনীর মতো শূন্য পাত্রে দধিমন্থন করার চেষ্টা করেন। তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে, গাভীর পরিবর্তে তিনি বৃষ দোহন করতে শুরু করেন।" রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক উন্মাদনার এগুলি কয়েকটি দৃষ্টান্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বিষময় যমুনার জলে প্রবেশ করেন, তখন মা যশোদা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। বিষের ঔষধি খোঁজার পরিবর্তে তিনি বৃক্ষদের জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন, তারা সর্প বশীভূত করার মন্ত্র জানে কি না। বৃক্ষদের সামনে হাত জোড় করে প্রণাম করে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, "দয়া করে আপনারা বলুন, কোন্ ঔষধির প্রয়োগে কৃষ্ণ এই বিষময় জল থেকে রক্ষা পেতে পারে?" এটি মহাবিপদজনিত উন্মাদনার একটি দৃষ্টান্ত।

ভক্ত যে কিভাবে ভগবৎ-প্রেমে উন্মাদ হয়ে যায়, তার বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩০/৪) রয়েছে। ব্রজগোপিকারা বৃন্দাবনের বনে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজছিলেন। তাঁরা তখন উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একস্থানে সীমিত নন, তিনি সর্বব্যাপ্ত। তিনি আকাশে রয়েছেন, জলে রয়েছেন, বায়ুতে রয়েছেন, এবং অন্তর্যামীরূপে সকলের হৃদয়ে রয়েছেন। তাই গোপিকারা সমস্ত গাছদের ও লতাগুল্মদের জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, পরমেশ্বর ভগবান কোথায় রয়েছেন। এটি ভগবৎ-প্রেমে ভক্তদের উন্মাদ হওয়ার একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

তেমনই, ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবে ব্যাধির লক্ষণও প্রকাশ পেতে দেখা যায়। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই অবস্থাকে মহাভাব বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবৎ-প্রেমের এই অতি উন্নত অবস্থাকে বলা হয় দিব্য উন্মাদনা।

## অপস্মার

শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরায় চলে যান, তখন শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর কাছে বার্তা প্রেরণ করেন যে, তাঁর মাতা ব্রজরাণী তাঁর বিরহে এতই কাতর হয়ে পড়েছেন যে, সমুদ্রের উপকূলে যেমন ফেনা দেখা যায়, সেই রকম ফেনা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। কখনও কখনও তিনি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাঁর বাহু উত্তোলন করছেন, কখনও বা ভূমিতে লুটাচ্ছেন এবং প্রবলভাবে গর্জন করছেন। আবার কখনও বা শান্ত সমুদ্রের মতো সম্পূর্ণভাবে মৌনতা অবলম্বন করছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে বলা হয় অপস্মার। কৃষ্ণপ্রেমে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হলে এই সমস্ত লক্ষণগুলির উদয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে আর একটি বার্তা প্রেরণ করা হয় যে, তিনি যখন কংসকে বধ করেন, তখন কংসের এক আসুরিক বন্ধু সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ হয়ে যায়। সেই অসুরটির মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছিল, ঢেউয়ের মতো সে তার হস্ত আন্দোলন করছিল এবং ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। এই আসুরিক ভাবগুলি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বীভৎস রসে সম্বন্ধিত হওয়ার ফলে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একটি গৌণ রসের সম্পর্ক। প্রথম পাঁচটি রসকে বলা হয় মুখ্য রস এবং অন্য সাতটি গৌণ রস। কোন না কোনভাবে সেই অসুরটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছিল, কারণ সে যখন শুনতে পায় যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করেছে, তখন তার মধ্যে এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, এই ধরনের লক্ষণেও দিব্যভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

## ব্যাধি

বৃন্দাবনে অপ্রকট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর কয়েকজন সখা তাঁকে জানান, "হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে ব্রজবাসীরা এতই কাতর হয়ে পড়েছে যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীর উত্তপ্ত হয়েছে এবং তারা ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারছে না। তারা কেবল ভূমিতে শয়ন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১২/৪৪) বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে অনন্তদেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে শিথিলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবুও তিনি নিজেকে সংবরণ করে, মৃদুমন্দ স্বরে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। এই শিথিলতা দিব্য আনন্দপ্রসূত জ্বরভাব থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* আর এক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁদের শৈশব লীলার বহু বছর পরে ব্রজবালারা যখন সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁদের শ্বাস, চোখের পলক ও অন্য সমস্ত দৈহিক কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়ে যায়, এবং তাঁরা মূর্তির মতো শ্রীকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। এটি অপ্রাকৃত হর্ষজনিত ব্যাধির আর একটি দৃষ্টান্ত।

# ত্রিংশতি অধ্যায়

# কৃষ্ণপ্রেমের অন্যান্য ভাব

## বিহ্বলতা

*হংসদূত* নামক কাব্যগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, "একদিন শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনায় শ্রীমতী রাধারাণী যখন অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন, তিনি তখন তাঁর কয়েকজন সখীসহ যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অতি পরিচিত একটি কুটির দর্শন করেন, যেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নানা প্রকার দিব্য রস আস্বাদন করেছিলেন। সেই সমস্ত ঘটনার কথা স্মরণ হওয়ার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন। এই বিহ্বলতা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দেয়।" এটি বিরহজনিত বিহ্বলতা।

তেমনই, ভীতিজনিত বিহ্বলতারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তখন তাঁর মধ্যে এই লক্ষণগুলি দেখা গিয়েছিল। তিনি এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর হাত থেকে ধনুক ও বাণ স্খলিত হয়েছিল এবং তিনি কোন কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

## মৃত্যু

এক সময় বকাসুর একটি বিরাট বক পক্ষীর রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গোপসখাদের হাঁ করে গিলতে আসে। কৃষ্ণকে বকাসুরের মুখে প্রবেশ করতে দেখে বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকেরা মৃতবৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। কোন বীভৎস দৃশ্য অথবা দুর্ঘটনার ফলে ভক্তরা মোহিত হয়ে পড়লেও তাঁরা কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যান না। চরম বিপদেও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারেন। এটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের অপূর্ব লাভ। মৃত্যুর সময়েও, যখন দেহের সমস্ত কার্যকলাপ বিকল হয়ে যায়, তখন ভক্ত তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং তার ফলে তিনি পুনরায় এই ভবসমুদ্রে পতিত হওয়ার চরম বিপদ থেকে রক্ষা পান। এইভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাবে ভক্ত প্রাকৃত স্তর থেকে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন।

এই সম্পর্কে মথুরায় দেহত্যাগ করেছেন যে সমস্ত মানুষ, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "এই সমস্ত মানুষদের শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল,

তাঁদের চক্ষু সম্পূর্ণভাবে খোলা ছিল, তাঁদের দেহ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের জড় শরীর ত্যাগ করেন।” মৃত্যুর পূর্বে এই লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

## আলস্য

কখনও কখনও আত্মতৃপ্তি অথবা অধিক পরিশ্রমের অরুচি থেকে, শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেউ যখন তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে চায় না, তাকে বলা হয় আলস্য। এই আলস্য কৃষ্ণপ্রেমেরও একটি অভিব্যক্তি। যেমন, গোবর্ধন পূজা উৎসবে ব্রাহ্মণেরা এত তৃপ্ত হয়েছিলেন যে, তাঁরা নন্দ মহারাজকে বলেন, “হে গোপেন্দ্র! গোবর্ধন-উৎসবে আমরা এত তৃপ্ত হয়েছি যে, আমরা আর আশীর্বাদ করতেও সমর্থ নই।” এটি আত্মতৃপ্তি-জনিত আলস্যের একটি উদাহরণ।

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে খেলার ছলে লড়াই করছিলেন, সুবল তখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর অন্যান্য সখাদের বলেন, “আমার সঙ্গে লড়াই করে সুবল অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাকে আর লড়াই করতে আহ্বান করে বিরক্ত কোরো না।” অধিক পরিশ্রমে অনীহাজনিত আলস্যের এটি একটি দৃষ্টান্ত।

## জড়তা

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২১/১৩) বর্ণনা করা হয়েছে, ব্রজগোপিকারা বৃন্দাবনের গাভীদের কৃষ্ণপ্রেম-জনিত জড়তার প্রশংসা করেছেন। গোপিকারা দেখেন যে, গাভীরা শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, তারা যেন সেই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গের অমৃত পান করছে। গোবৎসরা স্তম্ভিত হয়ে দুধ পান করতে ভুলে গিয়েছিল। তারা যেন তাদের চক্ষু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছিল এবং তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। এটি শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি শ্রবণজনিত জড়তার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কথা শ্রবণের ফলে যখন লক্ষণা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি নির্নিমেষ নয়নে জড়ের মতো নিশ্চল হয়ে পড়েন। এটি শ্রবণজনিত জড়তার একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৭১/৩৯) বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম আদরের সঙ্গে তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন, তখন আনন্দে অধীর হয়ে তিনি আত্মবিস্মৃত হন। এটি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত জড়তার একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৯/৩৬) আর একটি উদাহরণ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করছিলেন, তখন ব্রজগোপিকারা, যাঁদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করছিল, তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে জড়বৎ শ্রীকৃষ্ণের রথ চলে যেতে দেখেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত রথের ধ্বজা এবং রথের চাকা থেকে উত্থিত ধূলি দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ তাঁরা ছবির মতো নিশ্চল হয়ে তা দেখছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের এক সখা এক সময় তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "হে মুকুন্দ! তোমার বিরহ ব্যথায় ব্যথিত গোপবালকদের পেশাদারি ব্রাহ্মণের বাড়ির অনাদৃত বিগ্রহের মতো মনে হচ্ছে।" এক ধরনের পেশাদারি ব্রাহ্মণ আছে, যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জন করতে বিগ্রহ পূজা করে। এই ধরনের ব্রাহ্মণেরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি মোটেই আসক্ত নয়; তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধু সেজে অর্থ উপার্জন করা। তাই, এই ধরনের পেশাদারি ব্রাহ্মণদের পূজিত বিগ্রহের ঠিকমতো শৃঙ্গার (অঙ্গরাগ) হয় না, তাঁদের সাজসজ্জার পরিবর্তন হয় না এবং তাঁদের শ্রীঅঙ্গ পরিষ্কার করা হয় না। তাঁরা দেখতে মলিন এবং তত আকর্ষণীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা খুব সাবধানতার সঙ্গে করা উচিত। প্রতিদিন তাঁদের বসন পরিবর্তন করা উচিত এবং যতদূর সম্ভব রত্ন-অলঙ্কারে তাঁদের ভূষিত করা উচিত। সব কিছুই এত পরিষ্কার ও সুন্দর হওয়া উচিত, যাতে সেই বিগ্রহ দর্শন করে মানুষ আকৃষ্ট হয়। এখানে পেশাদারি ব্রাহ্মণদের বাড়িতে বিগ্রহের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, কেন না সেই সমস্ত মূর্তি মোটেই আকর্ষণীয় নয়। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখাদের অনাদৃত বিগ্রহের মতো মনে হচ্ছিল।

## ব্রীড়া (লজ্জা)

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করেন। তাঁর এক সখী তখন তাঁকে বলেন, "হে রাধে! তুমি তোমার সৌন্দর্য ও তোমার সত্তা গোবিন্দকে অর্পণ করেছ। এখন তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। দয়া করে হর্ষভরে তাঁর দিকে তাকাও। হাতি বিক্রি করে কি অঙ্কুশের জন্য কৃপণতা করা উচিত?" এটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার হর্ষজনিত লজ্জার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বর্গ থেকে পারিজাত পুষ্প নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে বাধা দেন। ফলে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার ফলে ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হন। নতমস্তকে তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে বলেন, "ঠিক

আছে, ইন্দ্র, তুমি এখন এই পারিজাত নিয়ে যেতে পার। তা না হলে তোমার পত্নী শচীদেবীর কাছে তুমি মুখ দেখাতে পারবে না।" ইন্দ্রের এই লজ্জার কারণ পরাজয়। আর এক সময় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের সমস্ত গুণের প্রশংসা করছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে, উদ্ধব লজ্জায় মস্তক অবনত করেন।

*হরিবংশতে* বর্ণনা করা হয়েছে—রুক্মিণীর সামনে নিজেকে হীন বলে মনে করে সত্যভামা বলেন, "হে কৃষ্ণ! রৈবতক পর্বত সর্বদাই বসন্তকালীন পুষ্পে পরিপূর্ণ, কিন্তু তোমার প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে সেই সৌন্দর্য দর্শন করে কি লাভ?" এটি অবজ্ঞাজনিত লজ্জার একটি দৃষ্টান্ত।

## গোপনীয়তা

বাহ্যরূপে অন্য কোন ভাবকে প্রকট করে, নিজের যথার্থ মনোভাব গোপন করে রাখা প্রেমের গোপনীয়তা নামক ভাবের লক্ষণ। এই মনোভাবের ফলে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করে, অসম্ভব কোন কার্যসাধনের চেষ্টা করে অথবা মনের যথার্থ চিন্তা গোপন করে কথা বলে মনের ভাব গোপন করা হয়। মনোভাব সম্বন্ধে পারঙ্গত আচার্যদের মতানুসারে, হৃদয়ের যথার্থ স্নেহ গোপন রাখার এই প্রয়াস কৃষ্ণপ্রেমের একটি লক্ষণ।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩২/১৫) শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, "হে রাজন! ব্রজগোপিকারা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং রহস্যময় হাস্য ও আকর্ষণীয় বেশভূষায় তাঁরা সজ্জিত ছিলেন। হৃদয়ে কাম ভাবের উদ্দীপনা করে তাঁরা বিচরণ করতেন, কখনও কখনও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের করকমল তাঁদের অঙ্কে স্থাপন করতেন, এবং কখনও তাঁরা তাঁর চরণকমল তাঁদের বক্ষে ধারণ করতেন। তারপর তাঁরা তাঁদের মনোভাব গোপন করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন, যেন তাঁরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।"

প্রেমজনিত গোপনীয়তার আর একটি উদাহরণ হচ্ছে, হাস্য-পরিহাসে পরম দক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যখন সত্যভামার প্রাসাদের প্রাঙ্গণে পারিজাত রোপণ করেন, তখন বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণীর অত্যন্ত ঈর্ষা হয়। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক সুশীলতার ফলে তিনি তা ব্যক্ত হতে দেননি। তখন রুক্মিণীর যথার্থ মনোভাব কেউই জানতে পারেনি। এটি প্রতিযোগিতাজনিত গোপনীয়তার একটি উদাহরণ।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১/১১/৩২) আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পরিবার-পরিজনেরা বিভিন্নভাবে তাঁকে অভিবাদন করেন। দ্বারকার মহিষীরা দূর থেকে তাঁদের পতিকে দর্শন করে মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং মৃদু কটাক্ষে তাঁকে দেখতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ

যখন কাছে আসেন, তখন তাঁরা তাঁদের পুত্রদের তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে দেন। অন্যরা লজ্জাবশত অশ্রু সংবরণ করার চেষ্টা করছিলেন, তবুও তাঁরা তাঁদের অশ্রু রোধ করতে সক্ষম হলেন না। এটি লজ্জাজনিত গোপনীয়তার একটি দৃষ্টান্ত।

আর এক সময়, শ্রীকৃষ্ণকে অন্য কোন রমণীর প্রতি অনুরক্ত বলে মনে করে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর এক সখীকে বলেন, "হে সখী! যখনই আমার মনে হয় যে, কৃষ্ণ অন্য কোন রমণীর প্রতি আসক্ত, তখন ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কৃষ্ণ যাতে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে না ফেলে, সেই জন্য আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।" এটি লজ্জা ও কপটতাজনিত গোপনীয়তার একটি দৃষ্টান্ত।

এক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর যদিও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তিনি তাঁর সেই মনোভাব হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে কেউ তা জানতে না পারে।" এটি শিষ্টতাজনিত গোপনীয়তার একটি দৃষ্টান্ত!

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে সখাসুলভ বার্তালাপ করে আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সেবক পত্রীও সেই বার্তালাপ উপভোগ করছিলেন। কিন্তু তখন, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের দাস সেই কথা স্মরণ করে, শ্রদ্ধা সহকারে মস্তক অবনত করে তিনি তাঁর হাস্য সংবরণ করেন। এটি শ্রদ্ধাজনিত গোপনীয়তার একটি দৃষ্টান্ত।

## স্মৃতি

শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার ফলে দিব্য প্রেমের অনেক লক্ষণ দেখা যায়। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের এক সখা তাঁকে বলেন, "হে মুকুন্দ! আকাশে নীল মেঘ দেখে কমলনয়না শ্রীমতী রাধারাণী তৎক্ষণাৎ তোমাকে স্মরণ করতে থাকেন। এই মেঘ দর্শন করা মাত্রই তোমার সঙ্গলাভ করার জন্য তিনি আকুল হয়ে ওঠেন।" এটি শ্রীকৃষ্ণসদৃশ কোন বস্তু দর্শন করার ফলে প্রেমের বশে কৃষ্ণস্মৃতির একটি উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি জলভরা মেঘের মতো ঘনশ্যাম, তাই সেই নীল মেঘ দেখে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন।

এক ভক্ত বলেন যে, চিত্ত যথাযথভাবে একাগ্র না হলেও, উন্মত্ততার বশে কখনও কখনও তিনি হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের স্মরণ করেন। নিয়মিত অভ্যাসের ফলে কৃষ্ণস্মৃতির এটি একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, যে সমস্ত ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের ধ্যান করছেন, তাঁরা যদি ক্ষণিকের জন্যও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, তবুও তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যরূপ দর্শন করতে পারেন।

## বিতর্ক

শ্রীকৃষ্ণের এক অতি অন্তরঙ্গ সখা মধুমঙ্গল ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। শ্রীকৃষ্ণের অধিকাংশ সখাই ছিলেন বৈশ্য বংশোদ্ভূত গোপবালক, তবে অন্য কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে, বৃন্দাবনে বৈশ্য ও ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য। এই মধুমঙ্গল একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলতে থাকেন, "হে সখে! তোমার মাথার ময়ূরের পালক মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এবং তোমাকে অর্পণ করা হয়েছে যে ফুলমালা, সেই সম্বন্ধেও তোমার কোন হুঁশ নেই। আমার মনে হয় তোমার এই অন্যমনস্কতার কারণ হচ্ছে, তোমার নেত্ররূপী ভ্রমর শ্রীমতী রাধারাণীর নেত্ররূপ কমলের দিকে ধাবিত হচ্ছে।" এটি বিমর্ষজনিত বিতর্কের একটি দৃষ্টান্ত।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণীর এক সখী তাঁকে বলেন, "হে সখী! এটি কি একটি গমনশীল তমাল তরু? না, কেন না এতে গতি ও সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে। তা হলে এটি কি মেঘ? না, এটি যদি মেঘ হয়, তা হলে সুন্দর চন্দ্র কোথায়? তাই আমার মনে হচ্ছে যে, ইনি নিশ্চয়ই ভুবন-মনোহর পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর মধুর মুরলীধ্বনিতে ত্রিভুবন মোহিত হয়েছে। ইনি নিশ্চয়ই গিরি-গোবর্ধনের সম্মুখে দণ্ডায়মান মুকুন্দ।" এটি সংশয়জনিত বিতর্কের একটি দৃষ্টান্ত।

## চিন্তা

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২৯/২৯) বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন সমস্ত গোপিকাদের গৃহে ফিরে যেতে বলেন, তখন তাঁদের সেই প্রস্তাব ভাল লাগেনি। তার ফলে মর্মাহত হয়ে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছিলেন এবং তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডল শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় তাঁরা নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে রেখা অঙ্কন করছিলেন, এবং তাঁদের অশ্রুধারায় ধৌত হয়ে চোখের কাজল কুমকুমের রঙে আরক্তিম বক্ষঃস্থলে পতিত হচ্ছিল। এটি প্রেমজনিত চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণের এক সখা এক সময় তাঁকে জানান, "হে মুরারি! তুমি ঘরে ফিরে যাওনি বলে তোমার স্নিগ্ধস্বভাবা স্নেহময়ী মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন এবং অনেক কষ্টে সারা সন্ধ্যা গৃহের প্রাঙ্গণে বসে থেকেছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি খেলায় মগ্ন থেকে তোমার মায়ের কথা ভুলে গেছ।" এটি প্রেমজনিত উৎকণ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত।

মা যশোদা যখন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা থেকে ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নন্দ মহারাজ বলেন, "হে যশোদে!

দুশ্চিন্তা করো না। দয়া করে তোমার কমলের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল থেকে অশ্রু মুছে ফেল। এইভাবে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলারও কোন কারণ নেই। আমি এক্ষুণি অক্রূরের সঙ্গে কংসের প্রাসাদে গিয়ে তোমার পুত্রকে ফিরিয়ে আনব।" এটি অপ্রতিহত জনিত উৎকণ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত।

## মতি

*পদ্ম-পুরাণের* 'বৈশাখ-মাহাত্ম্যে' এক ভক্ত বলেছেন, "যদিও অষ্টাদশ *পুরাণের* কোন কোন *পুরাণে* ভগবানের মহিমা কীর্তন করার পন্থা নির্দেশিত হয়নি, পক্ষান্তরে দেব-দেবীদের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, কিন্তু এইভাবে দেব-দেবীদের মহিমা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কীর্তন করলেও পরম পুরুষার্থ সাধিত হয় না। কেউ যদি গভীরভাবে বিচার করে এই সমস্ত *পুরাণগুলি* পাঠ করেন, তা হলে তিনি দেখতে পাবেন যে, সেখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বিষ্ণুই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।" এটি মতিজনিত ভগবৎ-প্রেমের একটি উদাহরণ।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৬০/৩৯) শ্রীকৃষ্ণকে লিখিত রুক্মিণী দেবীর পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যান। সেই অনুরোধ করে রুক্মিণী দেবী লিখেছিলেন, "হে প্রাণনাথ! যে সমস্ত মহর্ষিরা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা আপনার অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করেন, এবং তার ফলে আপনি আপনার এই সমস্ত ভক্তদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিতরণ করে দেন। আপনার কৃপা-কটাক্ষের ফলে যেমন অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, তেমনই আবার আপনার ইচ্ছায় অনন্তকালের প্রভাবে সমস্ত সুখ তিরোহিত হয়ে যেতে পারে। তাই আমি ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি মহান পুরুষদের পরিত্যাগ করে আপনাকেই পতিরূপে বরণ করেছি—অপরের আর কি কথা!" কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার মাধ্যমে রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছিলেন। এটি মতিজনিত ভগবৎ-প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত।

## ধৃতি

জ্ঞান, দুঃখ-নিবৃত্তি অথবা ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য লাভ করাকে ধৃতি বলা হয়। এই অবস্থায় মন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে যায়, চরম বিপদেও তখন তিনি আর বিচলিত হন না এবং তখন তাঁর আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

পণ্ডিত ভর্তৃহরির মতানুসারে, কেউ যখন এই ধৃতির স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি মনে করেন, "আমি উচ্চপদস্থ রাজপদের আকাঙ্ক্ষা করি না।" তার থেকে বরং আমি যথার্থ পরিধানের অভাবে নগ্ন হয়ে থাকব। বিছানা ছাড়াই মাটিতে শয়ন করব, কিন্তু তবুও আমি অন্য কারও দাসত্ব বরণ করব না, এমন কি রাজারও দাসত্ব করব না।" অর্থাৎ, কারও চিত্তে যখন ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, তখন তিনি অনায়াসে জড়-জাগতিক সব রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ মনে মনে ভাবতেন, "আমার গোচারণ-ভূমিতে সৌভাগ্যলক্ষ্মী স্বয়ং বিরাজমান। আমার দশ লক্ষেরও অধিক গাভী রয়েছে, যারা ইতস্তত বিচরণ করছে, এবং সর্বোপরি আমার শ্রীকৃষ্ণের মতো শক্তিশালী ও অদ্ভুতকর্মা পুত্র রয়েছে। সুতরাং গৃহস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমি সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত।" এটি সব রকমের ক্লেশ অপগত হওয়ার ফলে ধৃতির একটি দৃষ্টান্ত।

আর এক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে, এক ভক্ত বলেছেন, "আমি সর্বক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের লীলারূপী অমৃতের সমুদ্রে সন্তরণ করছি, এবং আমার ধর্ম, অর্থ, কাম, এমন কি ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মোক্ষলাভের প্রতিও আর কোনও আকর্ষণ নেই।" এটি জগতের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ লাভ করার ফলে ধৃতির একটি দৃষ্টান্ত। এই জগতের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত।

## হর্ষ

*বিষ্ণুপুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য আসেন, তখন তাঁদের মুখমণ্ডল দর্শন করে তিনি দিব্য আনন্দে মগ্ন হন এবং তাঁর শরীরে পুলক আদি প্রেমের লক্ষণ দেখা যায়। এই অবস্থার নাম হর্ষ।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৩/১১) উল্লেখ আছে, "রাসনৃত্য-পরায়ণ জনৈকা গোপিকা যখন দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বাহু তাঁর স্কন্ধ বেষ্টন করে আছে, তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণের কপোল চুম্বন করেন।" এটি অভীষ্ট সিদ্ধিজনিত হর্ষের একটি দৃষ্টান্ত।

## ঔৎসুক্য

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৭১/৩৩) বর্ণনা করা হয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন, তখন সেই নগরীর যুবতী রমণীরা তাঁকে দেখবার জন্য এত উৎসুক হয়ে ওঠেন যে, রাত্রিবেলাতেও যখন তাঁরা তাঁদের পতির সঙ্গে শয্যায় শয়ন করে ছিলেন, তখনও তাঁরা তাঁদের ঔৎসুক্য দমন করতে

পারেননি। যদিও তাঁদের বেশবাস ছিল অবিন্যস্ত এবং তাঁদের কেশপাশ শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং গৃহে তাঁদের নানা কাজ ছিল, তবুও তাঁরা সব কিছু ফেলে রেখে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য পথে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।" এটি ভগবৎ-প্রেমের ঔৎসুক্যের একটি দৃষ্টান্ত।

*স্তবাবলীতে* শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা প্রার্থনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরে শ্রীমতী রাধারাণী এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনবাসীদের কাছে তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি যখন প্রথম দর্শন করেন, তখন তিনি দিব্য প্রেমানন্দে এতই মগ্ন হয়ে যান যে, তিনি তাঁর কান চুলকাতে শুরু করেন। শ্রীমতী রাধারাণী ও অন্য সমস্ত ব্রজবালারা চতুর বার্তালাপে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তাই যখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন তাঁরা পরস্পরের মধ্যে বার্তালাপ করতে শুরু করেন, এবং তাঁদের জন্য পুষ্পচয়ন করার ভান করে, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করে পর্বত-কন্দরে প্রবেশ করেন। ব্রজগোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের ঔৎসুক্যজনিত প্রেমলীলা-বিলাসের এটি একটি দৃষ্টান্ত।

## উগ্রতা

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয় সর্পের মস্তকে নৃত্য করতে করতে সেই ভীষণ সর্পকে দমন করছিলেন, তখন কালীয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে দংশন করে। সেই সময় গরুড় রোষবশে চাপা স্বরে বলতে থাকেন, "শ্রীকৃষ্ণ এত শক্তিশালী যে, তাঁর বজ্রসদৃশ কণ্ঠস্বর শুনে কালীয়-পত্নীদের গর্ভপাত হয়েছে। আমার ইচ্ছে করছে এক্ষণি ওকে গিলে খাই, কিন্তু আমার প্রভুর সামনে আমি তা করতে পারি না, কেন না তা হলে তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হতে পারেন।" এটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসম্মান সহ্য করতে অসমর্থ হওয়ার ফলে উগ্রতার একটি দৃষ্টান্ত।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার বিরোধিতা করে, তখন কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা সহ্য করতে পারে না, সেই অসুর আমার শত্রু। তাই তার মদোন্মত্ত মস্তকে আমি যমদণ্ড থেকেও ভয়ঙ্কর আমার বামপদের দ্বারা আঘাত করতে ইচ্ছা করি।" তারপর বলদেব অনুশোচনা করে বলেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক! কুরুবংশের অধঃপতিত বংশধরদের দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি! তারা অন্যায়ভাবে কুরু-সিংহাসন দখল করেছে এবং চক্রান্ত করে কৃষ্ণকে অপমান করছে। হায়, এ অসহ্য!" এটি শ্রীকৃষ্ণের অপমান থেকেও উৎপন্ন উগ্রতার আর একটি দৃষ্টান্ত।

## অশ্রদ্ধাসূচক অমর্ষ

*বিদগ্ধ-মাধবে* বর্ণিত হয়েছে—শ্রীমতী রাধারাণীর শাশুড়ি জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করে বলতে থাকে, "কৃষ্ণ! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ এবং আমার সদ্য বিবাহিতা পুত্রবধূ রাধারাণীও এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তোমাদের দুজনকে ভালমতোই জানি, সুতরাং তোমার নৃত্যরত নেত্র থেকে আমার পুত্রবধূকে রক্ষা করতে আমার ব্যাকুলতা হবে না কেন?" এটি পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমালোচনা করে অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

ঠিক এইভাবে, কোন এক সময়ে কয়েকজন গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করে বলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি হচ্ছ চোরদের শিরোমণি। সুতরাং দয়া করে তুমি এক্ষণি এখান থেকে চলে যাও। আমরা জানি যে, তুমি চন্দ্রাবলীকে আমাদের থেকেও বেশি ভালবাস, তবে আমাদের সামনে তার প্রশংসা করার প্রয়োজন নেই। দয়া করে এই স্থানে রাধারাণীর নামকে কলুষিত করো না!" এটি কৃষ্ণপ্রেমজনিত অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের দশম* স্কন্ধে (১০/৩১/১৬) উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত গোপীরা যখন বৃন্দাবনের বনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তাঁদের কিছু সদুপদেশ দিয়ে তাঁদের ঘরে ফিরে যেতে বলেন। সেই সময় গোপীরা তাঁকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার অদর্শনে আমরা চরম দুঃখ অনুভব করি এবং তোমার দর্শনে আমরা চরম আনন্দ উপভোগ করি। তাই আমরা আমাদের পতি, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ভাই, বন্ধু,—সকলকে পরিত্যাগ করে তোমার বংশীধ্বনির আকর্ষণে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। হে অচ্যুত! আমাদের এখানে আসার কারণ তুমি জান। তোমার মধুর মুরলীধ্বনির সুরে মুগ্ধ হয়ে আমরা এখানে ছুটে এসেছি। আমরা সকলেই সুন্দরী রমণী আর তুমি এতই মূর্খ যে, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করছ। তোমাকে ছাড়া আমরা এমন আর কাউকে জানি না, যে এই গভীর রাত্রে আমাদের মতো সুন্দরী যুবতী রমণীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পরিত্যাগ করতে পারে!" কৃষ্ণপ্রেমে পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগের এটি আর একটি দৃষ্টান্ত।

## ঈর্ষা

*পদ্যাবলীতে* রাধারাণীর এক সখী তাঁকে বলেন, "হে সখী! কৃষ্ণ যে স্বহস্তে তোমার ললাটে শৃঙ্গার (অঙ্গরাগ) করেছে, সেই জন্য গর্বিত হয়ো না। এমনও

হতে পারে যে, কৃষ্ণ অন্য কোন সুন্দরী রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি দেখছি যে, তোমার ললাটে খুব সুন্দরভাবে শৃঙ্গার করা হয়েছে, এবং তা দেখে মনে হচ্ছে যে, কৃষ্ণ যখন এই শৃঙ্গার আঁকছিল, তখন সে মোটেই বিচলিত ছিল না। তা না হলে, সে এত নিখুঁতভাবে রেখা অঙ্কন করতে পারত না!" এটি শ্রীমতী রাধারাণীর সৌভাগ্য দর্শনে উৎপন্ন ঈর্ষা।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩০/৩০) বর্ণনা করা হয়েছে, গোপিকারা যখন রাসনৃত্যের পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণীকে খুঁজছিলেন, তখন তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করতে থাকেন, "বৃন্দাবনের ভূমিতে আমরা কৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণীর পদচিহ্ন দর্শন করেছি এবং তা দেখে আমাদের গভীর মর্মবেদনা উপস্থিত হয়েছে, কেন না যদিও কৃষ্ণই আমাদের সর্বস্ব, কিন্তু সেই বালিকাটি এতই চতুরা যে, সে তাঁকে নিয়ে চলে গেছে এবং আমাদের বঞ্চিত করে একা একা সে তাঁর চুম্বন আস্বাদন করছে!" শ্রীমতী রাধারাণীর সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষার এটি আর একটি দৃষ্টান্ত।

কখনও কখনও গোপবালকেরা বৃন্দাবনের বনে খেলা করতেন। একদিকে থাকত শ্রীকৃষ্ণের দল এবং অন্যদিকে বলরামের দল। এই দুই দলের মধ্যে খেলার ছলে লড়াই হত। শ্রীকৃষ্ণের দল যখন বলরামের দলের কাছে পরাজিত হত, তখন সখারা বলাবলি করত, "এইভাবে বলরামের দল যদি বিজয়ী হয়, তা হলে জগতে আমাদের চেয়ে দুর্বল আর কে আছে?" এটি প্রেমজনিত ঈর্ষার একটি দৃষ্টান্ত।

## চপলতা

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৫২/৪১) শ্রীকৃষ্ণকে লিখিত একখানি পত্রে রুক্মিণী দেবী লিখেছেন, "হে অপরাজেয় কৃষ্ণ! আগামীকাল আমার বিবাহের দিন নির্ধারিত হয়েছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, আপনি গুপ্তভাবে বিদর্ভ নগরীতে আসুন। তারপর আপনার সেনাপতিরা সসৈন্যে মগধরাজের সেনাবাহিনীকে অবরোধ করে তাদের পরাভূত করুক এবং তারপর আমাকে অপহরণ করে রাক্ষস বিধি অনুসারে আপনি আমাকে বিবাহ করুন।"

বৈদিক প্রথা অনুসারে বিবাহ আট রকম হয়। তার একটি হচ্ছে রাক্ষস-বিবাহ। কন্যাকে অপহরণ করে বলপূর্বক তাকে বিবাহ করাকে বলা হয় রাক্ষস-বিবাহ। রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইচ্ছা অনুসারে যখন শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন করা হয়েছিল, তখন তিনি এই পত্র লিখে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন তাঁকে অপহরণ করার জন্য। এটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমজনিত চপলতার একটি দৃষ্টান্ত।

একজন গোপিকা বলেন, "কৃষ্ণের মধুর মুরলী যমুনার জলে ভেসে যাক, এবং তা সমুদ্রে গিয়ে পতিত হোক! কেন না সেই মুরলীর মধুর সুর এতই বেহায়া যে, তার সুরে আমাদের গুরুজনদের সামনে আমরা আমাদের লজ্জা ও শালীনতা হারিয়ে ফেলি।"

## নিদ্রা

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন গাভীদের নিয়ে গোচারণ থেকে ফিরতেন, তখন কোন কোন দিন মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী ধ্বনি না শুনতে পেয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হতেন এবং তার ফলে তিনি বিবশ হয়ে পড়তেন। এইভাবে কৃষ্ণপ্রেমজনিত উৎকণ্ঠার ফলে কখনও কখনও বিবশতা দেখা দেয়।

মা যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে এক সময় বেঁধে রাখেন, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করতে শুরু করেন, "কৃষ্ণের শরীর এত কোমল ও মৃদু, কিভাবে আমি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলাম?" সেই কথা চিন্তা করার ফলে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং বিবশ হয়ে পড়েন।

গোপিকাদের গুরুজনেরা তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন রাত্রিবেলায় দ্বার বন্ধ করে রাখতে, কিন্তু তাঁরা এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের এই উপদেশ যথাযথভাবে পালন করেননি। কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে, তাঁরা সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে এত নির্ভয় হতেন যে, তাঁরা রাত্রিবেলায় গৃহের প্রাঙ্গণে শুয়ে থাকতেন। এটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিবশে নিদ্রাজনিত বিবশতার একটি দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, কৃষ্ণভক্তরা কেন বিবশতার দ্বারা আক্রান্ত হবেন, যা সাধারণত তমোগুণের লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়। এর উত্তরে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, কৃষ্ণভক্তরা সর্বদাই জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত; তাঁরা যখন বিবশতা অনুভব করেন বা নিদ্রামগ্ন হন, তখন তাঁরা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিদ্রিত হন না, তাঁদের সেই অবস্থা ভক্তিজনিত সমাধির প্রকাশ। *গরুড়-পুরাণে* পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়স্থিত যোগীদের সম্বন্ধে একটি চেতনের এই তিনটি স্তরেই, "জাগ্রত, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি—চেতনের এই তিনটি স্তরেই, শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে মগ্ন থাকার ফলে তাঁরা নিদ্রিত হন না।

## সুপ্তি

এক সময় বলদেব ঘুমের মধ্যে বলতে থাকেন, "হে কমলনয়ন কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছার প্রভাবে তোমার বাল্যলীলা প্রকট হয়েছে। তাই এখন দয়া করে

কালীয় নাগের দর্প চূর্ণ কর।" বলদেবের এই কথা শুনে উপস্থিত যাদবেরা আশ্চর্য হলেন এবং হাসতে শুরু করলেন। তখন বলদেব এত জোরে হাই তুললেন যে, তাঁর উদরদেশ তরঙ্গায়িত হল, তারপর হলধারী বলদেব পুনরায় গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। এটি ভগবৎ প্রেমজনিত সুপ্তির একটি দৃষ্টান্ত।

## বোধ

এক ভক্ত এক সময় বলেন, "আমি তমোগুণ জয় করে দিব্য জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি, তাই এখন আমি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অন্বেষণ করব।" এটি ভগবৎপ্রেম জনিত বোধের একটি দৃষ্টান্ত। অবিদ্যাকে পূর্ণরূপে পরাভূত করবার পর এই অপ্রাকৃত বোধ সম্ভব হয়। সেই অবস্থায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আদি যে কোনও জড় বিষয়ের সংস্পর্শে এলেই ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। সেই অবস্থায় রোমাঞ্চ, চোখের মণির ঘূর্ণন, নিদ্রাভঙ্গ আদি ভগবৎ-প্রেমের বিকারগুলি বিদ্যমান থাকে।

শ্রীমতী রাধারাণী যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন, তখন হঠাৎ তিনি সব রকম দিব্য সুখ অনুভব করতে থাকেন এবং তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্তম্ভিত হয়ে যায়। তাঁর নিত্য সহচরী ললিতাদেবী তাঁর কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তৎক্ষণাৎ রাধারাণীর চক্ষু উন্মীলিত হয়। এটি কৃষ্ণনাম শ্রবণজনিত বোধের একটি দৃষ্টান্ত।

একদিন পরিহাসছলে শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে বলেন, "হে রাধে! আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাব।" এই কথা বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান, এবং তাঁর ফলে শ্রীমতী রাধারাণী এতই ব্যথিত হন যে, তাঁর শরীর বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি বৃন্দাবনের ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাস তখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি যখন মাটিতে পড়ে থাকা ফুলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করেন, তখন তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠে পড়েন। এটি ঘ্রাণজনিত দিব্য সতর্কতার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন একজন গোপিকার অঙ্গ স্পর্শ করছিলেন, সেই গোপিকাটি তখন তাঁর এক সখীকে বলেন, "হে সখী! কার হস্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করছে? যমুনার তীরবর্তী ঘন বন দর্শন করে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এই হস্তের স্পর্শ আমাকে সেই ভয় থেকে রক্ষা করেছে।" এটি স্পর্শজনিত বোধের একটি দৃষ্টান্ত।

একজন গোপী কৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি যখন রাসমণ্ডলী থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাও, তখন আমাদের প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধারাণী মূর্ছিত হয়ে ভূপতিত হয়। কিন্তু তারপর আমি যখন তোমার চর্বিত সুপারি তার মুখারবিন্দে

অর্পণ করি, তৎক্ষণাৎ সে পুলকিতাঙ্গ হয়ে সচেতন হয়।” এটি স্বাদজনিত বোধের একটি দৃষ্টান্ত।

একদিন রাত্রে স্বপ্নে শ্রীমতী রাধারাণী বলেছিলেন, “হে কৃষ্ণ! আমার সঙ্গে আর পরিহাস করো না। দয়া করে এখন নিরস্ত হও! আমার বসনাঞ্চলও স্পর্শ করো না। তা না হলে আমি তোমার অশিষ্ট আচরণের কথা গুরুজনদের কাছে বলে দেব।” এইভাবে তিনি যখন স্বপ্নে কথা বলছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ জেগে ওঠেন এবং দেখেন যে, তাঁর গুরুজনেরা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার ফলে শ্রীমতী রাধারাণী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মস্তক অবনত করেন। এটি নিদ্রাভঙ্গ জনিত বোধের একটি উদাহরণ।

এই রকম আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীমতী রাধারাণী যখন নিদ্রিতা ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবহ এক দূত তাঁর কাছে আসেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী রাধারাণী জেগে ওঠেন। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ যখন গভীর রাত্রে তাঁর বাঁশি বাজান, তখন সুন্দরী গোপকন্যারা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। এই সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর উপমা দেওয়া হয়েছে—“কমল কখনও শ্বেত হংসের দ্বারা পরিবৃত থাকে এবং কখনও আবার মধু আহরণকারী শ্যাম ভ্রমরের দ্বারা পরিবৃত থাকে। আকাশে যখন মেঘগর্জন হয়, তখন হংসরা সেখান থেকে চলে যায়, কিন্তু কমলের মধু আস্বাদন করার জন্য শ্যাম ভ্রমরেরা সেখানেই থেকে যায়।” এখানে গোপিকাদের নিদ্রার সঙ্গে শ্বেত হংসের তুলনা করা হয়েছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনির সঙ্গে মেঘগর্জনের তুলনা করা হয়েছে, আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শ্যাম ভ্রমর। যখন শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর সুর ধ্বনিত হয়, তখন শ্বেত হংসরূপী গোপিকাদের নিদ্রা অন্তর্হিত হয় এবং শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রস্ফুটিত কমলরূপী গোপিকাদের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

## একত্রিংশতি অধ্যায়

# ব্যভিচারী ভাবের অতিরিক্ত লক্ষণ

ভগবৎ-প্রেমের পূর্বোক্ত তেত্রিশটি ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে বিক্ষুব্ধ অবস্থা বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমানন্দের প্রকাশ। এই লক্ষণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। ভগবৎ-প্রেমে নানা রকম বিক্ষোভের লক্ষণ দেখা যায়; যেমন—মাৎসর্য, উদ্বেগ, দম্ভ, ঈর্ষা, বিবেক, কাপুরুষতা, ক্ষমা, কৌতুক, উৎকণ্ঠা, বিনয়, সন্দেহ ও ধৃষ্টতা। এগুলি ভগবৎ-প্রেমের তেত্রিশটি ভাবের অন্তর্গত হতে পারে।

কেউ যখন অপরের উৎকর্ষ দর্শন করে অন্তরে ব্যথিত হয়, তাকে বলা হয় মাৎসর্য। কেউ যখন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে ভীত হয়, তাকে বলা হয় উদ্বেগ। তাই ত্রাস ও উদ্বেগ একই রকম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। নিজের মনের ভাব গোপন করার বাসনাকে বলা হয় *অবহিত্থা* এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করার বাসনাকে বলা হয় দম্ভ। এই উভয়কেই মিথ্যা জাহির বলে গণনা করা হয়েছে। অপরের অপরাধ সহ্য করতে না পারাকে অমর্ষ বলা হয় এবং অপরের ঐশ্বর্যের প্রতি অসহিষ্ণুতাকে ঈর্ষা বলা হয়। ঈর্ষা ও অমর্ষ উভয়েরই কারণ হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। কোন শব্দের যথার্থ অর্থ প্রতিপন্ন করার পূর্বে অবশ্যই চিন্তাপূর্ণ বিবেচনা করতে হয়। তাই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার সময় বিবেচনার প্রয়োজন। কেউ যখন নিজেকে অজ্ঞ বলে প্রচার করেন, তাঁর সেই ব্যবহারকে বলা হয় দৈন্য, এবং উদ্যমের অভাবকে বলা হয় কাপুরুষতা। তাই দৈন্যে কখনও কখনও কাপুরুষতাও বর্তমান থাকে। মনের স্থিরতাকে ধৃতি বলা হয়, এবং অন্যের অপরাধ সহ্য করার ক্ষমতাকে বলা হয় ক্ষমা। তাই ধৃতি ও ক্ষমা সম অর্থবাচক। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার উৎকণ্ঠাকে বলা হয় অসহিষ্ণুতা, এবং অদ্ভুত কোন কিছু দর্শনে কৌতুকের উদয় হয়। কৌতুকের ফলে অসহিষ্ণুতা দেখা দিতে পারে, সুতরাং অসহিষ্ণুতা ও কৌতুক সম অর্থবাচক হতে পারে। উদ্বেগ যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তখন তাকে বলা হয় আকাঙ্ক্ষা। তাই উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষাও সম অর্থবাচক হতে পারে। কেউ যখন তার অপরাধের জন্য অনুশোচনা করে, তার সেই অনুভূতিকে বলা হয় লজ্জা। সুতরাং অনুশোচনা ও লজ্জা সম অর্থবাচক।

সংশয় বিতর্কের একটি কারণ। ধৃষ্টতার ফলে চঞ্চলতা দেখা দেয়। সুতরাং চঞ্চলতা ও ধৃষ্টতা সম অর্থবাচক হতে পারে।

ভগবৎ-প্রেমে যখন এই সমস্ত ভাবগুলি প্রকট থাকে, তখন তাকে বলা হয় সঞ্চারীভাব। এই সমস্ত ভাবগুলি দিব্য, এবং সেগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরস্পরের অনুভাব ও বিভাবরূপে প্রকাশিত হয়। এগুলির দ্বারাই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে প্রেমের বিনিময় হয়।

ঈর্ষা ও নিন্দার ফলে বিবর্ণতা দেখা দিতে পারে। তাকে বিভাব বলে গণ্য করা যেতে পারে। কখনও কখনও মোহ, মূর্ছা ও তীব্র উদ্বেগকেও বিভাব বলে বর্ণনা করা যায়। যখন এই রকম অনেক লক্ষণ দেখা যায়, তখন তা ভাবের বিভিন্ন বর্গে একত্রিত করা যায়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন যে, ত্রাস, নিদ্রা, শ্রান্তি, আলস্য ও উন্মত্ততা সঞ্চারী ভাবের অন্তর্গত বলে গণ্য করা হয় এবং গভীর আকর্ষণ থেকে সেগুলি উৎপন্ন হয়।

বিতর্ক, মতি, নির্বেদ, স্মৃতি, হর্ষ, অজ্ঞান, দৈন্য ও সুপ্তি হচ্ছে প্রেমের বিভাব। সঞ্চারী ভাব পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র—এই দুই প্রকারের হয়। পরতন্ত্র আবার উত্তম ও অধম ভেদে দুই প্রকারের। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই ভেদ নিরূপণ করেছেন এবং তা যথাসময়ে উপস্থাপন করা হবে।

এক ভক্ত চীৎকার করে বলেন, "হায়, আমি মথুরা দর্শন করতে পারলাম না! যে মথুরার নাম শুনলে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আমি সেই স্থান দর্শন করতে পারলাম না। সুতরাং আমার এই চোখের কি প্রয়োজন?" এই উক্তি থেকে মথুরা দর্শনের তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়, যার উদয় গভীর কৃষ্ণভক্তি থেকে হয়। এই গভীর কৃষ্ণানুরাগ ভীমের মধ্যে তখন প্রকাশ পেয়েছিল, যখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চাপা স্বরে বলতে থাকেন, "আমার বাহুযুগল বজ্রের মতো, কিন্তু শিশুপাল যখন কৃষ্ণের নিন্দা করছিল, তখন আমি তাকে পিষে ফেলতে পারলাম না। সুতরাং এই বাহু দিয়ে আমার কি প্রয়োজন?" এখানে ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই ক্রোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি অসহায় বোধ করেন। ক্রোধজনিত এই অসহায় বোধের কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর আসক্তি। এটি ক্রোধজনিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর আসক্তির একটি দৃষ্টান্ত।

অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেন, যাঁর চোখ ঝলসানো ধারাল দন্ত-সমন্বিত মুখমণ্ডল সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করছিল, তখন অর্জুনের মুখ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় অর্জুন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন এবং ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং সর্বদাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর নির্ভরশীল। এই ঘটনাটি নিকৃষ্ট পরতন্ত্রতার একটি উদাহরণ।

কখনও কখনও বীভৎস কার্যকলাপও কৃষ্ণপ্রেম বর্ধিত করে। প্রেমানুভূতি প্রকাশক এই ভয় মোহ থেকে উৎপন্ন হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২৩/৪০) যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের উক্তি— "আমরা তিনটি মহান সুযোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যজ্ঞোপবীত লাভ করেছি, এবং আমরা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে বিধিবৎ দীক্ষা লাভ করেছি। কিন্তু হায়! এই সমস্ত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আমরা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের ব্রহ্মচর্য পালনও ব্যর্থ হয়েছে।" এইভাবে ব্রাহ্মণরা তাঁদের কার্যকলাপের নিন্দা করতে থাকেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, উচ্চ বংশে জন্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সত্ত্বেও তাঁরা মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে, ভগবানের প্রতি ভক্তিহীন মহান যোগীরাও মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে, সেই ব্রাহ্মণেরা এই ব্যর্থতা অনুভব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তিযুক্ত নৈরাশ্যের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে অরিষ্টাসুর যখন ব্রজবালাদের আক্রমণ করে, তখন তাঁরা চীৎকার করে শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! আমাদের তুমি রক্ষা কর! আমাদের তুমি রক্ষা কর!" এই নৈরাশ্য কৃষ্ণাসক্তিপূর্ণ।

কেশী দৈত্য যখন শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়, তখন কংস অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়ে। সে বলে, "কেশী দৈত্য আমার প্রাণাধিক প্রিয় ছিল, কিন্তু সে আজ অসভ্য, অশিক্ষিত, রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ একটি গোপবালকের হাতে নিহত হয়েছে। আমি যদিও দেবরাজ ইন্দ্রকে অনায়াসে পরাভূত করেছি, তবুও আমার বেঁচে থাকা নিরর্থক।" এই নৈরাশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির ছোঁয়া রয়েছে, এটিকে নৈরাশ্য-জনিত রতির আভাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এক সময় কংস অক্রূরকে তিরস্কার করে বলে, "তুমি এতই মূর্খ যে, তুমি একটি সাধারণ গোপবালককে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করছ। কেন না সে কোন একটি বিষহীন জলের সাপকে পরাভূত করেছে! সে গোবর্ধন নামক একটা পাথরের ঢেলা তুলেছে, আর তুমি সেই বালকটিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করছ? এর থেকে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে!" এটি নৈরাশ্য-জনিত বিদ্বেষ ভাবের একটি দৃষ্টান্ত।

কদম্ব বৃক্ষ যখন বিলাপ করছিল শ্রীকৃষ্ণ তার ছায়াকে কোনদিন স্পর্শ করেননি বলে, তখন এক ভক্ত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "হে কদম্বতরু! তুমি বিচলিত হয়ো না। যমুনার জলে কালীয় সর্পকে দমন করে শ্রীকৃষ্ণ এসে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।" এটি অক্ষমতা জনিত নৈরাশ্যের একটি উদাহরণ।

গরুড়পক্ষী এক সময় বলে, "অন্য আর কোন্ পক্ষী আমার মতো পবিত্র হবে? আমার মতো কর্মক্ষম ও যোগ্যতা-সম্পন্ন পক্ষী দ্বিতীয় আর কোথায় আছে? শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পছন্দ না করতে পারেন, তিনি আমার দলে যোগদানের ইচ্ছা না-ও করতে পারেন, কিন্তু তবুও আমার পাখার সুযোগ তাঁকে নিতে হয়!" এটি উদাসীন ভাবজনিত নৈরাশ্যের একটি উদাহরণ।

এই ভাবসমূহের চারটি অবস্থা আছে—ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য এবং ভাবশক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ এক সময় রাধারাণীকে বলেন, "হে সখী, ঊষাকালে তুমি যখন একলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করছিলে, তখন তোমার সখী মেখলা ঈর্ষাবশত অভুক্ত ছিল। তার দিকে তাকিয়ে দেখ!" শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধারাণীর সঙ্গে এইভাবে রসিকতা করছিলেন, তখন রাধারাণী তাঁর সুন্দর ভ্রূযুগল বক্রভাবে আন্দোলিত করলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রার্থনা করতেন যে, শ্রীমতী রাধারাণীর ভ্রূযুগলের এই আন্দোলনের দ্বারা সকলেই তাঁর কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করুক। এটি কৃষ্ণপ্রেমের অসূয়াজনিত ভাবোৎপত্তি।

একদিন রাত্রে পূতনা রাক্ষসীকে হত্যা করার পর, শিশু কৃষ্ণ তার বক্ষের উপর খেলা করছিলেন। তা দেখে মা যশোদা কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যান। এটি বিভিন্ন ভাবের সন্ধির একটি দৃষ্টান্ত। এই সন্ধি ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই হতে পারে। পূতনা রাক্ষসীর মৃত্যু মঙ্গলজনক ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে গভীর রাত্রে একলা তার বক্ষের উপর খেলা করছিল, তা হচ্ছে অমঙ্গলজনক। মা যশোদা এইভাবে মঙ্গল ও অমঙ্গল এই ভাবসন্ধিতে আবিষ্ট হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সবে হাঁটতে শিখেছেন, তখন তিনি বারবার ঘর থেকে বাইরে যেতেন এবং আবার ঘরে ফিরে আসতেন। আশ্চর্য হয়ে যশোদা মা বলেন, "এই শিশুটি এত চঞ্চল যে, একে সামলানো যায় না! সে নিরন্তর গোকুলের পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপর আবার ঘরে ফিরে আসছে। আমি দেখছি যে এই শিশুটি অত্যন্ত নির্ভীক, কিন্তু তার নির্ভীকতা সত্ত্বেও, কোন বিপদের আশঙ্কা করে আমি অত্যন্ত ভীত হচ্ছি।" এটি দুটি বিরুদ্ধ ভাবের সন্ধির একটি দৃষ্টান্ত—শিশু কৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক, কিন্তু সেই সময় মা যশোদা বিপদের আশঙ্কা করে ভীত হচ্ছিলেন। এখানে বিপদ হচ্ছে হেতু এবং মা যশোদার মনোভাব দুটি বিরুদ্ধ ভাবের সন্ধিতে অবস্থিত। অর্থাৎ মা যশোদা হর্ষ ও শঙ্কা দু-ই অনুভব করছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী যখন কংসের মল্লভূমিতে মল্লবীরদের সম্মুখে অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে একই সঙ্গে উষ্ণ ও

শীতল—এই দুই রকমের অশ্রু ঝরে পড়ছিল। এটি ভগবৎ প্রেমজনিত হর্ষ ও শোক—এই দুটি ভাবের সন্ধির একটি দৃষ্টান্ত।

এক সময় শ্রীমতী রাধারাণী যখন বৃন্দাবনে যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আক্রমণ করেন। এই ঘটনায় রাধারাণী বাইরে অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেন, কিন্তু অন্তরে তিনি হাসছিলেন এবং গভীর তৃপ্তি অনুভব করছিলেন। বাইরে তিনি ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করেন এবং এমন ভাব দেখান যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করেছেন। শ্রীমতী রাধারাণীকে তখন খুব সুন্দর দেখায় এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর সৌন্দর্যের মহিমা কীর্তন করেছেন। এটি বিভিন্ন ভাব প্রকাশের একটি দৃষ্টান্ত, যদিও তার কারণ হচ্ছে একটি—শ্রীকৃষ্ণ।

কখনও কখনও নন্দ মহারাজের গৃহে মহোৎসব হয় এবং সমস্ত ব্রজবাসীরা সেই মহোৎসবে যোগদান করেন। এই রকম এক মহোৎসবে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া একটি সোনার হার পরেছিলেন। মা যশোদা ও শ্রীমতী রাধারাণীর মাতা উভয়েই তৎক্ষণাৎ তা ধরে ফেলেন, কেন না সেই হারটি শ্রীমতী রাধারাণীর কণ্ঠে অত্যন্ত লম্বা দেখাচ্ছিল। সেই সময় শ্রীমতী রাধারাণী দেখলেন যে, তাঁর পতি অভিমন্যু ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে নিকটেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একসঙ্গে এই সমস্ত কারণের ফলে শ্রীমতী রাধারাণীর অত্যন্ত লজ্জা হল এবং তাঁর মুখমণ্ডল ম্লান হল, তার ফলে তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। এটি লজ্জা, ক্রোধ, হর্ষ ও বিষাদের সমন্বয়। এটি ভাবসমূহের সন্ধির একটি দৃষ্টান্ত।

কংস এক সময় বলে, "এই বালকটি আমার কি ক্ষতি করতে পারে? তার কোন শক্তি নেই।" তখন কংসকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁর সমস্ত অসুর-বন্ধুরা সেই বালকটির হাতে নিহত হয়েছে। তখন কংস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করতে থাকে, 'আমি এক্ষণি তার কাছে আত্মসমর্পণ করব? কিন্তু আমার মতো একজন মহা যোদ্ধা তা কিভাবে করতে পারে?' তার পরেই সে চিন্তা করে, 'তার ভয়ে আমি কেন ভীত হব? আমাকে সাহায্য করবার জন্য কত মল্লবীর এখনও রয়েছে।' তার পরেই সে বিবেচনা করতে থাকে, 'এই বালকটি কোন সাধারণ বালক নয়, কেন না, সে তার বাঁ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছে। তা হলে এখন আমি কি করব? বৃন্দাবনে গিয়ে আমি সেখানকার অধিবাসীদের যন্ত্রণা দেব। কিন্তু আমি তো এখন বাইরে যেতে পারি না, কেন না সেই বালকটির ভয়ে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে!' কংসের এই মনোভাবে গর্ব, বিষাদ, দৈন্য, সংকল্প, স্মৃতি, শঙ্কা, ক্রোধ ও ভয়—এই আটটি বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। নৈরাশ্য জনিত ভাবের সমষ্টির এটি একটি দৃষ্টান্ত।

এক গৃহস্থ ভক্ত এক সময় বলেন, "হে প্রভু! আমি এতই অধম যে, এই আঁখি দুটি অপূর্ব মহিমামণ্ডিত মথুরা নগরী দর্শনের বাসনা করে না। তাই আমার আঁখি দুটি ব্যর্থ। আমি উচ্চশিক্ষা লাভ করেছি, কিন্তু সেই শিক্ষা কেবল রাজকার্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমি সর্বাপেক্ষা বলশালী, কিন্তু ভয়ঙ্কর কালের কথা বিবেচনা করিনি, যার প্রভাবে সব কিছুর সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়। আমার ধন-সম্পদ আমি কাকে দিয়ে যাব? ক্রমান্বয়ে আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি। এখন আমি কি করব? এখন কি আমি গৃহে থেকে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করব? আমি তা করতে অক্ষম, কেন না আমার মন দিব্যধাম বৃন্দাবনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।"

এটি নির্বেদ, গর্ব, শঙ্কা, ধৃতি, বিষাদ, মতি ও ঔৎসুক্যতা—কৃষ্ণপ্রেমের এই সাতটি বিভিন্ন ভাবের সমষ্টি।

সংস্কৃতে একটি উক্তি আছে, *নৈরাশং পরম সুখং*—অর্থাৎ, যখন ভাবপ্রবণতা অথবা উচ্চাভিলাষ অত্যন্ত বর্ধিত হয়, এবং অনেক চেষ্টার পরেও অসাফল্য জনিত নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়, অবশেষে তখন তা গভীর তৃপ্তিতে পর্যবসিত হয়। এক সময় বৃন্দাবনের গোপবালকেরা বহুক্ষণ ধরে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করেও যখন তাঁকে খুঁজে পেলেন না, তখন তাঁদের মুখমণ্ডল শুষ্ক বিবর্ণ হয়েছিল। তখন তাঁরা পাহাড়ের উপর শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনতে পেলেন, এবং তার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হলেন। এটি নৈরাশ্যের মাঝে তৃপ্তির একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণের শব্দ, অর্থ ও রস সম্বন্ধে যদিও তাঁর বিশেষ জ্ঞান নেই, তবুও কৃষ্ণপ্রেমের বিভিন্ন ভাবের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব এবং অন্য আরও আটটি ভাব, সব মিলিয়ে একচল্লিশটি মুখ্য লক্ষণ রয়েছে। এই লক্ষণগুলি দেহে ও মনে বিকারের সৃষ্টি করে। এই সবগুলিকে হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব বলে মনে করা যেতে পারে। কখনও কখনও কোন ভাব স্বাভাবিক, আবার কোন ভাব সাময়িকভাবে উদিত হয়। যে সমস্ত লক্ষণগুলি খুব স্বাভাবিক, সেগুলি সর্বদাই ভক্তের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান থাকে।

রঙিন কাপড় দেখে যেমন বোঝা যায় কোন্ রঙ দিয়ে তা রাঙানো হয়েছে, তেমনই এই সমস্ত ভাবের লক্ষণগুলি জানার মাধ্যমে যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি এক, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভক্ত থাকার ফলে বিভিন্ন ভাবে এই আসক্তি প্রকাশিত হয়। লাল রঙে রাঙানো কাপড়কে যেমন লাল দেখায়, তেমনিই বিশেষ ভাবের লক্ষণ দেখে

অস্থায়ী ভাবকে বুঝতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তের বিভিন্ন রস চিত্তে বিশেষ বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করে, এবং এই পার্থক্য অনুসারে ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণগুলি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়। কারও হৃদয় যদি মহান, গম্ভীর ও উদার হয়, এবং অন্য কারও হৃদয় যদি কর্কশ ও অমার্জিত হয়, তা হলে হৃদয়ে ভাবের প্রভাবে ভগবৎ-প্রেমের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাবে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ সাধারণত এই ধরনের বিভিন্ন গুণ ও মনোবৃত্তি বুঝতে পারে না, কিন্তু কারও হৃদয় যখন অত্যন্ত কোমল ও মৃদু হয়, তখন এই সমস্ত লক্ষণগুলি সহজেই প্রকাশ পেতে দেখা যায়, এবং মানুষ খুব স্পষ্টভাবে সেগুলি উপলব্ধি করতে পারে। যে মানুষের হৃদয় অতি উদার ও গম্ভীর, তাকে সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চিত্তে যখন ভগবৎ প্রেমানন্দ অনুভূত হয়, তখন স্বর্ণময়ী হৃদয় বা গভীর হৃদয় বিচলিত হয় না, কিন্তু দুর্বল হৃদয় তৎক্ষণাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এর আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—সরল, গম্ভীর ও উদার হৃদয়কে একটি বৃহৎ নগরীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং কোমল হৃদয়কে একটি নগণ্য কুটিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বড় শহরে অনেক বাতি ও মস্ত বড় বড় হাতি থাকতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বাতি অথবা হাতি যখন কোন ক্ষুদ্র কুটিরের সন্নিকটে দেখা যায়, তখন সকলেই সেদিকে লক্ষ্য করে।

হৃদয়ের কঠিনতাকে বজ্র, স্বর্ণ ও লাক্ষার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বজ্র অত্যন্ত কঠোর, তা কখনও কোমল হয় না। তেমনই, যে সমস্ত মানুষ কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন, তাঁরা সহজে কোমল হন না। প্রবল তাপে স্বর্ণময় হৃদয় গলে যায় এবং অল্প তাপেই লাক্ষা গলে যায়।

কোমল হৃদয়কে মধু, ননী, ও অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আর মনের অবস্থাকে সূর্যকিরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন মধু, ও ননী অল্প কিরণেই গলে যায়, তেমনই কোমল হৃদয়সম্পন্ন মানুষেরা সহজেই বিগলিত হন। কিন্তু অমৃত স্বাভাবিকভাবেই তরল, আর যাঁরা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের হৃদয়ও অমৃতের মতো তরল।

শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই অমৃতময় গুণাবলীতে বিভূষিত এবং কখনও কখনও ননী (মাখন) ও মধুরস-গুণে ভূষিত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিভিন্ন অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে হৃদয়ের ভাব দ্রবীভূত হতে পারে, ঠিক যেমন কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ সংমিশ্রণে অত্যন্ত কঠিন হীরাও দ্রবীভূত হয়। *দানকেলি-কৌমুদীতে* উল্লেখ করা হয়েছে, "ভক্তের হৃদয়ে প্রেম যখন বিকশিত হয়, তখন তিনি তাঁর অনুভূতির বিকার রোধ করতে পারেন না। চন্দ্রের উদয়ে

সমুদ্রে যেমন জোয়ার আসে, তাঁর হৃদয়েও তখন সেই অবস্থা হয়। তাঁর হৃদয় তখন প্রবলভাবে উদ্বেলিত হয়।" স্বাভাবিক অবস্থায় সমুদ্র গভীর ও গম্ভীর, কিন্তু চন্দ্র যখন উদয় হয়, তখন কোন কিছুই সমুদ্রের আবেগ রোধ করতে পারে না। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁদের আন্তরিক ভাবকে নিবৃত্ত করতে পারেন না।

# দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

# স্থায়িভাবের লক্ষণ

যে ভাব প্রেমের সমস্ত অস্থায়ী অভিব্যক্তি এবং বিরুদ্ধ ভাবকে দমন করে নিরন্তর একজন শক্তিশালী রাজার মতো বিরাজ করে, তাকে বলা হয় স্থায়িভাব। এই ভাবকে মুখ্য ও গৌণ—এই দুটি রূপে প্রকাশ করা হয়। শুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত হওয়ার পরেই কেবল কৃষ্ণপ্রেম জনিত এই মুখ্য রতির উদয় হয়। মুখ্য রতিকে স্বার্থা ও পরার্থা—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যখন প্রেমের অবিরুদ্ধ লক্ষণ স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন কোন বিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশের ফলে গ্লানি বোধ হয়। এই রতিকে স্বার্থা বলা হয়। যে রতিতে অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবের পরস্পর সামঞ্জস্য হতে পারে, তাকে মুখ্য পরার্থা প্রেম বলা হয়। নিঃস্বার্থ প্রেমকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মাধুর্য—এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পাত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই প্রেম বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়।

## শান্ত

শান্ত রতি সামান্যা, স্বচ্ছা এবং প্রশান্ত—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। কোন বৈশিষ্ট্য ব্যতীত সাধারণ মানুষ অথবা শিশুদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে আর্কষণ, তাকে বলা হয় সামান্যা রতি। কখনও কখনও অঙ্গের কম্পন এবং নেত্রের বিবর্ণতা (অর্থাৎ লাল বা সাদা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) লক্ষণের মাধ্যমে এই ভাব প্রকাশিত হয়। এই রতিতে কোন বিশেষ অনুরাগের লক্ষণের মাধ্যমে এই ভাব প্রকাশিত হয়। এই রতিতে কোন বিশেষ অনুরাগের লক্ষণ দেখা যায় না।

একজন যুবক এক বৃদ্ধকে বলেন, "এই শিশুটিকে দেখুন! এর বয়স মোটে তিন বৎসর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে তিনি চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে যাচ্ছেন।" এটি কোন বিশেষ বিভাগ ব্যতীত একটি শিশুর শান্ত রসের দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানা প্রকারের রতি অনুসারে বিভিন্ন রকমের ভক্ত রয়েছেন। তাঁদের লক্ষণগুলি রত্নের মতো স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়। কথিত আছে যে, এক মহাভাগবত ব্রাহ্মণ কখনও কখনও ভগবানকে প্রভুরূপে সম্বোধন করতেন এবং কখনও আবার তাঁর সঙ্গে পরিহাস করতেন। কখনও বাৎসল্য রসে তাঁকে

আগলে রাখতেন এবং কখনও ভগবানকে তাঁর প্রেমিকরূপে সম্বোধন করতেন এবং কখনও আবার পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করতেন। এইভাবে দেখা যায় যে, সেই ব্রাহ্মণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাঁর ভগবৎ-প্রেম ব্যক্ত করতেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকার ফলে, তিনি নিরন্তর আনন্দের সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন। এইভাবে তিনি ছিলেন একটি স্বচ্ছ মাধ্যম, ঠিক একটি রত্নের মতো যা তার প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন রঙ প্রদর্শন করে।

নারদ মুনি যখন বীণা বাজিয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন সনকাদি চার কুমার, যদিও তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিলেন, তবুও তাঁদের শরীর আনন্দের আতিশয্যে কাঁপতে থাকে। আর একজন ভক্ত এক সময় চিৎকার করে বলেন, কেবল ভগবদ্ভক্তের সেবা করার ফলে যদিও আমি মুক্তি লাভ করতে পারি, তবুও আমার চিত্ত পরমেশ্বর ভগবানের দর্শনের জন্য অত্যন্ত আকুল হয়ে উঠেছে, যাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো ঘনশ্যাম।" পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসার জন্য কোন ভক্ত যখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন তাকে শান্ত রতির লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়।

## শুদ্ধ ও মিশ্র রতি

সাধারণত কৃষ্ণভক্তদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তাদের একটি শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, দ্বিতীয় শ্রেণী সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তৃতীয় শ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠরূপে বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই তিন শ্রেণীর ভক্ত ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত রসে সম্পর্কিত হন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি যখন কোন একটি বিশেষ রসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন তাকে বলা হয় কেবলা বা শুদ্ধ অবস্থা। এই শুদ্ধ ভাব সমন্বিত ভক্তি ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের কোন নিত্য পার্ষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার বাসনা প্রকাশ করে। অর্থাৎ, রসাল আদি গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দাসদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, অথবা শ্রীদাম, সুদামা আদি শ্রীকৃষ্ণের সখাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অথবা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা নন্দ-যশোদার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। ভক্তকে গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কোন নিত্য-পার্ষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক রস যখন মিশ্রণ হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রস মিশ্রিত হয়, তখন তাকে বলা হয় মিশ্র রস। এই অপ্রাকৃত মিশ্র রস উদ্ধব, ভীম ও যশোদা মায়ের দাসী মুখরার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভগবদ্ভক্তি

জনিত রস যদিও কখনও কখনও মিশ্র অবস্থায় দেখা যায়, কিন্তু তার :
বিশেষ রস সর্বদাই স্থায়িভাবে ও মুখ্যভাবে বিরাজ করে। সেই মুখ্য রসটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের প্রধান সম্পর্ক। যেমন, উদ্ধব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সখা, কিন্তু তবুও উদ্ধবের চরিত্রে দাস্য রসের আভাস দেখতে পাওয়া যায়। এই সখ্যকে বলা হয় সম্ভ্রম-জনিত সখ্যভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদাম ও সুদামার যে সখ্য, তাতে সম্ভ্রমের প্রকাশ নেই।

## অনুগত প্রীতি

যে সমস্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের বড় বলে জেনে নিরন্তর তাঁর চিন্তা করেন, তাঁদের সেই ভাবকে বলা হয় অনুগত প্রীতি। এই সমস্ত ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আনুগত্য বা অধীনতা প্রবলভাবে দেখা যায় এবং তাই তাঁদের সাধারণত ভগবদ্ভক্তির অন্য কোন রসের প্রতি রুচি থাকে না।

*মুকুন্দমালা-স্তোত্রে* মহারাজ কুলশেখর প্রার্থনা করছেন, "হে প্রভু! আপনি জীবদের সংসাররূপী নরক থেকে উদ্ধার করেন, কিন্তু আমি সেই মুক্তি কামনা করি না। আমি উচ্চতর স্বর্গলোকে উন্নীত হই অথবা এই ভূমণ্ডলেই অবস্থান করি অথবা নরকে প্রক্ষিপ্ত হই, সেই জন্য আমি দুশ্চিন্তা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর সময় যেন আমি শরৎকালের বিকশিত পদ্মের মতো অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত আপনার শ্রীচরণকমলের ধ্যান করতে পারি।"

## সখ্য

যে সমস্ত অতি উন্নত ভক্ত প্রায় শ্রীকৃষ্ণেরই সমপর্যায়ভুক্ত, তাঁদের সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত বলে গণনা করা হয়। অর্থাৎ, সখ্যরসে নানা প্রকার পরিহাস ও উপহাসজনক বার্তালাপ হয়। এই সখ্যভাবের একটি দৃষ্টান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতে* পাওয়া যায়, যখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবছিলেন, "আজ আমি বৃন্দাবনের গোচারণক্ষেত্রে গাভীচারণ করছিলাম, তখন একটি অপূর্ব সুন্দর উদ্যান থেকে আমি কিছু ফুল চয়ন করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমার সখা গোপবালকেরা ক্ষণিকের জন্য আমার বিরহ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে অসুখী হয়েছিল, এবং তারা যখন আমাকে খুঁজে পেল, তখন আমার প্রতি আকুল হয়ে আমার দিকে ছুটে এসেছিল এবং আমিও তাদের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম—যেন ফুল হাতে কে কাকে প্রথম স্পর্শ করতে পারে, তার প্রতিযোগিতা হচ্ছিল।"

শ্রীকৃষ্ণের এক সখা পরিহাসছলে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে দামোদর! যদিও শ্রীদামের কাছে পরাজিত হয়ে তোমার অভিমান চূর্ণ হয়েছে, কিন্তু তবুও

নিজের বলের মিথ্যা দম্ভ করে তুমি কেন লজ্জারূপ মহিষীকেও জলাঞ্জলি দিয়ে বিদায় দিচ্ছ?"

## বাৎসল্য

মা যশোদা যখন শুনলেন যে, কংসের বলবান ভৃত্যরা জোর করে শ্রীকৃষ্ণের গাভী অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে এবং কোমল শিশু-গোপাল তার গাভী রক্ষা করছে, তখন তিনি নিরন্তর চিন্তা করতে থাকেন, "কংসের ভৃত্যদের এই আক্রমণ থেকে আমি কিভাবে এই নিরীহ বালকটিকে রক্ষা করব?" এটি ভগবানের প্রতি ভক্তের বাৎসল্য ভাবের একটি দৃষ্টান্ত।

মা যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে গোচারণ থেকে ফিরে আসতে দেখতেন, তখন বাৎসল্য স্নেহে দ্রবীভূত হয়ে, তিনি তাঁর অঙ্গুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিবুক স্পর্শ করে আদর করতেন।

## মাধুর্য

শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁর পিতা-মাতার মধ্যে যে সম্পর্ক, তারও উপরে হচ্ছে মাধুর্য রতি। ভগবান ও ব্রজগোপিকাদের মধ্যে এই প্রেম দেখতে পাওয়া যায়। কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গি, প্রিয়বাণী ও হাস্যের বিনিময়—এই সমস্ত দ্বারা এই প্রেমের অভিব্যক্তি হয়।

*গোবিন্দ-বিলাস* নামক গ্রন্থে সেই সম্বন্ধে একটি উক্তি রয়েছে—শ্রীমতী রাধারাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রায় নৈরাশ্যজনকভাবে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছিলেন। এই রকম পরোক্ষভাবে যখন মাধুর্য রতি প্রকাশ পায়, তখন হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয় এবং কখনও কখনও বীভৎস ভাব দেখা যায়। এই সাত প্রকার ভাব পুনরায় গৌণরতি রূপে পরিচিত।

ভগবৎ-প্রেমের মুখ্য মাধুর্য রতিতে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র ও ভয়ানক রস থাকে, কিন্তু বীভৎস রস থাকে না। এই সমস্ত অভিব্যক্তিগুলিকে গভীর আনন্দের আধার বলে মনে করা হয়। যখন এই সাত প্রকার দিব্য প্রেমের প্রকাশ হয়, তখন তারা স্থায়িভাব প্রাপ্ত হয়, যার ফলে মাধুর্য রতির স্বাদ বর্ধিত হতে থাকে।

# ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়

# ভাবের গৌণ লক্ষণ

## হাস্য

দুই গোপিকার ভাণ্ড থেকে দধি চুরি করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এক সখীকে বলেন, "হে সখী! আমি শপথ করে বলছি যে, তোমাদের ভাণ্ড থেকে আমি এক ফোঁটাও দধি চুরি করিনি। কিন্তু তোমাদের সখী রাধারাণী নির্লজ্জতা-পূর্বক আমার মুখের গন্ধ শুঁকছে। তাকে বলে দিও সে যেন আমার প্রতি এই রকম অসৎ ব্যবহার না করে।" শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে কথা বলছিলেন, তখন রাধারাণীর সখীরা তাঁদের হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না। এটি হাস্য রতির একটি উদাহরণ।

## অদ্ভুত

একদা ব্রহ্মা দেখলেন যে, সমস্ত গাভী এবং সমস্ত গোপবালকেরা পীতাম্বর ও নানা রকম রত্নের দ্বারা সুশোভিত। সমস্ত বালকেরা চতুর্ভুজ রূপ পরিগ্রহ করেছেন এবং শত শত ব্রহ্মা তাঁদের আরাধনা করছেন। সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকার ফলে সমস্ত গোপবালকেরা আনন্দে মগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তখন ব্রহ্মা বিস্ময় প্রকাশ করে বলে ওঠেন, "এই সব আমি কি দেখছি?" এটি ভগবৎ-প্রেমের অদ্ভুত ভাবের লক্ষণ।

## বীর

একদিন যমুনার তীরে শুকনো পাতার থেকে মর্মর ধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল, গোপবালকেরা আনন্দে মুখর হয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হাসছিল এবং আকাশে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। শ্রীদামা তখন অঘাসুর নাশনকারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য কোমর বাঁধছিল। এটি ভগবৎ-প্রেমের বীর রসের একটি দৃষ্টান্ত।

## করুণ

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৭/২৫) তৃণাবর্তাসুরের শ্রীকৃষ্ণকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এইভাবে তৃণাবর্তাসুর যখন শ্রীকৃষ্ণকে

আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল, তখন সমস্ত গোপিকারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেন। মা যশোদার কাছে গিয়ে তাঁরা তখন বলেন যে, নন্দদুলালকে তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘূর্ণিঝড় তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এটি ভগবৎ-প্রেমজনিত করুণ রসের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয় নাগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তখন মা যশোদা চীৎকার করে বলে উঠেন, "কৃষ্ণ এখন কালীয় সর্পের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, আর এখনও আমি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাইনি! কী অদ্ভুত এই শরীরের কঠোরতা!" এটি ভগবৎ-প্রেমজনিত করুণ রসের একটি দৃষ্টান্ত।

## রৌদ্র

অভিমন্যুর মাতা জটিলা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে এক রত্নহার দেখে বুঝতে পারলেন যে, সেটি শ্রীমতী রাধারাণী তাঁকে দিয়েছেন। তার ফলে তাঁর হৃদয়ে গভীর ক্রোধের উদয় হল এবং তাঁর চোখের মণি ঘুরতে লাগল। এটি ভগবৎ-প্রেমে রৌদ্র রসের একটি দৃষ্টান্ত।

## বীভৎস

যামুনাচার্য এক সময় বলেন, "যখন থেকে আমি ভগবৎ-প্রেমানন্দের নব নব রস আস্বাদন করছি, তখন থেকেই আমার পূর্ব জীবনের স্ত্রী-সঙ্গসুখের কথা মনে পড়লে ঘৃণায় আমার মুখ বিকৃত হয় এবং সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুথু ফেলি।" এটি ভগবৎ-প্রেমে বীভৎস রসের একটি উদাহরণ।

## ভয়ানক

এক প্রবীণ ভক্ত বলেন, "হে প্রভু! তোমার কাছ থেকে যখন আমরা দূরে থাকি, তখন তোমাকে দেখার জন্য আমরা অত্যন্ত আকুল হয়ে পড়ি এবং আমাদের জীবন তখন দুঃখে ভরে যায়। কিন্তু তারপর যখন আমরা তোমাকে দর্শন করি, তখনই মনে বিরহের ভয় উপস্থিত হয়। এইভাবে তোমার দর্শনে ও অদর্শনে উভয় অবস্থাতেই আমরা বিভিন্ন রকমের মানসিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করি।" এটি কৃষ্ণপ্রেমে বিরোধী ভাবের মিশ্রণের উদাহরণ। এই রতি অত্যন্ত আস্বাদ্য এবং নিপুণ রসজ্ঞরা এটিকে দই, মিছরি ও গোলমরিচের মিশ্রণের সাথে তুলনা করছেন। এই সবের সম্মিলিত স্বাদ অত্যন্ত রসময়।

# চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

# ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

ভক্তের হৃদয়ে যে বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয়, তাকে বলা হয় বিভাব। কটাক্ষ, ভয়, বিস্ময়, হাস্য আদি পূর্ববর্ণিত যে সমস্ত ভাবের মাধ্যমে তার প্রকাশ হয়, তাকে বলা হয় অনুভাব। বিভাব ও অনুভাবের প্রকাশক বিভিন্ন কারণগুলিকে বলা হয় সঞ্চারী ভাব।

যখন কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য আবৃত্তি হয় অথবা নাটকের অভিনয় হয়, তখন শ্রোতা অথবা দর্শকের চিত্তে নানা প্রকার দিব্য সেবাভাবের উদয় হয়। তাঁরা তখন ভিন্ন ভিন্ন বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব আস্বাদন করেন।

যে মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির স্তরে রয়েছেন, তাঁর পক্ষে শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও অনুভাবের বর্ণনাও আলোচনা করা উচিত নয়। এগুলি হচ্ছে ভগবানের হ্লাদিনী শাক্তির অভিব্যক্ত কার্য। আমাদের কেবল বোঝা উচিত যে, দিব্য স্তরে প্রেমের নানা প্রকার আদান-প্রদান হয়। প্রেমের এই আদান-প্রদানগুলি প্রাকৃত অথবা জড়-জাগতিক বলে কখনই মনে করা উচিত নয়। *মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে* সাবধানবাণী রয়েছে যে, অচিন্ত্য বস্তুকে কখনও তর্কের বিষয় বানানো উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় বৈকুণ্ঠ জগতের দিব্য কার্যকলাপ আমাদের কাছে অচিন্ত্য। শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতো মহান মুক্ত পুরুষেরা বৈকুণ্ঠ জগতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঈষৎ আভাস দিয়েছেন, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেই সমস্ত কার্যকলাপ আমাদের চিন্তার অতীত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অপ্রাকৃত প্রেমের বিনিময় আমরা তখনই বুঝতে পারব, যখন আমরা পরমেশ্বর ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সংস্পর্শে আসতে পারব।

এই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী আকাশে মেঘের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আকাশের মেঘ সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়, এবং সেই মেঘ যখন বর্ষণরূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, তখন আবার তা সমুদ্রে ফিরে যায়। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন রসধারী মেঘ এবং তিনি যখন অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ হন, তখন তাঁর করুণা বর্ষার জলভরা মেঘের মতো নেমে আসে, এবং হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপ সমুদ্রে ফিরে যায়।

## শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুখ্য ও গৌণ আকর্ষণ

ভগবদ্ভক্তির দিব্য আনন্দকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—মুখ্য রতি ও গৌণ রতি। মুখ্য রতিকে আবার পাঁচটি দিব্য রসে ভাগ করা হয়েছে এবং গৌণ রতিকে সাতটি দিব্য রসে ভাগ করা হয়েছে। মুখ্য রতির পাঁচটি বিভাগ হচ্ছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। গৌণ রতির সাতটি বিভাগ হচ্ছে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, করুণ, ভয়ানক, ও বীভৎস। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিকে বারোটি ভাগে ভাগ করা যায়, এবং তাদের বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে। সেই বর্ণগুলি হচ্ছে শ্বেত, বহুবর্ণ, অরুণ, রক্ত, সবুজ, ধূসর, পীত, গৌর, ধূম্র, গোলাপী, কৃষ্ণ ও শ্যাম। বারোটি ভিন্ন ভিন্ন রস ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন—কপিল, মাধব, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, নন্দনন্দন, বলরাম, কূর্ম, কল্কি, রাঘব, ভার্গব, বরাহ ও মৎস্য।

পুষ্টি, বিকাশ, বিস্তার, বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ—প্রেমের আদান-প্রদানে এই পাঁচটি লক্ষণ দেখা যায়। সুতরাং এই পাঁচটি লক্ষণের মাধ্যমে ভগবৎ-প্রেমের পরীক্ষা হতে পারে। শান্তরসে পুষ্টি, বীররসে বিস্তার, করুণরসে বিক্ষেপ, রৌদ্ররসে বিক্ষোভ ইত্যাদি।

অনভিজ্ঞ লোকদের কাছে ভগবদ্ভক্তির করুণ ভাবকে দুঃখাত্মক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বিচক্ষণ ভক্তরা জানেন যে, করুণ রসেও ভক্ত দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। যেমন, *রামায়ণের* বিষয়বস্তু কখনও কখনও করুণ বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। *রামায়ণে* বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীরামচন্দ্র যখন সিংহাসনে বসতে যাবেন, তখন তাঁর পিতা তাঁকে বনে পাঠান। শ্রীরামচন্দ্রের প্রস্থানের পর তাঁর পিতা মহারাজ দশরথ দেহত্যাগ করেন। বনে তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে রাবণ হরণ করে নিয়ে যায় এবং রাবণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে সপরিবারে রাবণকে হত্যাপূর্বক তার রাজ্য ছারখার করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করা হয়। গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা হয় এবং আবার তাঁকে বনে নির্বাসন দেওয়া হয়। *রামায়ণের* এই সমস্ত বিষয়বস্তুগুলি অত্যন্ত করুণ বলে মনে হয়, এবং শ্রোতাদের কাছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তা হলে শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত-হনুমান কেন প্রতিদিন রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপ পাঠ করবেন? আসল কথা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বারোটি রস, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রতিটিই অপ্রাকৃত আনন্দদায়ক।

এই বিষয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই সমস্ত লোকেদের জন্য শোক করেছেন, যারা মিথ্যা বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। ভগবদ্ভক্তি উপেক্ষা করে শুষ্ক জ্ঞানের

বশবর্তী হয়ে যারা বৈরাগ্যের অভিনয় করে, তাদের হৃদয় প্রকৃতপক্ষে সেই বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ হয়। যে সমস্ত মানুষ বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার প্রয়াসী, তারা কখনই ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারে না। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, যে সমস্ত ভক্ত ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদন করছেন, এই সমস্ত শুষ্ক জ্ঞানী, স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী কর্মী এবং মুক্তিকামী নির্বিশেষবাদীদের প্রভাব থেকে সাবধানতার সঙ্গে তাঁদের ভগবদ্ভক্তিকে রক্ষা করা উচিত। ভক্তদের উচিত ভগবৎ-প্রেমরূপী মহা মূল্যবান রত্ন দস্যু ও তস্করদের হাত থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ, শুষ্ক জ্ঞানী ও ভণ্ড বৈরাগীর কাছে কখনই ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব এবং তার বিশদ বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।

যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তারা কখনই ভগবদ্ভক্তির সুফল লাভ করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব তাদের কাছে সর্বদাই দুরূহ। কেবল যে সমস্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেছেন, তাঁরাই যথার্থ ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদন করতে পারেন।

কেউ যখন ভাবের স্তর অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বের চরম স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর হৃদয় সর্বতোভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। জীবনের সেই পবিত্র স্তরে জীব এই অমৃত আস্বাদন করতে পারে, এবং আনন্দ আস্বাদনের এই ক্ষমতাকে বলা হয় রস।

*ইতি — ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের 'সাধারণ ভগবৎ-সেবা সম্পর্কিত' দক্ষিণ বিভাগের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*

# তৃতীয় খণ্ড

## পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

# ভগবৎ-প্রেমের শান্তরস

নিত্য মনোহর রূপধারী পরমেশ্বর ভগবান, যিনি নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা সেবিত, শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের এই পশ্চিম বিভাগে পাঁচ প্রকারের মুখ্য ভক্তিরস, অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য রসের বর্ণনা করা হয়েছে। এই পাঁচটি রসের বিশদ বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে, তাই তাদের ভক্তিরসরূপী সমুদ্রের পশ্চিম বিভাগের পাঁচটি লহরীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কেউ যখন নিরন্তর শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন, তখন তাঁর সেই অবস্থাকে ভগবদ্ভক্তির শান্তরস বলা হয়। বহু মহর্ষি তপশ্চর্যা, কৃচ্ছ্রসাধন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য ধ্যান করে এই শান্তরসের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই ধরনের ঋষিদের সাধারণত বলা হয় যোগী, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্মে দিব্য আনন্দ উপভোগ করার প্রতি আসক্ত থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসার ফলেই যে দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়, সেই সম্বন্ধে তাঁদের সাধারণত কোন ধারণা নেই।

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভের ফলে যে আনন্দ উপভোগ করা যায় তা ব্রহ্মানন্দের থেকে অনেক অনেক মহৎ, কেন না এই অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপের সঙ্গ করা যায়। পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণ করে ভগবানের সঙ্গলাভের যে দিব্য আনন্দ, তা থেকে নির্বিশেষবাদীরা বঞ্চিত হন। তাই দেখা যায় যে, নির্বিশেষবাদীরা *ভগবদ্গীতার* মতো গ্রন্থ, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অর্জুনের সঙ্গে কথা বলছেন, তা পাঠ করে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন না। পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার ফলে ভক্তরা যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, নির্বিশেষ ধারণার প্রতি আসক্ত থাকার ফলে তাঁরা সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন। তাই নির্বিশেষবাদীর প্রদত্ত *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য উৎপাত সৃষ্টিকারী, কারণ *ভগবদ্গীতার* দিব্য ভাব উপলব্ধি না করতে পেরে তাঁরা মনগড়া সর্বনাশা ভাষ্য রচনা করেন। কিন্তু কোন নির্বিশেষবাদী যদি কোন শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে আসেন, তা হলে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতির স্তর অতিক্রম করে আরও অনেক উন্নত স্তরের চেতনা লাভ করতে পারেন। তাই মহান ঋষিদেরও

পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা সর্বোত্তম আনন্দ লাভ করতে পারেন।

ভগবানের অর্চাবিগ্রহের আরাধনা না করে *ভগবদ্গীতা*, *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি গ্রন্থের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। যে সমস্ত মহর্ষিরা শান্তরসের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের উচিত প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য, শাশ্বত চতুর্ভুজ রূপের শরণাগত হওয়া। তাই যোগীদের বিষ্ণুরূপের ধ্যান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবৎ-অবতার কপিলমুনি সাংখ্যযোগ প্রণালীতে সেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক যোগী শূন্যের ধ্যান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার ফলে তাঁরা অধিক ক্লেশই ভোগ করেন, কোন সফলতা তাঁরা লাভ করেন না।

কতিপয় তপোনিষ্ঠ মহাত্মা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপ দেখে বলেন, "ভগবানের এই চতুর্ভুজ ঘনশ্যাম রূপ সমস্ত আনন্দের উৎস এবং আমাদের জীবনের কেন্দ্র। যখন তাঁর এই শাশ্বত রূপ আমরা দর্শন করি, তখন পরমহংসদের সঙ্গে আমরাও তাঁর রূপে তৎক্ষণাৎ মোহিত হয়ে যাই।" মহাত্মাদের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর এই অনুভূতি শান্তরসে হয়। পারমার্থিক মার্গের প্রাথমিক স্তরে সাধক কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করার মাধ্যমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে তাঁরা ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে উপনীত হন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, এই ব্রহ্মভূত স্তরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁরা শোক ও আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে প্রসন্ন হন এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হন। ভক্ত যখন শান্ত রসে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি ভগবানের বিষ্ণুরূপের প্রতি আসক্ত হন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান বিষ্ণুকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক সংস্কৃতির লক্ষ্য। *ঋগ্বেদের* একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, যে কোন উন্নত তপোনিষ্ঠ সন্ত সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা করেন, যেন তিনি শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে ধ্যানমগ্ন থাকতে পারেন।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, মূর্খরাই কেবল জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, জীব যখন শ্রীবিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, তখন তাঁর ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। তারপর যদি তিনি সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে থাকেন, তা হলে ক্রমান্বয়ে ভগবদ্ভক্তির অন্যান্য লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। শান্তরসের এই স্তরে উপলব্ধি হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অসুরদের পর্যন্ত মুক্তিদান করতে পারেন। এই স্তরে ভক্ত সচ্চিদানন্দঘন, আত্মারাম শিরোমণি, পরমাত্মা ও পরম-ব্রহ্মরূপে ভগবানকে দর্শন করেন। তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে শান্ত, সর্বতোভাবে সংযত, নিত্য শুদ্ধ, ভক্তবৎসল ও জড়াতীত বলেও অনুভব করা হয়। সম্ভ্রম

ও মর্যাদার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই দর্শন ভগবদ্ভক্তির শান্তরসে অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষণ।

নির্বিশেষবাদীরা শান্তরসের এই অবস্থায় তখনই অধিষ্ঠিত হতে পারেন, যখন তাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করেন। তা না হলে তা সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর মুক্ত জীব যখন শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে আসেন এবং কোন রকম কদর্থ না করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা বিনীতভাবে গ্রহণ করেন, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির এই শান্তরসে অধিষ্ঠিত হন। ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত মহাত্মাদের শান্তরসে ভগবদ্ভক্তি লাভের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছেন সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার—এই চার কুমার। চতুঃসন নামে পরিচিত এই চার কুমার হচ্ছেন ব্রহ্মার পুত্র। তাঁদের জন্মের পর তাঁদের পিতা ব্রহ্মা যখন তাঁদের গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করে প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ দেন, তখন তাঁরা তাঁর সেই আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা বলেন যে, তাঁরা ইতিমধ্যেই সংসার জীবনে জড়িয়ে না পড়তে মনস্থ করেছেন; পক্ষান্তরে, তাঁরা পরমার্থ সাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করবেন। এই মহাপুরুষদের আয়ু যদিও কোটি কোটি বৎসর, কিন্তু তবুও তাঁদের দেখতে ঠিক চার-পাঁচ বছরের বালকের মতো। তাঁদের গায়ের রঙ শুভ্র, তাঁরা জ্যোতির্ময়, এবং তাঁরা সব সময় নগ্ন শরীরে বিচরণ করেন। এই চারজন মহাত্মা প্রায় সর্বদাই একসঙ্গে থাকেন।

এক প্রার্থনায় তাঁরা বলেছেন, "হে মুকুন্দ! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নব তমালের মতো ঘনশ্যাম, সচ্চিদানন্দঘন রূপ দর্শন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্তই কেবল মহাত্মাদের কাছে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সুখদায়ক বলে মনে হয়।"

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে মহাত্মার যোগ্যতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তিনিই হচ্ছেন মহাত্মা, যিনি পূর্ণরূপে জানেন যে, কেবল ভক্তিযোগের অনুশীলন করার ফলে তিনি অবশ্যই মুক্তিলাভ করবেন। তিনি নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন এবং সেই সঙ্গে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন।"

সন্তপুরুষ মনে করেন, "সেই দিন কবে হবে যখন আমি একলা পর্বতকন্দরে বাস করতে সক্ষম হব? সেই দিন কবে হবে যখন কৌপীন হবে আমার বসন? কবে আমি কেবল একটু ফল-মূল আহার করে তৃপ্ত হব? কবে আমি ব্রহ্মজ্যোতির উৎস ভগবান মুকুন্দের চরণারবিন্দে নিরন্তর ধ্যান করতে পারব? কবে আমি এইভাবে পারমার্থিক জীবন লাভ করে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারব যে, আমার দিন ও রাত্রি হচ্ছে অনন্তকালের এক নগণ্য ক্ষণমাত্র?"

যে সমস্ত ভক্ত ও আত্মজ্ঞানী পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি এক দিব্য প্রেম অনুভব করেন।

এইভাবে তাঁরা আনন্দরূপী চন্দ্রের রশ্মিচ্ছটা আস্বাদন করেন, এবং তাঁদের বলা হয় মহাত্মা।

এই ধরনের মহাত্মারা সাধারণত *বেদ* বিশেষ করে *উপনিষদ* পাঠে আসক্ত থাকেন। তাঁরা সাধারণত লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে নির্জনে বসবাস করেন, যাতে তাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য রূপের ধ্যান করতে পারেন, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারেন এবং তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে সাধারণত জ্ঞানের প্রাধান্য দেখা যায়, তাঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের প্রয়াসী এবং তাঁরা নিরন্তর জ্ঞানী ভক্তদের সঙ্গ করে বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে ভালবাসেন। সন্ত পুরুষদের এই সমস্ত গুণাবলী তাঁদের শান্তরসের স্তরে উন্নীত করে।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা *উপনিষদ* আদি বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করার জন্য ব্রহ্মার আয়োজিত পুণ্য সভায় যোগদান করেন, তাঁরা যদুকুল শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে, *উপনিষদ* আদি বৈদিক গ্রন্থ অধ্যয়নের ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। এই জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করা *উপনিষদের* একটি আনুসঙ্গিক বিষয় মাত্র। তার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং তারপর এই নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্তর অতিক্রম করে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসেন, তখনই *উপনিষদের* চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

যাঁরা শান্তরসের স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁরা ভগবানের চরণে অর্পিত তুলসীর সুগন্ধ আঘ্রাণ করে, শঙ্খধ্বনি শুনে, গিরি অথবা পর্বতস্থিত পুণ্যস্থান দর্শন করে, বৃন্দাবনের মতো বন নিরীক্ষণ করে, তীর্থ ভ্রমণ করে, পুণ্যতোয়া গঙ্গার তটে গমন করে, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আদি দেহের আবেগগুলি দমন করে, কালের সর্বসংহারত্ব উপলব্ধি করে এবং নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। শান্তরসে অধিষ্ঠিত মহাত্মাদের পক্ষে ভগবদ্ভক্তির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য এই সমস্ত বিষয়গুলি সাহায্য করে।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/১৫/৪৩) সনকাদি চার কুমারের সম্বন্ধে একটি বর্ণনা রয়েছে। তাঁরা যখন বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন করতে গিয়ে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন, তখন অগুরু-চন্দন চর্চিত তুলসীর সুগন্ধ তাঁদের নাসিকায় প্রবেশ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁদের চিত্ত পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যদিও এই চারজন মহাত্মা নিরন্তর নির্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গলাভের প্রভাবে এবং ভগবানের চরণে অর্পিত

তুলসীর সুগন্ধ আঘ্রাণ করে তৎক্ষণাৎ তাঁদের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষেরাও শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে অচিরেই পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ভগবদ্ভক্তির শান্তরসের স্তরে অধিষ্ঠিত মহর্ষিদের কতকগুলি লক্ষণ রয়েছে, এবং সেই লক্ষণগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁরা নাসিকার অগ্রভাগে তাঁদের দৃষ্টি একাগ্রীভূত করেন, এবং তাঁরা অবধূতের মতো আচরণ করেন। অতি উন্নত স্তরের যে যোগী কোন সামাজিক, ধর্মীয় অথবা বৈদিক আচরণকে গ্রাহ্য করেন না, তাঁদের বলা হয় অবধূত। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে যে, এই ধরনের পুরুষেরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা যখন কথা বলেন, তখন তাঁরা তাঁদের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যুক্ত করেন। এই মুদ্রাকে বলা হয় 'জ্ঞানমুদ্রা'। তাঁরা নাস্তিকদের বিরোধী নন, আবার ভগবদ্ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত নন। এই ধরনের পুরুষেরা মুক্তি ও বিষয়-পরায়ণ জীবনের প্রতি অনাসক্তির মাহাত্ম্য খুব বেশি করে অনুভব করেন। তাঁরা সর্বদাই জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন এবং জড় বিষয়ের প্রতি তাঁদের আসক্তি বা কোন রকম মমতা থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন থাকার ফলে তাঁরা সর্বদাই অত্যন্ত গম্ভীর। শান্তরসে অধিষ্ঠিত ভক্তদের মধ্যে এই সমস্ত অসাধারণ লক্ষণগুলি দেখা যায়।

নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি একাগ্র করা সম্বন্ধে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ভক্ত কোন এক যোগীকে এইভাবে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে দেখে বলেন, "এই মহর্ষি তাঁর নাসিকার অগ্রভাগে তাঁর দৃষ্টিকে একাগ্র করছেন, এবং তা দেখে মনে হচ্ছে যে, তিনি তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত রূপ দর্শন করছেন।"

শান্ত ভক্তকে কখনও কখনও হাই তুলতে দেখা যায়, শরীর আড়মোড়া দিতে দেখা যায়, ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে দেখা যায়, ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করতে দেখা যায়, সুন্দরভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। এগুলি শান্ত ভক্তের কতকগুলি লক্ষণ। এক ভক্তকে হাই তুলতে দেখে অন্য আর একজন ভক্ত বলেন, "হে যোগী! আপনার হৃদয়ে ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমের অনুভূতি হওয়ার ফলে আপনি এইভাবে জৃম্ভণ করছেন।" কখনও কখনও শান্তরসে অধিষ্ঠিত ভক্ত ভূমিতে লুটান, তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং সর্বশরীরে কম্পন দেখা দেয়। এইভাবে ভগবৎ-প্রেমজনিত সমাধির বিভিন্ন লক্ষণ এই সমস্ত ভক্তের মধ্যে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজান, তখন পর্বতকন্দরে সমাধিমগ্ন মহর্ষিরা সমাধি থেকে জেগে

ওঠেন। সেই দিব্য শঙ্খনাদ শ্রবণে তাঁদের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কখনও কখনও শান্তরসের ভক্তদের স্তম্ভন, শান্তি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, আবেগ, বিতর্ক আদি সঞ্চারী ভাবের অভিব্যক্তি হয়।

এক সময় এক তত্ত্বদর্শী শোক করে বলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থান করছেন, কিন্তু তিনি তাঁকে দর্শন করতে পারলেন না। এ কথা মনে হওয়ার পর সেই মহর্ষি তৎক্ষণাৎ স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁর তখন মনে হয়, তিনি কেবল তাঁর সময়ের অপব্যবহার করছেন। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বিরাজমান থাকলেও, ধ্যানমগ্ন থাকার ফলে তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না।

যোগী যখন সব রকম মনোধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থায় স্থিত হন, তখন তাঁর সেই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। এই অবস্থা সব রকম দেহাত্মবুদ্ধির অতীত। সেই অবস্থায় যদি কারও ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয়, তখন দেহে কম্পন আদি সাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হয়।

নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত স্বরূপের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁর দিব্য আনন্দ অনন্ত গুণে বর্ধিত হয়। এক মহর্ষি অপর এক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে সখে! তোমার কি মনে হয় যে, অষ্টাঙ্গযোগ সিদ্ধির পর আমি পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত রূপ দর্শন করতে পারব?" মহর্ষির এই অনুসন্ধান শান্ত ভক্তের ঔৎসুক্যতার একটি দৃষ্টান্ত।

সূর্যগ্রহণের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর অগ্রজ বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রা সহ রথে চড়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তখন বহু যোগীও সেখানে এসেছিলেন। সেই যোগীরা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করেন, তখন তাঁরা বলে ওঠেন যে, ভগবানের অপূর্ব জ্যোতির্ময় দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা দর্শন করার পর, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান জনিত আনন্দের কথা তাঁরা ভুলে গেছেন। তখন জনৈক মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলেন, "হে প্রভো! আপনি সব রকম দিব্য অবস্থার অতীত অপ্রাকৃত আনন্দে পরিপূর্ণ। তাই দূর থেকে আপনাকে দর্শন করা মাত্র আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার আর নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দের কোন প্রয়োজন নেই।"

শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শোনার পর যখন এক মহাযোগী তাঁর সমাধি থেকে জেগে ওঠেন, তখন তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, দিব্য প্রেমে তাঁর আঁখি দুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তিনি ভূমিতে মাথা ঠুকতে থাকেন এবং যোগাভ্যাসের সমস্ত বিধিবিধান লঙ্ঘন করতে থাকেন। এইভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পদ্ধতির উপেক্ষা করেন।

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর *কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থে বলেছেন, "নির্বিশেষবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করুক। আমি যদিও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে দীক্ষিত

হয়েছিলাম, এখন আমি একটি দুরন্ত বালকের দ্বারা মার্গভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি। সেই বালকটি অত্যন্ত চতুর এবং সে গোপিকাদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এখন সে আমাকে তাঁর দাসী বানিয়েছে। তাই আমি এখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পন্থার কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছি।"

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রথমে নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির পথে দীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের পর তিনি এক অতি উত্তম ভক্তে পরিণত হন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীরও তাই হয়েছিল, যিনি প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু পরে ভগবানের কৃপায় সেই ব্রহ্মজ্ঞানের পন্থা প্রত্যাখ্যান করে ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, যাঁরা ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার জন্য পরতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন শান্ত ভক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কোন কোন অধিকারীদের মতে এই অবস্থাকে কোন একটি রস বলে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, এই অবস্থাকে রস বলে স্বীকার না করলেও তাকে ভগবদ্ভক্তির প্রারম্ভিক অবস্থা বলে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কেউ যদি তারপর ভগবানের বাস্তবিক সেবাস্তরে উন্নীত না হন, তা হলে তিনি ভক্তিরসের স্তরে রয়েছেন বলে মনে করা হবে না। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছেন, "আমার স্বরূপে যখন চিত্ত স্থির হয়, তাকে বলা হয় শান্তরস, এবং সেই অবস্থায় অধিষ্ঠিত না হয়ে কেউ যথার্থ শুদ্ধভক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।" অর্থাৎ, অন্তত শান্তরসে অধিষ্ঠিত না হয়ে কেউ পরমেশ্বর ভগবানের রূপের প্রতি আসক্ত হতে পারেন না।

# ষষ্ঠত্রিংশতি অধ্যায়

# প্রীতভক্তি (দাস্য)

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতো আচার্যরা ভগবানের প্রতি দিব্য অনুরাগজনিত অপ্রাকৃত রসকে ভগবদ্ভক্তির একটি সিদ্ধ অবস্থা বলে স্বীকার করেছেন। এই অবস্থাটি শান্তরসের ঠিক উপরে, এবং দাস্যরসের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। *নামকৌমুদী* আদি গ্রন্থে এই অবস্থাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতির স্থায়ীভাব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো আচার্যরা প্রীতির এই অবস্থাকে শান্ত রস বলে বর্ণনা করেছেন। ভক্তরা এই প্রীতিকে নানা রকম দিব্য স্বাদে আস্বাদন করেন এবং তাই এই প্রীতিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ রতি বলে গণনা করা হয়।

দাস্যভাবে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্ভ্রম-পরায়ণ। গোকুলে (এই পৃথিবীতে বৃন্দাবনের যে প্রকাশ) কয়েকজন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রকম সম্ভ্রমযুক্ত প্রীতিপরায়ণ। ব্রজবাসীরা বলতেন, "শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ নিয়ে সর্বদাই আমাদের সামনে প্রকাশিত রয়েছেন। তাঁর করকমলে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত মুরলী শোভা পায়। তিনি পীতবসনধারী এবং তাঁর মস্তকে শিখিপুচ্ছ শোভা পায়। এই রূপ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বতের সন্নিকটে গমন করেন, তখন স্বর্গের দেবতারা ও এই পৃথিবীর অধিবাসীরা এক দিব্য আনন্দ অনুভব করেন এবং তাঁরা নিজেদের ভগবানের নিত্য সেবক বলে মনে করেন।" অনেক সময় ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের মতো পীতবসনধারী এবং অঙ্গকান্তি-সম্পন্ন বিষ্ণুর চিত্র দর্শন করে এই রকম সম্ভ্রম ও গৌরবের ভাব অনুভব করেন। বিষ্ণু ও কৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, বিষ্ণুরূপ চতুর্ভুজ এবং সেই চার হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন। শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই চন্দ্রকান্ত মণি, সূর্যকান্ত মণি আদি দুর্লভ মণিমাণিক্যে শোভিত।

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ললিত মাধব* গ্রন্থে দারুক নামক শ্রীকৃষ্ণের এক সেবকের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "কৌস্তুভ মণির কণ্ঠহার শোভিত শ্রীবিষ্ণু অবশ্যই অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর চার হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে আছেন এবং তাঁর রত্নরাশি দেদীপ্যমান। গরুড়ের উপর বিরাজমান তাঁর শাশ্বত অবস্থায় তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। কিন্তু এখন সেই বিষ্ণুই কংসারি রূপে এখানে বিরাজ করছেন। তাঁর সবিশেষ রূপ দর্শন করে আমি বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্যের কথা ভুলে গেছি।"

আর একজন ভক্ত এক সময় বলেন, "এই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর প্রতিটি রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য উদয় হয়, যিনি দয়ার সাগর, যিনি অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, যিনি সর্বসিদ্ধি সমন্বিত, যিনি সমস্ত অবতারের অবতারী, যিনি মুক্ত পুরুষদেরও আকর্ষণ করেন—সেই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং পরম আরাধ্য। তিনি সর্বজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও ষড়ৈশ্বর্যময়। তিনি ক্ষমার প্রতীক এবং শরণাগতের আশ্রয়। তিনি উদার, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সুদক্ষ, সর্ব মঙ্গলময়, বলবান ও ধার্মিক। তিনি কঠোরভাবে শাস্ত্রের অনুবর্তী, ভক্তদের সুহৃৎ, উদার, প্রভাবশালী, কৃতজ্ঞ, যশস্বী, মাননীয়, সর্ব শক্তিমান এবং শুদ্ধ প্রেমের বশীভূত। অবশ্যই তিনি দাস্যভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ভক্তদের একমাত্র আশ্রয়।"

ভগবানের দাস্য ভক্তদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়—অধিকৃত সেবক (যেমন ব্রহ্মা ও শিব, যাঁদের জড় জগতে রজ ও তমোগুণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে), ভগবানের আশ্রিত সেবক, নিত্য পার্ষদ ও ভগবানের অনুগত সেবক।

## অধিকৃত সেবক

কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতী তাঁর সখী কালিন্দীকে জিজ্ঞাসা করেন, "কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করছেন উনি কে?"

কালিন্দী উত্তর দেন, "উনি অম্বিকা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালিকা।"

জাম্ববতী তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে কাঁপছেন, উনি কে?"

কালিন্দী উত্তর দেন, "উনি দেবাদিদেব মহাদেব।"

"প্রার্থনা করছেন উনি কে?"

"উনি ব্রহ্মা।"

"ভূপতিত হয়ে কৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করছেন, উনি কে?"

"উনি দেবরাজ ইন্দ্র।"

"দেবতাদের সাথে যিনি এসেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে হাসছেন উনি কে?"

"উনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যমরাজ।"

এই আলোচনার মাধ্যমে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত সমস্ত দেবতাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁদের বলা হয় অধিকৃত সেবক।

## আশ্রিত সেবক

জনৈক ব্রজবাসী এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! হে বৃন্দাবনের আনন্দ! এই সংসার ভয়ে ভীত হয়ে আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করেছি, কেন

না আপনি আমাদের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারেন। আপনার মহিমা সম্বন্ধে আমরা পূর্ণরূপে অবগত। আমরা মুক্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করে পূর্ণরূপে আপনার চরণ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আপনার নিত্য বর্ধনশীল প্রেমের কথা শোনা মাত্রই আমরা স্বেচ্ছায় আপনার দিব্য সেবায় যুক্ত হয়েছি।" এটি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্তের উক্তি।

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের আঘাতের দ্বারা দণ্ডিত হয়ে যমুনায় নিবাসকারী ভয়ঙ্কর কালসর্প কালীয়ের সুমতি হয় এবং সে তখন স্বীকার করে, "হে প্রভো! আমি আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি, কিন্তু তবুও আপনি এতই কৃপাপরবশ যে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের ছাপ আপনি আমার মস্তকে অঙ্কিত করেছেন।" এটিও শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করার একটি দৃষ্টান্ত।

*অপরাধ-ভঞ্জন* গ্রন্থে এক শুদ্ধ ভক্ত তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছেন, "আমি এতকাল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যরূপী প্রভুদের আজ্ঞা পালন করে এসেছি, সেই কথা আপনার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। কখনও কখনও অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে আচরণ করে আমাকে তাদের আজ্ঞা পালন করতে হয়েছে। যদিও আমি অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে তাদের সেবা করেছি, তবুও তারা সন্তুষ্ট হয়নি এবং কৃপা পূর্বক তাদের সেবা থেকে আমাকে মুক্ত করেনি। এইভাবে আমার সেবা গ্রহণ করতে তারা একটুও লজ্জিত হয়নি। হে প্রভো! হে যদুপতি! এখন আমার সুমতি হয়েছে, এবং তাই আমি আপনার চরণ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করুন।" এটি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার এবং তাঁর চরণ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ করার একটি দৃষ্টান্ত।

মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী পুরুষদের সেই পন্থা পরিত্যাগ করে, সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করার বহু দৃষ্টান্ত বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে নৈমিষারণ্যে শৌনক আদি ঋষিরা। বিদ্বান পুরুষেরা তাঁদের পূর্ণজ্ঞানী ভক্ত বলে স্বীকার করেন। *হরিভক্তি-সুধোদয়ে* উল্লেখ করা হয়েছে, এই সমস্ত মহর্ষিরা শৌনক ঋষির অধ্যক্ষতায় সূত গোস্বামীকে বলেন, "হে মহাত্মন! দেখুন এ কি আশ্চর্যের বিষয়! যদিও আমরা সংসারের নানা রকম কলুষের দ্বারা কলুষিত ছিলাম, কিন্তু তবুও আপনার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করার ফলে আমরা এখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ করছি।"

*পদ্যাবলীতে* এক ভক্ত বলেন, "যাঁরা আত্মোপলব্ধির জন্য শুষ্ক জ্ঞানের প্রতি আসক্ত, যাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, পরম সত্য ধ্যানেরও অতীত, এবং তার ফলে যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়েছেন—তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের কাজ করতে থাকুন। কিন্তু আমরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত,

যিনি স্বাভাবিকভাবে পরম মধুর, যাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো, যিনি পীত বসনধারী এবং যাঁর চোখ দুটি পদ্মের মতো সুন্দর। আমাদের একমাত্র অভিলাষ কেবল তাঁর ধ্যান করা।"

যাঁরা আত্মোপলব্ধির প্রথম থেকেই ভগবদ্ভক্তির প্রতি আসক্ত, তাঁদের বলা হয় সেবানিষ্ঠ। সেবানিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে, "ভগবদ্ভক্তির প্রতি আসক্তি।" এই ধরনের ভক্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শিব, ইন্দ্র, মহারাজ বহুলাশ্ব, মহারাজ ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব ও পুণ্ডরীক। এক ভক্ত বলেন, "হে প্রভো! আপনার দিব্য গুণাবলী মুক্ত পুরুষদেরও আকৃষ্ট করে তাঁদের ভগবদ্ভক্তের কাছে নিয়ে আসে, যেখানে নিরন্তর আপনার মহিমা কীর্তিত হয়। নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন মহর্ষিরাও আপনার মহিমা কীর্তনে আকৃষ্ট হন। আপনার সমস্ত দিব্য গুণাবলী দর্শন করে আমিও আকৃষ্ট হয়েছি এবং আপনার প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছি।"

## নিত্য পার্ষদ

দ্বারকাপুরীতে নিম্নলিখিত ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলে পরিচিত—উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপানন্দ, ভদ্র ইত্যাদি। এঁরা সকলে ভগবানের সচিবরূপে সব সময় ভগবানের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তাঁরা ভগবানের সেবাকার্য করেন। কুরুবংশের ভীষ্ম, মহারাজ পরীক্ষিৎ ও বিদুরকেও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলে গণ্য করা হয়। কথিত আছে, "শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত পার্ষদেরা জ্যোতির্ময় দেহযুক্ত এবং তাঁদের চোখ ঠিক পদ্মফুলের মতো। তাঁরা এত শক্তিশালী যে, তাঁরা দেবতাদের শক্তিকে পরাভূত করতে পারেন এবং তাঁরা সর্বদাই নানা রকম মূল্যবান মণিমাণিক্যে ভূষিত।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন, তখন কেউ তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করেন—"হে প্রভো! উদ্ধব আদি আপনার পার্ষদেরা সর্বদাই দ্বারকার দ্বারপ্রান্তে আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁরা আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং আপনার সেবায় ঐকান্তিকভাবে উৎসাহী হয়ে তাঁরা দেবাদিদেব মহাদেবের প্রলয়াগ্নিকে পর্যন্ত ভয় করেন না। তাঁরা পূর্ণরূপে আপনার চরণ কমলের শরণাগত।"

শ্রীকৃষ্ণের অনেক অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে উদ্ধবকে সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়। তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—"তাঁর অঙ্গকান্তি কালিন্দীর জলের মতো ঘনশ্যাম ও স্নিগ্ধ। তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মালা ধারণ করে থাকেন। তাঁর বস্ত্রও শ্রীকৃষ্ণের বসনের মতো পীতবর্ণ। তাঁর বাহুযুগল অর্গলের মতো দীর্ঘ ও স্থূল, তাঁর চোখদুটি ঠিক পদ্মফুলের মতো এবং সমস্ত ভক্ত ও পার্ষদের মধ্যে

তিনিই হচ্ছেন প্রধান। সেই উদ্ধবের চরণকমলে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করে উদ্ধব বলেছেন— "আমাদের প্রভু ও আরাধ্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ দেবাদিদেব মহাদেব ও ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। তিনি সমস্ত জগতের নিয়ন্তা। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর পিতামহ উগ্রসেনের আদেশ শিরোধার্য করেন। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, কিন্তু তবুও তিনি সাগরের কাছে স্বল্প পরিসর দ্বারকাভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। যদিও তিনি জ্ঞানের সাগর, তবুও কখনও কখনও তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি এতই মহান ও উদার, তবুও তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকেন।"

## অনুগত সেবক

যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত তাঁদের বলা হয় অনুগ। এই ধরনের অনুগামীর দৃষ্টান্ত হচ্ছেন সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও সুতম্ব। তাঁরা সকলেই দ্বারকার অধিবাসী এবং তাঁরা অন্যান্য পার্ষদদের মতোই বসন ও অলঙ্কারে ভূষিত। তাঁরা বিভিন্ন রকম সেবাকার্যে যুক্ত। মণ্ডন সর্বদাই ভগবানের মাথার উপর ছত্রধারণ করেন। সুচন্দ্র চামর ব্যজন করেন এবং সুতম্ব তাম্বূল অর্পণ করেন। তাঁরা সকলেই মহান ভক্ত এবং তাঁরা সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

দ্বারকায় যেমন অনুগ আছেন, বৃন্দাবনেও তেমন অনেক অনুগ আছেন। বৃন্দাবনের অনুগদের নাম হচ্ছে—রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ, শারদ ইত্যাদি।

বৃন্দাবনের অনুগদের রূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে— "আমরা নন্দ-নন্দনের নিত্য অনুগদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তাঁরা সর্বদাই বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, এবং তাদের শ্রীঅঙ্গ মুক্তামালা ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। তাঁদের বসন তাঁদের বিশেষ রঙ ও রূপের অনুরূপ। তাঁদের বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ যশোদা মায়ের উক্তি থেকে বোঝা যায়, 'বকুল, তুমি কৃষ্ণের পীতবসন পরিষ্কার কর। বারিক, তুমি কৃষ্ণের স্নানের জল অগুরু দিয়ে সুবাসিত কর। রসাল, তুমি তাম্বূল তৈরি কর। কৃষ্ণ এখনই আসছে। দিগন্ত গোধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে এবং দূরে গাভীদের দেখা যাচ্ছে।'"

সমস্ত অনুগদের মধ্যে রক্তককে প্রধান বলে গণ্য করা হয়। তাঁর রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে— "তাঁর পরনে পীতবসন এবং তাঁর অঙ্গকান্তি নবীন দুর্বাদলের মতো। তিনি সুমধুর স্বরে গান গাইতে পারেন এবং তিনি সর্বদাই নন্দ-নন্দনের

সেবায় যুক্ত। আমাদের একমাত্র কামনা হচ্ছে যে, আমরা যেন রক্তকের অনুগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারি।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রক্তক যে কত আসক্ত তা রসদের প্রতি তাঁর একটি উক্তির মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি—"হে বন্ধু শোন! কৃপা করে আমাকে এমনভাবে নিযুক্ত কর, যেন আমি সর্বদাই গিরিধারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।"

যে সমস্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সেবায় যুক্ত, তাঁরা সর্বদাই অত্যন্ত সাবধানী, কেন না তাঁরা জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সেবক হওয়া কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত একটি পিপীলিকাকেও যিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তিনি নিত্য আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং যাঁরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন, তাঁরা যে কত উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত তা সহজেই অনুমেয়। রক্তক এক সময় মনে মনে বলেন, "কৃষ্ণই কেবল আমার আরাধ্য ও সেব্য নন, কৃষ্ণের সখী ব্রজগোপিকারাও সেইভাবে আমার আরাধ্য ও সেব্য। শুধু ব্রজগোপিকারাই নন, যাঁরাই কৃষ্ণের সেবা করেছেন, তাঁরাই আমার আরাধ্য ও সেব্য। আমি জানি যে আমার সব সময় খুব সাবধান থাকা উচিত, যাতে আমি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত ও ভৃত্য হওয়ার ফলে অত্যন্ত গর্বিত না হয়ে পড়ি।" এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, যথার্থভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন যে শুদ্ধ ভক্ত, তিনি সর্বদাই অত্যন্ত সাবধান এবং কখনই তিনি তাঁর সৌভাগ্য গর্বে গর্বিত হন না।

সুদক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রীল রূপ গোস্বামী অনুগদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—ধূর্য, ধীর ও বীর। রক্তক হচ্ছেন ধূর্য শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ যিনি নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয়তমা গোপিকাদের সেবার প্রতি আকৃষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের এক ধীর পার্ষদ হচ্ছেন সত্যভামার ধাত্রীপুত্র। সত্যভামা হচ্ছেন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের অন্যতমা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তাঁর ধাত্রীপুত্রও তাঁর সঙ্গে যান। কারণ তাঁদের শৈশব থেকেই তাঁরা ভাই ও বোনের মতো একসঙ্গে বড় হয়েছিল। সত্যভামার এই ধাত্রীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর শ্যালকরূপে বসবাস করতেন, এবং কখনও কখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিহাস করতেন। এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে তিনি বলেন—"হে কৃষ্ণ! আমি কখনও তোমার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভের চেষ্টা করিনি, কিন্তু আমি এতই ভাগ্যবান যে, তোমার গৃহে সত্যভামার ভ্রাতারূপে তোমার পরিবারের একজন সদস্যরূপে আমি স্থান পেয়েছি।"

এক বীর পার্ষদ গর্বভরে ঘোষণা করেন, "বলদেব প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে আমি ভয় করি না। প্রদ্যুম্ন তো কেবল একটি বাচ্চা ছেলে, তাকেও আমি গ্রাহ্য করি না। আমি কাউকেই গ্রাহ্য করি না। আমি কেবল

কামনা করি, শ্রীকৃষ্ণ যেন কৃপাপূর্বক আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সেই কৃপা লাভে উদ্ধত আমি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া সত্যভামাকেও ভয় পাই না।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* চতুর্থ স্কন্ধে (৪/২০/২৮) মহারাজ পৃথু ভগবানকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে প্রভো! সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন অথবা তাঁর সঙ্গে আমার ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, কিন্তু সেই জন্য আমার কোনও মনস্তাপ নেই, কেন না আপনি আমার একমাত্র ভরসা। আপনি সর্বদাই আপনার ভৃত্যের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ এবং তাদের ক্ষুদ্র সেবাও আপনি উন্নত স্তরের সেবা বলে গণনা করেন। তাই আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, আপনি আমার বিনীত সেবা গ্রহণ করবেন, যদিও তা অতি নগণ্য। হে প্রিয় প্রভো! আপনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নির্ভরশীল। কারও কোন সাহায্য ব্যতীতই আপনি সব কিছু করতে পারেন। তাই সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তবুও আপনি আমার সেবা গ্রহণ করবেন, সেই বিষয়ে আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।"

আশ্রিত, পার্ষদ ও অনুগ — এই তিন প্রকার দাসদের মধ্যে আবার সাধক, সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ এই তিনটি ভাগ আছে।

# সপ্তত্রিংশতি অধ্যায়

# কৃষ্ণসেবার উদ্দীপন

শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা প্রাপ্তি, তাঁর চরণ-কমলের রজঃ প্রাপ্তি, তাঁর প্রসাদ এবং তাঁর ভক্তের সঙ্গ—এই সবের প্রভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উদ্দীপন হয়।

পিতামহ ভীষ্মের মহাপ্রয়াণের সময় তাঁর সামনে উপস্থিত থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের পিতামহ ভীষ্মদেব এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পূর্বে শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, মহারাজ যুধিষ্ঠির ও অপর পাণ্ডবেরা তাঁর কাছে যান। ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং মহান ব্রাহ্মণ সেনাপতি কৃপাচার্যকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, "হে কৃপাচার্য! শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা দর্শন করুন। আমি সব চাইতে দুর্ভাগা। আমার কোন গুণ নেই। আমি শ্রীকৃষ্ণের সব চাইতে প্রিয় বন্ধু অর্জুনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম—এমন কি, আমি তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করেছিলাম! আমি এত কলুষিত, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, আমার জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন। তিনি সমস্ত মহর্ষিদের আরাধ্য, কিন্তু তবুও তিনি এতই করুণাময় যে, আমার মতো একজন জঘন্য ব্যক্তিকে দর্শন করবার জন্য তিনি এসেছেন।"

কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, তাঁর শিঙ্গার শব্দ, তাঁর হাস্য, ভূমিতে তাঁর পদচিহ্ন, তাঁর অঙ্গের দিব্য সৌরভ এবং আকাশে নবোদিত মেঘ—এই সমস্ত কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপক।

*বিদগ্ধ-মাধব* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বাঁশি বাজাচ্ছিলেন, বলদেব তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, 'দেখ! দেখ! কৃষ্ণের দিব্য বংশীধ্বনি শুনে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র রোদন করছেন। ভূমিতে তাঁর অশ্রুধারা ঝরে পড়ার ফলে, বৃন্দাবনকে দেবতাদের দিব্য নিবাস বলে মনে হচ্ছে।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেম, যাকে অনুভাব বলা হয়, তার লক্ষণগুলি হচ্ছে—পূর্ণরূপে ভগবানের সেবাপরায়ণ হওয়া, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁর আজ্ঞা পালন করা; পূর্ণরূপে প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবায় তৎপর হয়ে উদ্বেগ ও ঈর্ষা থেকে

মুক্ত হওয়া; এবং শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে ভগবানের সেবারত ভক্তদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। এই সমস্ত লক্ষণ প্রেমের অনুভাব।

অনুভাবের প্রথম লক্ষণ, অথবা কোন বিশেষ সেবায় তৎপর হওয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছেন দারুক, যিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চামর ব্যজন করেন। এক সময় তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছিলেন, তখন দিব্য প্রেমে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে, এবং তাঁর শরীরে ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণগুলি প্রকট হয়। কিন্তু দারুক তাঁর সেবায় এত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি প্রেমের সমস্ত অভিব্যক্তিগুলি রোধ করেন, কেন না তার ফলে তাঁর সেবাকার্য ব্যাহত হচ্ছিল। এই সমস্ত লক্ষণগুলি তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই উদিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেগুলির কোন গুরুত্বই দেননি।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৮৬/৩৮) বর্ণনা করা হয়েছে যে, উত্তর ভারতে মিথিলা প্রদেশের শ্রুতদেব নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করা মাত্র এতই আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রণাম নিবেদন করার পরই তিনি দুবাহু তুলে নাচতে শুরু করেন।

শ্রীকৃষ্ণের এক ভক্ত তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "হে প্রভো! যদিও আপনি পেশাদার নর্তক নন, তবুও আপনার নৃত্যের প্রভাবে আমরা এত মুগ্ধ হয়েছি যে, আমরা বুঝতে পারছি, আপনিই হচ্ছেন সমস্ত নৃত্যকলার আচার্য। নিঃসন্দেহে আপনি সাক্ষাৎ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছ থেকে এই নৃত্য শিখেছেন।" কোন ভক্ত যখন প্রেমভরে নৃত্য করেন, তখন সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এই ভাবকে সাত্ত্বিক বলা হয় কেন না তা শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরে প্রকট হয়। এই ভাব কোন প্রাকৃত আবেগ নয়; তা সাক্ষাৎ আত্মার অভিব্যক্তি।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৮৫/৩৮) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেন, "বামনদেবের চরণে সব কিছু সমর্পণ করার পর বলি মহারাজ ভগবানের চরণকমল জড়িয়ে ধরে তাঁর হৃদয়ে স্থাপন করেন। আনন্দে বিহ্বল হওয়ার ফলে তাঁর অঙ্গে প্রেমের সমস্ত দিব্য লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। তাঁর কণ্ঠস্বর কম্পিত হয় এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে।"

প্রেমভাবের এই অভিব্যক্তিগুলির মধ্যে গৌণ লক্ষণও রয়েছে, যেমন—হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, বিষণ্ণতা, চিন্তা, দৈন্য, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জাড্য, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সংযোগ হওয়ার ফলে ভক্তের মধ্যে হর্ষ, গর্ব, ধৃতি আদি লক্ষণ দেখা যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁদের মোহ, ব্যাধি, মৃত্যু আদি লক্ষণ দেখা যায়।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১১/৫) বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন রণাঙ্গন থেকে দ্বারকায় তাঁর গৃহে ফিরে আসেন, তখন দ্বারকার সমস্ত অধিবাসীরা, পিতা দূর দেশ থেকে ফিরে এলে শিশুপুত্র যেভাবে তাঁর সঙ্গে প্রেমপূর্বক কথা বলে, সেইভাবে কথা বলছিলেন। এটি হর্ষের উদাহরণ।

মিথিলার রাজা বহুলাশ্ব যখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রাসাদে দর্শন করেন, তখন তিনি সঙ্কল্প করেন যে, অন্তত একশ বার তিনি তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করবেন। কিন্তু প্রেমের আবেগে তিনি এতই বিভোর হয়ে পড়েছিলেন যে, একবার প্রণাম করবার পর তিনি আত্মবিস্মৃত হন এবং ভূমি থেকে উঠতে অক্ষম হন।

*স্কন্দ পুরাণে* এক ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন, "হে প্রভো! সূর্য যেমন তাঁর প্রবল তেজের প্রভাবে ভূমি থেকে সমস্ত জল শুষে নেয়, তেমনই আপনার বিরহে আমার মনোবেদনা আমার মুখ ও শরীরের ঔজ্জ্বল্য শুষে নিয়েছে।" এটি ভগবৎ-প্রেমে শুষ্ক হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত।

বিফল মনোরথ হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায় স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে। সূর্যদেবকে দর্শন করে ইন্দ্র বলেন, "প্রিয় সূর্যদেব! আপনার রশ্মিচ্ছটা অত্যন্ত মহিমামণ্ডিত, কেন না তা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শ করে। আমার হাজার নেত্রও নিরর্থক, কেন না সেগুলি এক পলকের জন্যও ভগবানের চরণারবিন্দ দর্শন করতে পারল না।"

ভগবানের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ প্রীতি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে প্রেমে পর্যবসিত হয়। তারপর তা স্নেহ এবং তারপর আরও বর্ধিত হয়ে রাগে পরিণত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৮/৬) অক্রূর বলেছেন, "আজ আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হল, এবং আমার জীবন ধন্য হল, কেন না আজ আমি পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আমার প্রণতি নিবেদন করব।"

অন্য আর এক ভক্ত তাঁর সম্ভ্রম প্রীতিভাব সহকারে বলেন, "আমার জীবনে সেই ধন্যাতিধন্য দিন কবে আসবে, যেদিন আমি যমুনার তটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন গোপবালক রূপে খেলা করতে দেখব?"

যখন এই প্রীতির হ্রাস হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং কোন রকম দ্বিধা থাকে না, তখন ভক্ত অবিচলিত কৃষ্ণপ্রেমে অধিষ্ঠিত হন। এই স্তরে ভক্তের সমস্ত ভাবকে অনুভাব বলা হয়।

বলি মহারাজ যে সম্ভ্রম প্রীতি অনুভব করেছিলেন, তার বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, "হে প্রভু! আপনি একই সঙ্গে আমাকে দণ্ডদান করেছেন এবং আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করেছেন। তাই আমি নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করতে পারছি যে, যদি আমি আপনার চরণ-কমলের শরণাগত হই, তা হলে জীবনের

কোন অবস্থাতেই আমার উদ্বেগ উপস্থিত হবে না। আপনি আমাকে সমস্ত যোগসিদ্ধি দান করুন অথবা আমাকে সব চাইতে জঘন্য নারকীয় পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত করুন, আমি তাতে বিচলিত হব না।"

শ্রীকৃষ্ণও বলি মহারাজকে দেখে উদ্ধবকে বলেন, "হে সখে! বলি মহারাজের গৌরবময় চরিত্রের বর্ণনা আমি কিভাবে করব? যদিও বিরোচন-পুত্র এই বলি ভৃগুনন্দনের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছে, এবং যদিও আমি বামন অবতার রূপে তাঁকে ছলনা করে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তাঁর সাম্রাজ্য হরণ করেছি, এবং যদিও সুদৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রতিজ্ঞা পালন না করার জন্য আমি তার নিন্দা করেছি, তবুও আমাকে দর্শন করা মাত্রই সে আমার প্রতি তার প্রেম প্রদর্শন করেছে।"

প্রেম যখন তীব্র হয়ে ওঠে, তখন তাকে স্নেহ বলা হয়। স্নেহের অবস্থায় ক্ষণিকের জন্যও শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করা যায় না।

এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবক দারুককে বলেন, "হে দারুক! কৃষ্ণের বিরহে তুমি যে কাষ্ঠবৎ হয়ে যাও, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যখনই কোন ভক্ত কৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন তাঁর নেত্র অশ্রুধারায় সিক্ত হয়, এবং তাঁর বিরহে তোমার মতো ভক্তও কাঠের পুতুলের মতো স্তম্ভিত হয়ে যায়। তাতে খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।"

উদ্ধবের প্রেমের লক্ষণ সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়েছে। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন তাঁর নেত্র থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে। একটি নদীর মতো সেই অশ্রুধারা শ্রীকৃষ্ণরূপ সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় তাঁকে অভিনন্দন করবার জন্য, ঠিক যেভাবে পত্নী তার পতিকে অভিনন্দন জানায়। তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হওয়ার ফলে তাঁকে তখন একটি কদম্ব ফুলের মতো দেখায়। যখন তিনি ভগবানের চরণারবিন্দে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে শোভা পান।

স্নেহের যে অবস্থায় দুঃখকেও সুখ বলে প্রতীত হয়, তাকে বলা হয় রাগ। এই রাগের স্তরে শান্তভাবে সব রকম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হওয়া যায়। মৃত্যুভয় উপস্থিত হলেও এই স্তরের ভক্ত ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা ত্যাগ করেন না। এই ধরনের প্রেমের একটি গৌরবময় উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন মহারাজ পরীক্ষিৎ। তাঁর মৃত্যু আসন্ন ছিল এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের আধিপত্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন, এবং যদিও তাঁর জীবনের শেষ সাত দিন একবিন্দু জল পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, কিন্তু তবুও শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখারবিন্দ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ শ্রবণ করছিলেন, তার ফলে তিনি কোন রকম

ক্লেশ অনুভব করেননি। পক্ষান্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সঙ্গ প্রভাবে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দিব্য আনন্দ অনুভব করছিলেন।

এক ভক্ত তাঁর গোপন ভাব ব্যক্ত করে বলেছেন, "আমি যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার একবিন্দু লাভ করতে পারি, তা হলে আমি সম্পূর্ণভাবে চিন্তামুক্ত হতে পারব, তা সে আমি আগুনের মধ্যেই থাকি অথবা সাগরে থাকি। কিন্তু আমি যদি তাঁর অহৈতুকী কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে দ্বারকার রাজাও হই, তা হলেও সেই রাজসিংহাসন আমার কাছে কণ্টকসদৃশ বলে মনে হবে।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ ও উদ্ধবের মতো ভক্তরা স্নেহজনিত অনুরাগের দ্বারা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট এবং সেই স্নেহে সখ্যভাব প্রকাশিত হয়। উদ্ধব যখন সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি কোন কথা বলতে পারেননি। কেবল তাঁর নেত্রাঞ্চল কুঞ্চিত করে তিনি অন্তঃকরণ দ্বারা ভগবানকে আলিঙ্গন করেছিলেন। এই ধরনের দিব্য ভাবকে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—অযোগ ও যোগ। ভক্ত যদি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ না করেন, তাকে বলা হয় অযোগ। প্রেমের এই স্তরে চিত্ত সর্বদাই ভগবানের চরণকমলে নিবদ্ধ থাকে। এই ধরনের ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলীর অনুসন্ধান করেন। তাঁর কাছে সব চাইতে মহত্ত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া।

*নৃসিংহ পুরাণে* মহারাজ ইক্ষ্বাকু সম্বন্ধে একটি বর্ণনায় এই প্রেমভাবের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে মহারাজ ইক্ষ্বাকু কালো মেঘ, কালো হরিণ, হরিণের কালো চোখ এবং ভগবানের নয়ন-যুগলের মতো সুন্দর পদ্মফুলের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন।" *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৮/১০) অক্রূর চিন্তা করছেন, "এখন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই ধরিত্রীর ভার হরণ করবার জন্য বিদ্যমান রয়েছেন, এবং তাঁর সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ নিয়ে তিনি সকলের সামনে প্রকাশিত হয়েছেন। আমরা যখন তাঁকে আমাদের সামনে দর্শন করি, সেটি কি আমাদের চোখের পরম সিদ্ধি নয়?" অর্থাৎ অক্রূর বুঝতে পেরেছিলেন যে, চোখের পরম সার্থকতা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে সমর্থ হওয়া। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, তখন যাঁরাই তাঁকে দর্শন করেছিলেন তাঁদের দৃষ্টি সার্থক হয়েছিল।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রেম জনিত উৎকণ্ঠার এই দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায়—"হে কৃষ্ণ! হে দীনবন্ধু! হে কৃপাময় ভগবান! তোমাকে দর্শন না করে আমার দিন কিভাবে কাটবে? এ আমার কি দুর্ভাগ্য!" শ্রীকৃষ্ণকে লেখা উদ্ধবের একটি চিঠিতেও এই ধরনেরই আবেগ ব্যক্ত হয়েছে, "হে ব্রজরাজ!

আপনি আমার চোখের দর্শনরূপ অমৃত এবং আপনার চরণকমল ও জ্যোতির্ময় দেহ দর্শন না করে আমার চিত্ত নিরন্তর বিষাদগ্রস্ত। কোন অবস্থাতেই আমি শান্তি পাচ্ছি না। আর তা ছাড়া আপনার বিরহের এক একটি ক্ষণকে আমার বহু দীর্ঘ যুগ বলে মনে হচ্ছে।"

*কৃষ্ণকর্ণামৃতে* আরও বলা হয়েছে, "হে প্রভু! আপনি কৃপার সিন্ধু। ঐকান্তিক দীনতার সঙ্গে কৃতাঞ্জলিপুটে আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি। হে প্রভু! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আপনার কৃপাকটাক্ষরূপী শীতল জল আমার উপর বর্ষিত হয়। সেটিই হবে আমার পরম তৃপ্তি।"

এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "শশিশেখর শিবও যখন আপনাকে দর্শন করতে পারেন না, সুতরাং একটি কীটের থেকেও অধম আমার আর কি কথা? আমি কেবল অপকর্মই করে এসেছি। আমি জানি যে, আপনার কাছে প্রার্থনা করার যোগ্য আমি নই, কিন্তু যেহেতু আপনি হচ্ছেন দীনবন্ধু, তাই বিনীতভাবে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা জানাই যেন আপনার কৃপাকটাক্ষের দ্বারা আপনি আমাকে পবিত্র করেন। আপনার কৃপাকটাক্ষের দ্বারা যদি আমি স্নাত হই, তা হলে হয়ত আমি রক্ষা পাব। হে ভগবান! তাই আপনি আমাকে কৃপা করুন।"

## অষ্টাত্রিংশতি অধ্যায়

# উদাসীনতা ও বিরহ

মহাভাগবত উদ্ধব এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে একটি পত্রে লেখেন, "প্রিয় কৃষ্ণ, আমি সব রকম দর্শন শাস্ত্র এবং বৈদিক শ্রুতিসমূহ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছি, যা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এই অধ্যয়নের ফলে আমার কিছু খ্যাতি লাভ হয়েছে। কিন্তু এই খ্যাতি সত্ত্বেও আমার এই জ্ঞান বৃথা, কেন না যদিও আমি বৈদিক জ্ঞানরূপী জ্যোতি আস্বাদন করছি, তবু আমি আপনার চরণ-কমলের নখ-নিঃসৃত জ্যোতির রসাস্বাদন করতে পারছি না। অতএব আমার এই অভিমান ও বৈদিক জ্ঞান যত শীঘ্র সমাপ্ত হয়ে যায় ততই ভাল!" এটি উদাসীনতার একটি উদাহরণ।

অন্য এক ভক্ত তাঁর অন্তরের আকুলতা ব্যক্ত করে বলেন, "হে প্রভু! আমার চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, তাই তাকে আমি আপনার চরণকমলে একাগ্র করতে পারি না। আমার এই অক্ষমতার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করি এবং আমার এই অক্ষমতা জনিত শোকের ফলে আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না।"

*কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর চিত্তের চাঞ্চল্য বিশ্লেষণ করে বলেন, "হে প্রভু! তোমার শৈশবকালীন চপলতা ত্রিভুবনে সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়। তুমি নিজেও তা জান, তাই আমার মনের চঞ্চলতাও তুমি খুব সহজেই বুঝতে পার। তা কেবল তুমিই জান এবং আমি জানি। তাই কিভাবে যে তোমার চরণারবিন্দে আমি আমার মনকে নিবদ্ধ করতে পারব, তা জানবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।"

অপর এক ভক্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলেন, "হে প্রভু! আমার দীন অবস্থার কথা বিবেচনা না করে আপনার কাছে আমি স্বীকার করছি যে, আমার নেত্রযুগল ঠিক দুটি কৃষ্ণ ভ্রমরের মতো আপনার চরণরূপী কমলের দিকে উড়ে যেতে চায়।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে (৭/৪/৩৭) মহর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে মহাভাগবত প্রহ্লাদের বর্ণনা করেন। প্রহ্লাদের স্বাভাবিক ভক্তির প্রমাণ হচ্ছে, শৈশবেও তিনি তাঁর সাথীদের সঙ্গে খেলা না করে, নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করার প্রতি আসক্ত ছিলেন। ছোটাছুটি করে খেলাধূলা না করে তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে সর্বদা সমাহিত থাকতেন। তাই বাহ্য জগৎ তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না।

এক ব্রাহ্মণ ভক্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"এই ব্রাহ্মণটি সব রকম কার্যকলাপে অত্যন্ত সুদক্ষ, কিন্তু আমি জানি না কেন সে অপলক দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার দেহ একটি পুতুলের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেছে। আমি অনুমান করতে পারি যে, সেই সুদক্ষ মুরলীবাদক শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করে সে মোহিত হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে, সে এই কালো মেঘ দর্শন করে তাঁর শ্যামসুন্দর রূপের কথা স্মরণ করছে।" এটি ভগবৎ-প্রেমজনিত জড়তার একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে (৭/৪/৪০) প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে, তাঁর শৈশবেও যখন তিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন, তখন তিনি নির্লজ্জ পাগলের মতো নৃত্য করতেন। ভগবানের লীলা স্মরণে পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে কখনও কখনও তিনি সেই লীলার অনুকরণও করতেন। এটি ভক্তের উন্মাদনার একটি দৃষ্টান্ত। তেমনই বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবর্ষি নারদের এমনই ভাবোন্মত্ত প্রেম ছিল যে, তিনি কখনও কখনও নগ্ন হয়ে নৃত্য করতেন। কখনও তাঁর সমস্ত শরীর স্তম্ভিত হয়ে যেত। কখনও কখনও তিনি অট্টহাস্য করতেন এবং কখনও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতেন, কখনও একদম চুপ হয়ে যেতেন এবং কখনও কোন রোগ বিনাই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যেতেন। এটি ভক্তিভাব জনিত উন্মাদনার একটি দৃষ্টান্ত।

*হরিভক্তি-সুধোদয়ে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ভগবানের সমীপে যাওয়ার অযোগ্য বলে নিজেকে মনে করছিলেন, তখন তিনি দুঃখের সাগরে নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং অশ্রুবর্ষণ করতে করতে ভূপতিত হয়েছিলেন।

এক মহান ভক্তের শিষ্যরা এক সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন—"হে ভাইসব! আমাদের গুরু মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল দর্শন করে শোকাগ্নিতে নিমগ্ন হয়েছেন এবং সেই অগ্নির প্রভাবে তাঁর চৈতন্যরূপী জল প্রায় শুষ্ক হয়ে গেছে। এস, আমরা এখন তাঁর কর্ণকুহরে ভগবানের দিব্য নামরূপী অমৃত বর্ষণ করি, যাতে তাঁর হংসরূপী প্রাণ পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শোণিতপুর নগরে বলিপুত্র বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং তার হস্তসমূহ কেটে ফেলতে গিয়েছিলেন, তখন কৃষ্ণবিরহে উদ্ধব সেই যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে করতে সম্পূর্ণভাবে স্তম্ভিত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন।

কোন ভক্ত যখন পূর্ণরূপে ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্ত হন, তখন ভগবানের বিরহে তাঁর মধ্যে এই ভাবগুলি প্রকাশিত হতে পারে—অঙ্গে সন্তাপ, অঙ্গ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, নিদ্রাশূন্যতা, অনাসক্তি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মত্ততা, মূর্ছা ও মৃত্যু।

অঙ্গে সন্তাপের উদাহরণ হচ্ছে, উদ্ধব এক সময় দেবর্ষি নারদকে বলেন, "হে দেবর্ষে! সূর্যবন্ধু পদ্ম আমাদের ব্যথা দিতে পারে, সাগরের গর্ভস্থিত অগ্নি আমাদের দগ্ধ করতে পারে, কিন্তু পরম শীতল চন্দ্রের সুহৃৎ এই নীলকমল কেন আমাদের এই গভীর মনোবেদনা প্রদান করছে? সব চাইতে অনুতাপের বিষয় হচ্ছে যে, তারা সকলেই আমাদের কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং তার ফলে আমরা অত্যন্ত গভীর বেদনা অনুভব করি!" এটি শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত সন্তাপের একটি দৃষ্টান্ত।

কয়েকজন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য দ্বারকায় গিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বারীরা দ্বারপ্রান্তে তাঁদের গতিরোধ করেন। তখন তাঁরা বলেন, "হে কৃষ্ণ! হে পাণ্ডবসখা! হংস যেমন পদ্মফুলের মাঝে বিচরণ করতে ভালবাসে এবং জল থেকে তাকে তুলে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয়, তেমনই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা হচ্ছে আপনার সঙ্গে থাকা। আপনার বিরহে আমাদের বাহু পর্যন্তও কৃশ ও বিবর্ণ হয়ে গেছে, যেন মৃণালবুদ্ধিতে হংসরা তাতে পতিত হচ্ছে।"

যদিও মহারাজ বহুলাশ্ব তাঁর প্রাসাদে অত্যন্ত সুখদায়ক পরিবেশে বিরাজ করছিলেন, তবুও কৃষ্ণবিরহে তাঁর মনে হচ্ছিল যেন রাত্রিগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং দুঃখদায়ক হয়ে উঠেছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এক সময় বলেন, "অর্জুনের রথের সারথি কৃষ্ণই ত্রিভুবনে আমার একমাত্র আত্মীয়। তাঁর চরণ-কমলের বিচ্ছেদে আমার মন দিন-রাত উন্মাদের মতো হয়ে আছে। আমি জানি না আমি নিজেকে কিভাবে স্থির করব এবং কোথায় গেলে আমার মনকে স্থির করতে পারব।" এটি আলম্বন শূন্যতা এবং অনাসক্তির একটি উদাহরণ।

শ্রীকৃষ্ণের কয়েকজন গোপসখা বলেন, "হে কৃষ্ণ! হে মুরারি! তুমি তোমার সেবক রক্তকের কথা একবার ভেবে দেখ। কেবল একটি ময়ূরপুচ্ছ দর্শন করে সে তার আঁখি মুদ্রিত করেছে এবং গোচারণে চারণরত গাভীদের দিকে কোন মনোযোগ দিচ্ছে না। পক্ষান্তরে, সে গাভীগুলিকে অনেক দূরে গোচারণ-ভূমিতে ছেড়ে দিয়েছে এবং তার যষ্টি দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে না।" এটি শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত জড়তার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে যান, তখন কৃষ্ণবিরহের অগ্নিতে উদ্ধব এতই পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর দগ্ধ দেহ থেকে স্বেদধারা এবং তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়তে থাকে এবং এইভাবে তিনি সম্পূর্ণভাবে স্তম্ভিত হয়ে যান।

শ্রীকৃষ্ণ যখন স্যমন্তক মণি খুঁজতে দ্বারকাপুরী ছেড়ে চলে যান, তখন তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। তখন উদ্ধব এতই কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর ব্যাধির লক্ষণ প্রকট হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপ্রেমের আতিশয্যে তিনি এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, দ্বারকায় সকলে মনে করত যে, উদ্ধব পাগল হয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশত সেই দিন উদ্ধবের পাগলামি নিশ্চিতরূপে সার্থক হয়েছিল। রৈবতক পর্বতে নবীন ঘনশ্যাম মেঘ দর্শন করে বিচলিত বুদ্ধি, অধীর উদ্ধব মেঘেদের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেন এবং হর্ষোৎফুল্ল হয়ে তাদের প্রণতি নিবেদন করতে থাকেন।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে যদুপতে! তোমার কথা চিন্তা করে বৃন্দাবনে তোমার সেবকরা রাত্রে ঘুমাতে পারে না, তাই তাঁরা এখন যমুনার তটে চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছে যেন তাঁদের দেহে প্রাণ নেই, কেননা তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।" এটি কৃষ্ণবিরহ জনিত অচেতনতার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণকে একবার বলা হয়, "তুমিই হচ্ছ ব্রজবাসীদের জীবন। তাই, বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছ বলে তোমার সমস্ত সেবকেরা গভীর বেদনা অনুভব করছে। প্রখর সূর্যকিরণে সরোবরের পদ্ম যেভাবে শুষ্ক হয়, তোমার বিরহজনিত তাপে তারাও সেভাবে দগ্ধ হচ্ছে।" এই দৃষ্টান্ত সরোবরস্থিত কমলের সঙ্গে ব্রজবাসীদের তুলনা করা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত তাপে কমল সহ সরোবর শুষ্ক হয়ে গেছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সরোবরের হংসগুলি, যাদের বৃন্দাবনের অধিবাসীদের প্রাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তারা আর সেখানে থাকতে চায় না। অর্থাৎ প্রচণ্ড তাপে হংসগুলি সরোবর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ভক্তদের অবস্থা স্পষ্ট করে বর্ণনা করার জন্য এই উপমাটি দেওয়া হয়েছে।

## উনচত্বারিংশতি অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পন্থা

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন তাঁর ভক্তের মিলন হয়, সেই মিলনকে বলা হয় যোগ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভক্তের এই যোগ তিন প্রকার—সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি।

ভক্ত যখন গভীর আগ্রহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন, সেই মিলনকে সিদ্ধি বলা হয়। *শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থে শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বর্ণনা করেছেন—শিখী পুচ্ছধারী, বক্ষঃস্থলে মরকত মণি শোভিত, মৃদুমন্দ হাস্যোজ্জ্বল চঞ্চল চক্ষু এবং সুকোমল অঙ্গবিশিষ্ট কৃষ্ণ কিভাবে তাঁর ভক্তের সঙ্গে মিলিত হন।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৮/৩৪) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন, "হে রাজন! অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে বৃন্দাবনে দর্শন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর রথ থেকে নেমে এসে ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত হয়ে, ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করেন।" এটি সিদ্ধিযোগের একটি দৃষ্টান্ত।

দীর্ঘ বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন তাঁর ভক্তের মিলন হয়, সেই মিলনকে বলা হয় তুষ্টি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১১/১০) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর রাজধানী দ্বারকায় ফিরে আসেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা বলেন, "হে নাথ! আপনি যখন দীর্ঘকাল বিদেশে থাকেন, তখন আমরা আপনার হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন থেকে বঞ্চিত হই! আপনার মুখমণ্ডল দর্শন করে, আপনার নিত্য সেবক আমরা গভীরভাবে তৃপ্ত হই। আমাদের সমস্ত উৎকণ্ঠা তখনই বিদূরিত হয়ে যায়। দ্বারকায় আপনার অনুপস্থিতির ফলে আমরা যদি আপনাকে দর্শন না করতে পারি, তা হলে আমাদের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হবে।" এটি দীর্ঘ বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে ভক্তের সন্তুষ্টির একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণের সেবক দারুক দ্বারকার দ্বারপ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে, আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

ভক্ত যখন অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেন, তাঁর সেই অবস্থাকে ভক্তিযোগে স্থিতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *হংসদূত* নামক গ্রন্থে ভক্তিযোগের এই স্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অক্রূরকে

ব্রজগোপিকারা মূর্তিমান ভীতি বলে মনে করতেন। তিনি কুরুবংশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধবও এই স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ভূমিতে হাঁটু গেড়ে বসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের সেবা করতেন।

কোন ভক্ত যখন ভগবৎ-সেবা পরায়ণ হন, তখন তিনি যোগের সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। যোগ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যুক্ত হওয়া'। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগের প্রারম্ভ হয় তখনই, যখন ভক্ত তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হন। দাস্যরসে ভক্ত সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁর বিশিষ্ট সেবায় প্রবৃত্ত হন। কখনও তিনি বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করেন। কিছু মানুষ ভক্তির এই স্তরকে যথার্থ ভক্তি বলে স্বীকার করতে চান না, এবং কিছু কিছু *পুরাণেও* ভগবদ্ভক্তির এই দাস্যভাবকে যথার্থ ভক্তিযোগ বলে স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই দাস্যভাব হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার প্রাথমিক স্তর।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৩/৩২) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভক্ত যখন ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে ক্রন্দন করেন, কখনও বা হাসেন, কখনও আনন্দোচ্ছল হন, কখনও অদ্ভুতভাবে বার্তালাপ করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও গান করেন, কখনও বাস্তবিকভাবে ভগবানের সেবা করেন এবং কখনও আবার তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে চুপচাপ বসে থাকেন।

তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে (৭/৭/৩৪) প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সাথীদের বলেন, "হে বন্ধুগণ! শুদ্ধ ভক্তরা যখন নিত্য লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের কাহিনী শ্রবণ করেন, অথবা তাঁর দিব্য গুণাবলীর কথা শ্রবণ করেন, তখন তাঁরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠেন। তাঁদের শরীরে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। তাঁরা তখন অশ্রুবর্ষণ করেন, গদ্‌গদ স্বরে কথা বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে নর্তন-কীর্তন করেন। এই সমস্ত ভাব সব সময়ই বর্তমান, কিন্তু কখনও কখনও তা সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যায় এবং তার ফলে সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শরণাগতির ছয়টি অঙ্গ রয়েছে—ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে যা অনুকূল তার সঙ্কল্প করা, ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে যা প্রতিকূল তা বর্জন করা, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বদাই রক্ষা করবেন সেই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা, কৃষ্ণভক্তরূপে নিজের পরিচিতি উপলব্ধি করা, শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য ব্যতীত নিজেকে সর্বদা সম্পূর্ণ অসহায় বলে মনে করা এবং নিজে নিজে কিছু করার সম্পূর্ণ সামর্থ্য থাকলেও

নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ বলে মনে করা। কেউ যখন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, সর্ব অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করছেন, সেই অনুভূতিকে বলা হয় শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি। শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি অনুশীলন হয় পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর অন্যান্য সুরক্ষিত ভক্তদের সম্বন্ধে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বিরাজ করছিলেন, তখন যদুবংশের কয়েকজন প্রবীণ সদস্য মাঝে মাঝে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর সামনে উপস্থাপিত করতেন। সেই সময় মনোযোগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ তা বিবেচনা করতেন এবং তখন যদি হাস্যকর কোন বিষয়ের উল্লেখ করা হত, শ্রীকৃষ্ণ তখনই হাসতেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ যখন সুধর্মা নামক সভায় তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতেন, তখন তিনি প্রবীণ সদস্যদের কাছ থেকে সদুপদেশ গ্রহণ করতেন। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি পরম গুরুরূপে, পরম পরিচালকরূপে, পরম বুদ্ধিমান, পরম শক্তিমান, পরম রক্ষাকর্তা ও পরম পালনকর্তারূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

## চত্বারিংশতি অধ্যায়

# পুত্র ও অন্যান্য অধস্তনদের শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রীতি

যে সমস্ত ব্যক্তি নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলে মনে করেন এবং নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের পুত্র বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে যথার্থ শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রীতির প্রকাশ হয়। এই রকম কৃপাপাত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছেন সারণ, গদ, ও সুভদ্রা। তাঁরা সকলেই ছিলেন যদুবংশীয় এবং তাঁরা সর্বদাই নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত বলে মনে করতেন। তেমনই প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, শাম্ব আদি শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররাও সেই রকম মনোভাবাপন্ন ছিলেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের বহু পুত্র ছিল। তাঁর ১৬, ১০৮ জন মহিষীর প্রত্যেকের দশটি করে পুত্র সন্তান ছিল, এবং প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, শাম্ব প্রমুখ প্রতিটি পুত্রই নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত বলে মনে করতেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররা যখন তাঁর সঙ্গে একসাথে খাবার খেতেন, তখন তাঁরা মাঝে মাঝে মুখ হাঁ করতেন যাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের খাইয়ে দিতে পারেন। মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কোন ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতেন এবং তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদ করতেন। তখন পূর্বজন্মে সে যে কত পুণ্য সঞ্চয় করেছে, সেই কথা স্মরণ করে অন্য সমস্ত পুত্ররা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের বহু পুত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নকে প্রধান বলে গণ্য করা হয়। প্রদ্যুম্নের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তরা প্রদ্যুম্নের সৌভাগ্যের মহিমা কীর্তন করে বলেন—আদর্শ পিতার আদর্শ পুত্র।

*হরিবংশ* গ্রন্থে প্রভাবতীকে হরণ করার সময় প্রদ্যুম্নের কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সময় প্রভাবতীকে প্রদ্যুম্ন বলেন, "হে প্রভাবতী! আমাদের পরিবারের প্রধান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি হচ্ছেন স্বয়ং গরুড়বাহন বিষ্ণু এবং তিনিই আমাদের পরম প্রভু। তিনি যে আমাদের সব সময় রক্ষা করছেন সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকার ফলে, কখনও কখনও আমরা এত গর্বিত হয়ে পড়ি যে, আমরা ত্রিপুরারি শিবের সঙ্গে লড়াই করতেও ভয় পাই না।"

দুই রকমের ভক্ত সম্ভ্রম ও মর্যাদা সহকারে ভগবানের সেবা করেন। তাঁরা হচ্ছেন—ভগবানের কৃপাপাত্র এবং ভগবানের পুত্র। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সেবকেরা পরমারাধ্য ও পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর আরাধনা করেন। তাঁরা

শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্যের দ্বারা মুগ্ধ ছিলেন। যাঁরা সর্বদাই নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলে মনে করতেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব অবস্থাতেই রক্ষা করবেন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কাউকেই গ্রাহ্য করতেন না। প্রায়ই দেখা গেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররা বিভিন্ন জায়গায় বেআইনীভাবে কাজ করেছেন, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেছেন।

এমন কি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামও কখনও কখনও নিজের অজান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। একবার কৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু বলরাম তখন তাঁর গদা অবনত করে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শ করেন। অর্থাৎ, বলরামের হাতের গদা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করে। পূর্ববর্ণিত এই কৃপাশ্রয়তা কখনও কখনও অনুভাবরূপে অভিব্যক্ত হয়।

স্বর্গের দেবতারা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররা তাঁদের অনুগামী হয়েছিলেন এবং ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলু থেকে তাঁদের মস্তকে জল সিঞ্চন করেছিলেন। দেবতারা যখন শ্রীকৃষ্ণের সামনে আসেন, তখন তাঁর পুত্ররা স্বর্ণ-সিংহাসনে বসার পরিবর্তে ভূমিতে বিছানো মৃগচর্মের উপর বসেন।

কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের ব্যবহার তাঁর পরিচারকদের মতো বলে প্রতীত হয়। যেমন, তাঁর পুত্ররা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করতেন। তাঁরা ছিলেন মৌন, বিনীত এবং জীবন বিপন্ন করেও তাঁরা কৃষ্ণের আদেশ পালন করতে উন্মুখ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সামনে এলেই তাঁরা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করতেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও সংযত এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তাঁরা হাসতেন না অথবা কাশতেন না, এবং তাঁরা কখনই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন না। অর্থাৎ, যে সমস্ত ভক্ত মর্যাদা সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত নয়। বদ্ধ অবস্থায় ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসারে সাধন ভক্তির অনুশীলন করা। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির পরিপক্ব অবস্থায় নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হন। কৃত্রিমভাবে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। কখনও কখনও দেখা যায় যে, অতি জঘন্য প্রকৃতির কোন কামার্ত পুরুষ ভগবদ্ভক্তির অভিনয় করে মাধুর্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এই ধরনের গর্হিত কার্যকলাপের ফলে তারা প্রাকৃত সহজিয়ায় পরিণত হয় অর্থাৎ, তারা অত্যন্ত লঘুভাবে ভগবদ্ভক্তিকে গ্রহণ করে। যদিও এই সমস্ত ব্যক্তি মাধুর্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু তাদের ব্যবহারিক জীবনে তাদের আচরণ অত্যন্ত

কদর্য। যে মানুষ যথার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি কখনই জাগতিক স্তরে আচরণ করেন না এবং তাঁর চরিত্রে কোন কলুষ দেখা যায় না।

কামদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে আসেন, কয়েকজন ভক্ত তাঁকে বলেন, "হে কামদেব! তুমি যে অসীম সৌভাগ্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছ, তার ফলে তোমার দেহের স্বেদবিন্দুগুলি জমে বরফ হয়ে গেছে এবং তাই তাদের দেখতে ঠিক কণ্টকী ফলের মতো লাগছে।" এইগুলি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাজনিত ভাবের দৃষ্টান্ত। যদুবংশীয় রাজকুমারেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ শুনতেন, তখন দিব্য আনন্দের অনুভূতিতে তাঁদের শরীর রোমাঞ্চিত হত। তখন মনে হত যে, রাজকুমারদের দেহের রোমগুলি যেন আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করছে।

হর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও বিষাদও দেখা যেত। এক সময় শাম্বকে সম্বোধন করে প্রদ্যুম্ন বলেন, "হে শাম্ব! তুমি কত না মহান! একদিন তুমি যখন খেলা করছিলে, তখন তোমার সমস্ত দেহ ধূলাবৃত হয়েছিল, কিন্তু তবুও আমাদের পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমি এতই দুর্ভাগা যে, আমাদের পিতার কাছ থেকে সেই রকম ভালবাসা আমি কখনও পেলাম না!" এই উক্তিটি ভগবৎ-প্রেমে বিষাদের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণকে পূজ্য বলে মনে করাকে মর্যাদাভাব বলা হয় এবং সেই সঙ্গে ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রক্ষাকর্তা বলে মনে করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর দিব্যপ্রেম বর্ধিত হয়, এবং তার সেই মিশ্র ভাবকে বলা হয় শ্রদ্ধামিশ্রিত ভক্তি। যখন এই শ্রদ্ধামিশ্রিত ভক্তি বর্ধিত হয়, তখন তাকে বলা হয় শ্রদ্ধামিশ্রিত ভগবৎ-প্রেম। এই স্তরে আকর্ষণ ও স্নেহ হচ্ছে দুটি প্রধান লক্ষণ। শ্রদ্ধামিশ্রিত ভক্তিভাবাপন্ন হওয়ার ফলে প্রদ্যুম্ন কখনও তাঁর পিতার সম্মুখে জোরে কথা বলতেন না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রায় তাঁর মুখই খুলতেন না এবং তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়ন প্রদর্শন করেননি। তিনি সর্বদাই তাঁর পিতার চরণারবিন্দের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচলিত প্রেমের আরও একটি অপূর্ব নিদর্শন আমরা দেখতে পাই যখন অর্জুন তাঁকে তাঁর পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা জানান। অভিমন্যু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রার পুত্র। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত মহারথীরা—কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্য কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সম্মিলিতভাবে অন্যায় রণে অভিমন্যুকে বধ করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি সত্ত্বেও অভিমন্যু বধ হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুভদ্রার ভক্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। সেই কথা

ঘোষণা করে অর্জুন তাঁকে বলেছিলেন, "যদিও তুমি সামনে থাকা সত্ত্বেও এই রকম অন্যায়ভাবে অভিমন্যু হত হল, সেই জন্য তোমার প্রতি সুভদ্রার ভালবাসা একটুও বিচলিত হয়নি, এমন কি তার বর্ণ একটুও মলিন হয়নি।"

তাঁর ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহের একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি যখন প্রদ্যুম্নকে তাঁর সামনে এত লজ্জিত না হতে বলেন। তিনি প্রদ্যুম্নকে বলেন, "হে পুত্র! তুমি তোমার এই হীনমন্যতা পরিত্যাগ কর, এবং এইভাবে মাথা নীচু করে রেখো না। স্পষ্ট স্বরে আমার সঙ্গে কথা বল এবং অশ্রুবর্ষণ করো না। তুমি সরাসরিভাবে আমার দিকে তাকাতে পার এবং নিঃসঙ্কোচে তুমি আমার শরীরে হাত রাখতে পার। তোমার পিতার সামনে এত সম্মান প্রদর্শন করার কোন কারণ নেই।"

প্রদ্যুম্নের কার্যকলাপের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সব সময় প্রকাশ পেত। তাঁর পিতা যখন তাঁকে কোন আদেশ দিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করতেন, এবং বিষবৎ হলেও সেই কার্যভার তিনি অমৃতের মতো গ্রহণ করতেন। তেমনই, তাঁর পিতার অনুমোদন না থাকলে অমৃতোপম বস্তুকেও তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রদ্যুম্নের উৎকণ্ঠাপূর্ণ আসক্তির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, প্রদ্যুম্ন যখন তাঁর পত্নী রতিকে বলেন, "আমাদের শত্রু শম্বরাসুর ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে। এখন আমি আমার পিতৃদেব, যিনি আমার পরম গুরুদেব এবং যিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খধারী, তাঁকে দেখবার জন্য অত্যন্ত আকুল হয়ে উঠেছি।" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা থেকে দূরে ছিলেন, তখন তাঁর বিরহে প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমার পিতা যেহেতু দ্বারকা ছেড়ে চলে গেছেন, তাই এখন আর আমার যুদ্ধবিদ্যা অনুশীলন করতে ভাল লাগে না, এমন কি কোন খেলাধূলা করতেও ভাল লাগে না। সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেই বা কি লাভ? আমার পিতার অনুপস্থিতিতে আমার দ্বারকায় থাকতেও ইচ্ছা করে না।"

প্রদ্যুম্ন যখন শম্বরাসুরকে বধ করে গৃহে ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ আনন্দে এত অধীর হয়ে পড়েন যে, তিনি নিজেই তাঁর সেই আনন্দের কথা বুঝতে পারেননি। এটি বিরহজনিত সাফল্যের একটি দৃষ্টান্ত। এই রকমই আর একটি সন্তুষ্টির অনুভূতি দেখা যায়, যখন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন থেকে দ্বারকায় তাঁর গৃহে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সমস্ত পুত্ররা আনন্দে এত অধীর হয়ে ওঠেন যে, তাঁরা বারবার অনেক রকম ভুল করতে থাকেন। এই ভুলগুলি পূর্ণ পরিতৃপ্তির লক্ষণ।

প্রতিদিন অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ দর্শন করতেন। সম্ভ্রম-প্রীতি সম্বন্ধে অন্যান্য ভক্তদের লক্ষণগুলি যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সেইভাবে প্রদ্যুম্নের সম্ভ্রম-প্রীতির লক্ষণগুলি সম্পর্কেও বর্ণনা করা যেতে পারে।

# একচত্বারিংশতি অধ্যায়

# সখ্যভক্তি

কোন ভক্ত যখন স্থায়িভাবে ভগবদ্ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হন, এবং নানা প্রকার ভাবের লক্ষণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সখ্যভাবে সম্পর্কিত হন, তাঁর সেই ভাবকে বলা হয় সখ্যরস।

ভগবানের প্রতি এই সখ্যরসের উদ্দীপন হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। কেউ যখন জড় জগতের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন ভগবান নিজেই তাঁর সেই প্রেম উদ্দীপ্ত করেন। বৃন্দাবনে ভগবানের নিত্যপার্ষদেরা সেই কথা এইভাবে বর্ণনা করেছেন, "ইন্দ্রনীল মণির মতো যাঁর অঙ্গ-কান্তি, কুন্দফুলের মতো যাঁর হাস্য, শরতের সোনালি রঙের পাতার মতো যাঁর রেশমি বসন, মালা ও ফুলের দ্বারা শোভিত যাঁর বক্ষ এবং যিনি নিরন্তর মুরলী বাদন করেন—সেই অঘারি শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বৃন্দাবনে বিচরণ করতে করতে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করছেন।"

বৃন্দাবনের বাইরেও সখ্যরসের এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডুপুত্ররা যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হন এবং অমৃতময় আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন হন। এর থেকে বোঝা যায় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—পাণ্ডুর এই পুত্ররা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখ্য রসে যুক্ত ছিলেন।

কখনও কখনও ভগবানের বিভিন্ন নাম, রূপ, সামগ্রী ও দিব্য গুণাবলী সখ্যপ্রেম উদ্দীপ্ত করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বসন, তাঁর সুগঠিত দেহ, তাঁর শরীরে বিদ্যমান সর্ব মঙ্গলময় চিহ্নসমূহ, বিভিন্ন ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা, *ভগবদ্গীতায়* তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সর্ববিষয়ে ও সমস্ত প্রচেষ্টায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর করুণা, তাঁর বীরত্ব, প্রেমিকরূপে তাঁর ব্যবহার, তাঁর বুদ্ধিমত্তা, তাঁর ক্ষমা, সব রকম মানুষকে আকর্ষণ করার শক্তি, তাঁর ঐশ্বর্য ও তাঁর সুখ—এই সবই সখ্যপ্রীতি উদ্দীপ্ত করে।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদদের দর্শন করে সখ্যপ্রেমের উদ্দীপন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কেন না তাঁদের রূপ, তাঁদের গুণ ও তাঁদের বসন সবই শ্রীকৃষ্ণের

মতো। এই সমস্ত পার্ষদেরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেই সুখী, এবং তাঁদের সাধারণত বলা হয় বয়স্য অথবা সমবয়স্ক সখ্য। এই সমস্ত বয়স্যরা সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সব সময় তাঁদের রক্ষা করবেন। ভগবদ্ভক্তরা কখনও কখনও প্রার্থনা করে বলেন, "আমরা শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যদের চরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সখা এবং তিনি তাঁদের রক্ষা করবেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভক্তি সম্পূর্ণভাবে অবিচলিত। তাঁরা নির্ভীক এবং শ্রীকৃষ্ণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে তাঁরা দিব্য ভগবৎপ্রেমে যুক্ত হয়েছেন।" বৃন্দাবনের বাইরে, দ্বারকা ও হস্তিনাপুর আদি স্থানেও এই ধরনের নিত্য বয়স্যদের দেখা যায়। বৃন্দাবন ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্য সমস্ত লীলাস্থলীগুলিকে পুর (নগর) বলা হয়। কুরুদের রাজধানী মথুরা ও হস্তিনাপুর উভয়ই পুর। অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, সুদামাবিপ্র—এঁরা পুরে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলে গণ্য।

পাণ্ডবেরা যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ উপভোগ করতেন, তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক আঘ্রাণ করলেন।" বৈদিক প্রথা অনুসারে, ছোটরা যখন বড়দের চরণ স্পর্শ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তখন বড়রা ছোটদের মস্তক আঘ্রাণ করেন। তেমনই, ভীম ও অর্জুন মহা আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং দুটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শ করে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে পঞ্চপাণ্ডবেরা সকলেই সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনই সব চাইতে অন্তরঙ্গভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি অতি সুন্দর গাণ্ডীব ধনুক তাঁর হস্তে ধারণ করেন। তাঁর জঙ্ঘাদ্বয় হাতির শুঁড়ের মতো এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় সর্বদাই আরক্তিম। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যখন একসঙ্গে রথে বিরাজমান ছিলেন, তখন তাঁদের সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য সকলের নেত্রকে আনন্দদান করেছিল। কথিত আছে যে, এক সময় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিহাস করে, গভীর প্রশান্তিতে হাস্যোজ্জ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন।

বৃন্দাবনের বয়স্যরা এক পলকের জন্যও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন হলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন।

বৃন্দাবনের বয়স্যদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে এক ভক্ত বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বয়স্যদের জয় হোক! যাঁদের বয়স, গুণাবলী, লীলা, বসন ও সৌন্দর্য ঠিক শ্রীকৃষ্ণেরই মতো। তাঁরা তালপাতার বাঁশি বাজান, এবং তাঁদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের মতো ইন্দ্রনীল মণি, প্রবাল ও স্বর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃত শিঙ্গা রয়েছে। তাঁরা

সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মতো আনন্দোজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের এই মহান সমস্ত পার্ষদেরা নিরন্তর আমাদের রক্ষা করুন।"

বৃন্দাবনের বয়স্যদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য এত অন্তরঙ্গ যে, তাঁরা কখনও কখনও নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সমান বলে মনে করেন। এই ধরনের সখ্যভাবের একটি উদাহরণ হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বাম হাতে গিরি-গোবর্ধন তুলে ধরেছিলেন, তখন তাঁর বয়স্যরা বলতে থাকেন, "হে সখে! কোন রকম বিশ্রাম ছাড়াই তুমি গত সাত দিন ও সাত রাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছ। তোমাকে এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি। তাই আমাদের মনে হয়, আর এইভাবে এই পর্বত ধারণ করে তোমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। তুমি এখন তা শ্রীদামের হাতে দিয়ে দিতে পার। তোমাকে এই অবস্থায় দেখে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হচ্ছি। তুমি যদি মনে কর যে, শ্রীদাম গিরি-গোবর্ধন ধারণ করতে সক্ষম হবে না, তা হলে অন্তত তুমি সেই পর্বতটিকে তোমার বাম হাত থেকে ডান হাতে স্থানান্তরিত কর, যাতে আমরা তোমার বাম হাতটি মালিশ করে দিতে পারি।" বয়স্যরা যে কিভাবে তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের সমান বলে মনে করতেন, এটি সেই অন্তরঙ্গ ভাবের একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১২/১১) শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন, "হে রাজন! তত্ত্বদ্রষ্টা পরমার্থবাদীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, নির্বিশেষবাদীদের কাছে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মসুখ, ভক্তদের কাছে তিনি হচ্ছেন পরমারাধ্য পরম প্রভু, আর মায়াবদ্ধ জীবের কাছে তিনি হচ্ছেন একজন সাধারণ মানবশিশু। এই সমস্ত গোপবালকেরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে খেলা করছেন। তার থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এই সমস্ত বালকেরা তাঁদের পূর্বজন্মে কত পুণ্যরাশি সঞ্চয় করেছেন, যাঁর ফলে আজ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ সখারূপে খেলা করছেন।"

বৃন্দাবনে তাঁর বয়স্যদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব আমরা একটি বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারি। তিনি এক সময় বলরামকে বলেন, "হে প্রিয় ভ্রাতঃ! অঘাসুর যখন আমার সখাদের গ্রাস করছিল, তখন আমার চোখ দিয়ে উষ্ণ অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। সেই অশ্রুধারা যখন আমার দুগাল ভাসিয়ে দিচ্ছিল, হে প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ, তখন ক্ষণিকের জন্য আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম।"

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যদের সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়—১) সুহৃৎ, ২) সখা, ৩) প্রিয়সখা ও ৪) প্রিয়নর্ম সখা। শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদেরা তাঁর থেকে বয়সে একটু বড় এবং তাঁর প্রতি তাঁদের ভাব কিছু মাত্রায় বাৎসল্য স্নেহযুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের থেকে বয়সে একটু বড় হওয়ার ফলে তাঁরা সর্বদাই সব রকম বিপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তাই তাঁরা কখনও কখনও অস্ত্রধারণ করে থাকেন, যাতে কেউ শ্রীকৃষ্ণের কোন অনিষ্ট করতে এলে তাদের দণ্ড দিতে পারেন। সুহৃদগণের মধ্যে ছিলেন সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র। এঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের থেকে বড় এবং সর্বদাই তাঁর হিত চিন্তা করেন।

একজন বয়স্ক সখা বলেছিল, "হে মণ্ডলীভদ্র! তুমি কেন এইভাবে তলোয়ার ঘোরাচ্ছ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন অরিষ্টাসুরকে বধ করতে যাচ্ছ? হে বলদেব! তুমি কেন অনর্থক এই ভারি হালটি বহন করছ? হে বিজয়! অনর্থক বিচলিত হয়ো না। হে ভদ্রবর্ধন! এইভাবে গর্জন করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা সকলে যদি একটু ভালভাবে দেখ, তা হলে দেখবে যে, সেটি বৃষরূপী অরিষ্টাসুর নয়, সেটি গোবর্ধন পর্বতের উপর একটি কালো মেঘ মাত্র।" শ্রীকৃষ্ণের হিতাকাঙ্ক্ষী এই সমস্ত বয়স্ক সখারা একটি বিশালাকৃতি কালো মেঘকে একটি বিশাল ষাঁড়ের রূপধারী অরিষ্টাসুর বলে মনে করেছিলেন। তাঁদের এই উত্তেজনার মাঝে একজন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি প্রকৃতপক্ষে গোবর্ধন পর্বতের উপরিস্থিত একটি মেঘমাত্র। তাই তিনি অন্য সকলকে বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হতে, কেন না অরিষ্টাসুরের ভয়ে ভীত হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

সুহৃৎ সখাদের মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র হচ্ছেন প্রধান। মণ্ডলীভদ্রের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তাঁর অঙ্গকান্তি পীতবর্ণ এবং তাঁর বেশ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর হাতে সব সময় একটি বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত যষ্টি শোভা পায়। তিনি তাঁর মস্তকে শিখীপুচ্ছ ধারণ করেন এবং তাঁর রূপ সর্বদাই অত্যন্ত মনোহর। নিম্নোক্ত বর্ণনাটিতে মণ্ডলীভদ্রের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—"হে সখে! গোচারণে সারাদিন গাভীদের তত্ত্বাবধান করে এবং বনে বনে ঘুরে বেড়ানোর ফলে আমাদের প্রিয় কৃষ্ণ এখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সে খুব অবসন্ন হয়ে পড়েছে। গৃহে সে যখন বিশ্রাম করছে, তখন নিঃশব্দে আমি তার মাথা টিপে দিচ্ছি। এবং সুবল, তুমি তার পা টিপে দাও।"

বলদেবের সৌন্দর্য বর্ণনা করে এক ভক্ত বলেছেন, "আমি শ্রীবলরামের চরণ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যাঁর গণ্ড স্পর্শকারী কর্ণকুণ্ডল তাঁর সৌন্দর্যকে বর্ধিত করেছে। তাঁর মুখমণ্ডল কস্তুরীর তিলকের দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং তাঁর উন্নত বক্ষ গুঞ্জামালায় শোভিত। তাঁর অঙ্গকান্তি শরতের মেঘের মতো শুভ্র, তিনি নীল বসন পরিহিত এবং তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর। তাঁর বাহুযুগল আজানুলম্বিত

এবং প্রলম্বাসুর বধ করে তিনি তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। আমি সেই বীর বলদেবের শরণ গ্রহণ করছি।"

সুবলের প্রতি এই উক্তিতে, কৃষ্ণের প্রতি বলরামের স্নেহ প্রকাশিত হয়েছে, "হে সখে! কৃষ্ণকে আজ কালীয় হ্রদে যেতে নিষেধ কর। আজ তার জন্মদিন এবং তাই মা যশোদার সঙ্গে আমি তাকে স্নান করাতে নিয়ে যেতে চাই। তাকে বল আজ যেন সে গৃহ ছেড়ে কোথাও না যায়।" এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম কিভাবে সখ্যপ্রীতির অন্তর্গত বাৎসল্য ভাবযুক্ত হয়ে কৃষ্ণের দেখাশোনা করতেন।

শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত সখারা তাঁর থেকে ছোট, যাঁরা নিরন্তর তাঁর প্রতি আসক্ত এবং যাঁরা সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় সখা। এই রকম কয়েকজন সখার নাম হচ্ছে বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম ইত্যাদি। কৃষ্ণের এই সমস্ত সখারা কেবল তাঁর সেবাই করতে চান। কখনও তাদের কেউ কেউ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে শ্রীকৃষ্ণের গৃহে গিয়ে তাঁকে দর্শন করার জন্য, তাঁর সঙ্গে গোচারণে যাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করতেন। সেই সময় মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে সাজিয়ে দিতেন, এবং তিনি যখন দ্বারপ্রান্তে কোন বালককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতেন, তিনি তখন তাঁকে ডেকে বলতেন, "বিশাল, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে এস।" এইভাবে যশোদা মায়ের অনুমতি পেয়ে বিশাল তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ করতেন। আর মা যশোদা যখন কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিতেন, তখন তিনি কৃষ্ণের পায়ে নূপুর পরিয়ে দিতে সাহায্য করতেন, এবং কৃষ্ণ তখন পরিহাস করে তাঁর বাঁশি দিয়ে আলতোভাবে তাঁকে আঘাত করতেন। মা যশোদা তখন বলতেন, "কৃষ্ণ, এ কি হচ্ছে? তুমি কেন তোমার সখাকে এইভাবে বিরক্ত করছ? কৃষ্ণ তখন হাসতেন এবং তাঁর সখাও তখন হাসতেন। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের সখাদের কতকগুলি কার্যকলাপ। কখনও কখনও সখারা এদিক ওদিকে বিচরণকারী গাভীদের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁরা কৃষ্ণকে বলতেন, "তোমার গাভীগুলি এদিক ওদিক চলে যাচ্ছিল।" আর কৃষ্ণ তখন তাঁদের ধন্যবাদ জানাতেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সখারা যখন গোচারণে যেতেন, সেই সময় কংস কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য কোনও অসুরকে পাঠাত। তাই, প্রতিদিনই প্রায় কোন না কোন অসুরের সঙ্গে লড়াই হত। অসুরদের সঙ্গে লড়াই করার পর কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তাঁর চুল অবিন্যস্ত হয়ে পড়ত এবং তাঁর সখারা নানাভাবে তাঁকে সুখ দেওয়ার প্রয়াস করতেন। কোন সখা বলতেন, "হে বিশাল! পদ্মপাতার এই পাখাটি নিয়ে তুমি কৃষ্ণকে বাতাস কর যাতে সে একটু স্বস্তিবোধ করে। বরূথপ, কৃষ্ণের মাথার যে চুলগুলি তার মুখের ওপর এসে পড়েছে,

সেগুলি আঁচড়ে ঠিক করে দাও। বৃষভ, অনর্থক বাক্যালাপ করো না! এখনই তুমি কৃষ্ণের শরীর মালিশ করে দাও। দেখ! অসুরদের সঙ্গে লড়াই করে তার হাত দুটি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।" এগুলি কৃষ্ণের প্রতি তাঁর সখাদের আচরণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত।

দেবপ্রস্থ নামক শ্রীকৃষ্ণের এক সখার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তিনি অত্যন্ত বলবান, বিচক্ষণ পণ্ডিত এবং খুব ভাল খেলোয়াড়। তিনি শ্বেতবস্ত্র ধারণ করেন এবং তাঁর চুল গুচ্ছাকারে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। অসুরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যখনই যুদ্ধ হয়, তখন এই দেবপ্রস্থ সর্বাগ্রে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে যান এবং মত্ত হস্তীর মতো লড়াই করেন।

এক সময় এক গোপী তাঁর সখীকে বলেন, "হে সখী! নন্দনন্দন যখন পর্বতকন্দরে বিশ্রাম করছিল, তখন তার মস্তক শ্রীদামের বাহুর উপরে ন্যস্ত ছিল এবং শ্রীদামের বাঁ-হাত তার বক্ষবেষ্টন করে ছিল। সেই সুযোগে দেবপ্রস্থ কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগের বশবর্তী হয়ে তার পা টিপতে শুরু করে।" এই রকমই হচ্ছে গোচারণে শ্রীকৃষ্ণের সখাদের কার্যকলাপ।

আরও অন্তরঙ্গ সখাদের বলা হয় প্রিয়সখা এবং তাঁরা প্রায় কৃষ্ণের সমবয়সী। অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার ফলে তাঁদের ব্যবহার শুদ্ধ সখ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য সখাদের ব্যবহারে বাৎসল্য স্নেহ অথবা দাস্য সম্ভ্রমের রেশ থাকে, কিন্তু এই সমস্ত প্রিয় সখাদের ব্যবহার সমপর্যায়ভুক্ত শুদ্ধ সখ্যভিত্তিক। শ্রীকৃষ্ণের কয়েকজন প্রিয় সখার নাম হচ্ছে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণি, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিতঙ্ক ও কলবিঙ্ক। বিভিন্ন লীলায় বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে এই সমস্ত সখারা কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করতেন।

এই সমস্ত প্রিয়সখাদের ব্যবহারের বর্ণনা করে রাধারাণীর এক সখী তাঁকে বলছেন, "হে শোভাময়ী রাধে! তোমার অন্তরঙ্গ সখা কৃষ্ণকে তার অন্তরঙ্গ সখারাও খুব ভালভাবে সেবা করে। তাদের কেউ মৃদুস্বরে তার সঙ্গে পরিহাস করে এবং তার ফলে সে অত্যন্ত প্রীত হয়।" যেমন, শ্রীকৃষ্ণের এক ব্রাহ্মণ-বন্ধু হচ্ছেন মধুমঙ্গল। তিনি একজন লোভী ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করে ব্যঙ্গ করেন। সখারা যখন ভোজন করেন, তিনি তখন সকলের থেকে অধিক ভোজন করেন। বিশেষ করে লাড্ডু তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। সবার চাইতে বেশি লাড্ডু খেয়েও মধুমঙ্গলের তৃপ্তি হত না এবং তিনি কৃষ্ণকে বলতেন, "তুমি যদি আমাকে আর একটা লাড্ডু দাও, তা হলে আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করব, যাতে রাধারাণী তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়।" ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যদের আশীর্বাদ করেন এবং কৃষ্ণ বৈশ্যরাজ নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করার জন্য

ব্রাহ্মণ-বালক মধুমঙ্গল তাঁর সাথে এইভাবে পরিহাস করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সখার আশীর্বাদ পেয়ে কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হতেন এবং তাঁকে লাড্ডুর পর লাড্ডু উপহার দিতেন।

কখনও কখনও কোন প্রিয়সখা গভীর আবেগে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতেন। অপর কোন সখা তখন পিছন থেকে এসে শ্রীকৃষ্ণের চোখ টিপে ধরতেন। তাঁর প্রিয়সখাদের এই রকম আচরণে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই আনন্দ অনুভব করতেন।

এই সমস্ত প্রিয়সখাদের মধ্যে শ্রীদাম হচ্ছেন প্রধান। শ্রীদামের পরনে থাকত পীতবসন। তাঁর হাতে শিঙ্গা আর তাঁর মাথার পাগড়ির রঙ তামার মতো লাল। তাঁর বর্ণ কৃষ্ণ এবং তাঁর গলায় সুন্দর ফুলমালা। তিনি সর্বদা সখ্যভাবে পরিহাসছলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন। আমরা সেই শ্রীদামের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের কৃপা করেন।

শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে শ্রীদাম কখনও কখনও বলতেন, "ওঃ, তুমি এত নিষ্ঠুর যে, আমাদের যমুনার তটে ফেলে রেখে চলে গেছ। সেখানে তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমরা পাগলের মতো হয়ে গেছি! এখন আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে আমরা তোমাকে এখানে দেখতে পেয়েছি। তুমি যদি আমাদের শান্ত করতে চাও, তা হলে আমাদের সকলকে তুমি আলিঙ্গন কর। হে সখে! বিশ্বাস কর, এক পলকের জন্যও তোমাকে না দেখতে পেলে আমরা আকুল হয়ে উঠি, কেবল আমরাই নয়, এই গাভীরাও। তখন সব কিছুই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং আমরা তোমার জন্য পাগলের মতো হয়ে যাই।"

আরও কিছু সখা রয়েছেন যাঁরা আরও অন্তরঙ্গ। তাঁদের বলা হয় প্রিয়নর্ম সখা। প্রিয়নর্ম সখারা হচ্ছেন সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বল। শ্রীমতী রাধারাণীর সখীরা এক সময় রাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের সব চাইতে অন্তরঙ্গ এই সখাদের সম্বন্ধে বলেন, "হে কৃশাঙ্গী! দেখ, সুবল কিভাবে তোমার বার্তা কৃষ্ণকে কানে কানে বলছে, কিভাবে সে শ্যামাদাসীর গোপন চিঠিখানি নিঃশব্দে কৃষ্ণের হাতে দিচ্ছে, পালিকার তৈরি তাম্বূল কৃষ্ণের মুখে দিচ্ছে এবং তারকার তৈরি মালাখানি কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিচ্ছে। হে সখী! তুমি কি জান যে, কৃষ্ণের সব চাইতে অন্তরঙ্গ সখারা নিরন্তর এইভাবে তাঁর সেবা করছে?" প্রিয়নর্ম সখাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল হচ্ছেন প্রধান।

সুবলের রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে,—তাঁর অঙ্গকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো। তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর গলায় সর্বদাই ফুলমালা শোভা পায় এবং তাঁর বসন হরিদ্বর্ণ। তাঁর চোখ দুটি কদম ফুলের মতো সুন্দর এবং তিনি এত

বুদ্ধিমান যে, তাঁর বাণী ও উপদেশ সমস্ত সখাদের কাছে পরম আনন্দদায়ক। সেই কৃষ্ণসখা সুবলকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি!

কৃষ্ণ ও সুবলের অন্তরঙ্গতা এত গভীর যে, তাঁরা যখন তাঁদের গোপন কথা আলোচনা করতেন, তখন অন্য কেউই তা বুঝতে পারত না।

কৃষ্ণের আর এক প্রিয়নর্ম সখা উজ্জ্বলের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—উজ্জ্বলের বসন অরুণ রঙের এবং তাঁর চোখ দুটি সর্বদাই অত্যন্ত চঞ্চল। তিনি নানা রকম ফুল দিয়ে নিজেকে সাজান, তাঁর অঙ্গকান্তি ঠিক কৃষ্ণের মতো এবং তাঁর কণ্ঠে সর্বদা মুক্তমালা শোভা পায়। তিনি সর্বদাই কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। আমরা কৃষ্ণের সব চাইতে অন্তরঙ্গ সখা উজ্জ্বলের বন্দনা করি!

উজ্জ্বলের অন্তরঙ্গ সেবা সম্বন্ধে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর এক সখীকে বলছেন, "হে সখী! আমার মান রাখাই এখন দায় হয়েছে! আমি আর কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলব না বলে ঠিক করেছিলাম—কিন্তু দেখ! তাঁর সখা উজ্জ্বল আবার তাঁর কথা শোনাবার জন্য আমার কাছে আসছে। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ এতই প্রবল যে, কোন গোপীই তখন আর কৃষ্ণকে ভাল না বেসে থাকতে পারে না, তা সে যতই লাজুক হোক, তার পরিবারের প্রতি সে যতই কর্তব্য-পরায়ণ হোক এবং সে যতই পতিব্রতা হোক না কেন।"

উজ্জ্বলের আনন্দোচ্ছল স্বভাব তাঁর এই উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে, "হে কৃষ্ণ! হে অঘারি! তোমার প্রণয়ঘটিত ব্যাপার এখন এতদূর প্রসারিত হয়েছে যে, তোমাকে এখন অন্তহীন সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এখন পৃথিবীর সমস্ত যুবতী রমণীরা, যারা আদর্শ প্রেমিকের অন্বেষণ করছে, তারা সকলে এখন নদীর মতো সেই সমুদ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই অবস্থায় নদীরূপী সেই সমস্ত যুবতী রমণীরা যদি অন্য কোন দিকে তাদের গতিও পরিবর্তন করে, পরিণামে কিন্তু তাদের তোমার কাছে আসতেই হবে।"

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন সখাদের মধ্যে কেউ কেউ শাস্ত্রের মাধ্যমে সুবিদিত, এবং কেউ কেউ লোকগাথার মাধ্যমে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের সখাদের তিনটি ভাগ রয়েছে—কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসখা, কেউ কেউ স্বর্গলোক থেকে উন্নীত হয়েছেন এবং কেউ সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে সখ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, তাঁরা নিরন্তর কৃষ্ণকে মন্ত্রণা দান করেন। কিছু চপল প্রকৃতির বয়স্য বিদূষকের মতো শ্রীকৃষ্ণকে হাসান। কিছু সরল প্রবৃত্তিসম্পন্ন সখা তাঁদের সরলতার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কিছু সখা তাঁদের কার্যকলাপের মাধ্যমে অদ্ভুত সমস্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। তাঁদের কেউ কেউ অত্যন্ত বাতুল

এবং তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিরন্তর তর্ক করেন। আর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত সৌম্য এবং তাঁদের মধুর মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। এই সমস্ত সখারা শ্রীকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ, এবং তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন কার্যকলাপে অত্যন্ত দক্ষ। তাঁদের সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করা।

# দ্বিচত্বারিংশতি অধ্যায়

# সখ্যপ্রেম

শ্রীকৃষ্ণের বয়স, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর শিঙ্গা, তাঁর মুরলী, তাঁর শঙ্খ ও তাঁর মধুর ভঙ্গি—এই সবই তাঁর প্রতি সখ্য-ভক্তিরসের উদ্দীপক। কখনও কখনও রাজপুত্র অথবা ভগবানরূপে অভিনয় করার মাধ্যমে তাঁর রসিকতা করার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়, এবং তা-ও ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্য-ভক্তিরস উদ্দীপনের সহায়ক।

তত্ত্বদ্রষ্টা পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণের বয়সকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন—এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তাঁর বয়সকে বলা হয় কৌমার, ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং এগার থেকে পনের বছর পর্যন্ত কৈশোর। গোপবালক রূপে তাঁর লীলা কৌমার ও পৌগণ্ড অবস্থায়। কৈশোর অবস্থায় তিনি গোকুলে ছিলেন এবং গোপবালকরূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, এবং তারপর ষোল বছর বয়সে কংসকে বধ করার জন্য তিনি মথুরায় যান।

কৌমার অবস্থা মা যশোদার সঙ্গে বালকৃষ্ণের প্রেম-বিনিময়ের উপযুক্ত সময়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৩/১১) শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন, "হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণ যদিও সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, তবুও তিনি তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করতেন। কারণ তিনি একজন সাধারণ বালকরূপেই তাঁর লীলাবিলাস করছিলেন। তাঁর উদর ও বস্ত্রের মধ্যে বংশী, বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, হাতে স্নিগ্ধ দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, এবং তাঁর অঙ্গুলির অগ্রভাগে ফলের রাজা পিলু ফল। এইভাবে তিনি যখন তাঁর সখাদের সঙ্গে বসতেন, তখন তাঁকে কমলদল পরিবৃত কমলের কর্ণিকার মতো মনে হত। পরিহাস বাক্যে নিজের চতুর্দিকে উপবিষ্ট সখাদের হাস্য উৎপাদন করতে করতে তিনি ভোজন করতেন। তখন স্বর্গের দেবতারা অবাক বিস্ময়ে নির্নিমেষ নয়নে সেই দৃশ্য দর্শন করতেন।"

শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড বয়সকে আদি, মধ্য ও অন্ত—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। পৌগণ্ড অবস্থায় প্রবেশ করার পর তাঁর ওষ্ঠাধরে অতি সুন্দর রক্তিম দ্যুতি দেখা দেয়, তাঁর কটিদেশ তখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং কণ্ঠে শঙ্খের মতো বৃত্তাকৃতি দাগ দেখা দেয়। তখন বাইরে থেকে বৃন্দাবনে প্রত্যাগত পুরুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে

বলে উঠতেন, "হে মুকুন্দ! তোমার সৌন্দর্য অশ্বত্থের কিশলয়ের মতো ধীরে ধীরে বর্ধিত হচ্ছে। হে কমলনয়ন! তোমার কণ্ঠদেশে শঙ্খের মতো বৃত্তরেখা প্রকাশিত হচ্ছে, এবং চন্দ্রকিরণে তোমার দন্তাবলী ও কপোলের সৌন্দর্য পদ্মরাগ মণির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। তোমার বিকশিত দেহের সৌন্দর্য যে এখন তোমার সখাদের গভীর আনন্দ দান করছে, সেই সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ফুলের মালায় শোভিত থাকতেন। তাঁর পরনে থাকত বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত পট্টবস্ত্র। এই সমস্ত সুন্দর বস্ত্র-ভূষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাধন বলে মনে করা হত। এইভাবে সজ্জিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে যেতেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর সখাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতেন, এবং কখনও কখনও বনের মধ্যে সমবেতভাবে নৃত্য করতেন। এইগুলি পৌগণ্ড অবস্থায় কতকগুলি বিশিষ্ট কার্যকলাপ।

শ্রীকৃষ্ণের গোপসখারা তাঁর সঙ্গলাভে এত সুখী ছিলেন যে, তাঁদের সেই দিব্য অনুভূতি ব্যক্ত করে তাঁরা বলতেন, "হে কৃষ্ণ! অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত বৃন্দাবনের সর্বত্র গাভীদের চরাতে তুমি সর্বদাই ব্যস্ত। সুন্দর মালা, ছোট্ট শঙ্খ, মাথায় ময়ূরের পালক, পরনে তোমার পীত পট্টবস্ত্র, তোমার কানে কর্ণিকার ফুল আর বক্ষঃস্থলে মল্লিকার মালা—এই সব তোমার সৌন্দর্য বর্ধন করছে। এই সুন্দর স্বরূপে তুমি যখন আমাদের সঙ্গে লড়াই করার অভিনয় কর, তখন আমরা অন্তহীন দিব্য আনন্দ অনুভব করি।"

শ্রীকৃষ্ণের বয়স বর্ধিত হয়ে যখন মধ্য পৌগণ্ডে পদার্পণ করে, তখন তাঁর নখগুলি সুন্দরভাবে মসৃণ হয় এবং তাঁর গাল গোল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে তখন ত্রিবলী রেখা দেখা দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভে তাঁর গোপসখারা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতেন। সেই সময় তাঁর নাসিকার অগ্রভাগ তিল গাছের ফুলের সৌন্দর্যকে ম্লান করত, তাঁর কপোলের দীপ্তি মুক্তার জ্যোতিকে পরাস্ত করত, এবং তাঁর অঙ্গের পার্শ্বদেশ অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছিল। এই বয়সে তিনি বিদ্যুতের মতো কান্তিবিশিষ্ট পট্টবস্ত্র ধারণ করতেন, তাঁর মাথায় শোভা পেত সোনার জরিতে মোড়া রেশমের পাগড়ি এবং হাতে থাকত তিন হাত লম্বা একটি লাঠি।* শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব সুন্দর সাজ দেখে এক ভক্ত তাঁর সখাকে বলেন, "হে সখে! কৃষ্ণকে দেখ! সে কিভাবে স্বর্ণবলয়-মণ্ডিত যষ্টি হাতে ধারণ করে আছে, সোনার জরি দিয়ে মোড়া তাঁর

---

*এই সময়কার বিশিষ্ট লীলাটি শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরবন নামক বনে বিলাস করেছিলেন। বৃন্দাবনের অন্য আরও ১১টি বন সহ এই ভাণ্ডীরবন এখনও বিরাজমান এবং আজও বৃন্দাবন পরিক্রমা করার সময় ভক্তরা সেই বনের অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শন করতে পারেন।

শিরোভূষণ কি অপূর্ব দ্যুতি বিকিরণ করছে এবং তাঁর এই অপূর্ব সুন্দর বেশ তাঁর সখাদের সর্বোত্তম আনন্দ দান করছে!"

শেষ পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কেশরাশি কখনও কখনও তাঁর নিতম্ব পর্যন্ত ঝুলে থাকে এবং কখনও কখনও তা বিক্ষিপ্ত হয় এই বয়সে তাঁর স্কন্ধদেশ উঁচু ও চওড়া হয়, এবং তাঁর মুখমণ্ডল সর্বদাই তিলকের দ্বারা ভূষিত থাকে। তাঁর কেশরাশি যখন তাঁর স্কন্ধদেশের উপর বিক্ষিপ্ত হয়, তখন মনে হয় যেন লক্ষ্মীদেবী তাঁকে আলিঙ্গন করছেন। এই আলিঙ্গন তাঁর সখাদের গভীর আনন্দ দান করে। এক সময় সুবল বলেন, "হে কেশব! যদিও আমি তোমার থেকে অধিক বলবান, তবুও তোমার গোলাকৃতি শিরোভূষণ, হস্তে ধৃত কমল, ললাটের ঊর্ধ্বপুণ্ড্র কুমকুম-মিশ্রিত সুগন্ধ ও অপূর্ব সুন্দর দেহসৌষ্ঠব আজ আমাকে পরাজিত করছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সরল ও নমনীয় গোপাঙ্গনাদের কি অবস্থা হবে?"

এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে তাঁদের সম্মুখে দণ্ডায়মান গোপিকাদের সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করে কানাকানি করতেন। এক সময় সুবল শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি অত্যন্ত চতুর। তুমি তো সকলেরই মনের কথা জান; তাই আমি তোমার কানে কানে বলছি যে, সমস্ত গোপীদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দরী এই পাঁচটি গোপী তোমার বেশভূষা দেখে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমার মনে হয়, কন্দর্প যেন তোমাকে পরাস্ত করার জন্য তাদের নিযুক্ত করেছে।" অর্থাৎ যদিও শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবন-বিজয়ী, কিন্তু গোপিকাদের সৌন্দর্য শ্রীকৃষ্ণকেও পরাভূত করতে পারে।

কৈশোর বয়সের লক্ষণগুলি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, এবং ভক্তরা সাধারণত এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণকে সব চাইতে গভীরভাবে উপলব্ধি করে। কিশোর-কিশোরীরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণীর আরাধনা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বয়স এই কৈশোর রূপ থেকে বাড়ে না। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং অনন্ত রূপধারী, কিন্তু তবুও তাঁর আদি রূপ সর্বদাই নবযৌবন-সম্পন্ন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল প্রায় ১২০ বছর, তখন তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ছিল। কিন্তু তবুও আমরা দেখি যে, তখনও তিনি একজন কিশোর বালকের মতো প্রতীয়মান হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোপসখারা এক সময় বলেন, "হে কৃষ্ণ! এত সমস্ত অলঙ্কারে তোমার শ্রীঅঙ্গ অলঙ্কৃত করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার দিব্যরূপ এমনই মনোহর যে, তোমার সে সমস্ত অলঙ্কারের কোন প্রয়োজন নেই।" এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণ যখন খুব ভোরবেলায় বাঁশি বাজাতেন, তখন তাঁর সখারা তাঁর সঙ্গে গোচারণে যাওয়ার জন্য শয্যা ত্যাগ করে ছুটে আসতেন। তাঁর এক সখা এক সময় বলেন, "হে গোপসখাগণ! গোবর্ধন

পর্বতের উপর থেকে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির শব্দ আমাদের বলছে যে, তাকে খুঁজতে যমুনার তীরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"

শিবপত্নী পার্বতী এক সময় তাঁর পতিকে বলেন, "হে পঞ্চমুখ! পাণ্ডবদের দেখুন। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শুনে তাঁরা আবার তাঁদের বল ফিরে পেয়েছেন এবং তাঁদের সিংহের মতো মনে হচ্ছে।"

এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণ এক সময় তাঁর সখাদের সঙ্গে পরিহাস করার জন্য রাধারাণীর বেশ ধারণ করেন। তিনি কানে সোনার দুল পরেন এবং তাঁর রং যেহেতু কৃষ্ণবর্ণ, তাই শ্রীমতী রাধারাণীর মতো বর্ণ ধারণ করার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত শরীরে কুমকুম লেপন করেন। তাঁকে এইভাবে দেখে তাঁর সখা সুবল অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও তাঁর অন্তরঙ্গ সখাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতেন, কখনও গোলক নিয়ে খেলতেন, কখনও তাঁদের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করতেন। কখনও তাঁরা পরস্পরকে কাঁধে তুলে নিতেন এবং কখনও তাঁদের দক্ষতা প্রদর্শন করে লগুড় ঘোরাতেন। আর তাঁর গোপসখারা তাঁর সঙ্গে দোলনায় বসে অথবা শয্যায় একত্রে শয়ন করে এবং জলাশয়ে সাঁতার কেটে তাঁকে আনন্দ দান করতেন। এই সমস্ত কার্যকলাপকে বলা হয় অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণের সখারা যখনই তাঁর সঙ্গে সমবেত হতেন, তখনই তাঁরা এই সমস্ত কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হতেন, বিশেষ করে তাঁরা একত্রে নৃত্য করতেন। মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর এক সখা এক সময় কৃষ্ণকে বলেন, "হে সখে! হে অঘনাশন! গর্বভরে তোমার বাহুযুগলের শক্তি প্রদর্শন করে তুমি তোমার সখাদের মধ্যে বিচরণ করছ। তার কারণ কি আমার প্রতি তোমার ঈর্ষা? আমি জানি, তুমি মল্লযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। আমি জানি যে, তুমি অনেকক্ষণ ধরে নিষ্ক্রিয়ের মতো বসে আছ, কেন না আমাকে পরাস্ত করার কোন আশা তোমার নেই।"

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সখারাই ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক এবং তাঁরা যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। কারণ তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তাঁদের সমস্ত উদ্যমে বিজয়ী হতে কৃষ্ণ তাঁদের সাহায্য করবেন। তাঁরা একত্রে বসে তাঁদের কর্তব্য অকর্তব্যের বিচার করতেন, এবং জনহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হতে পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করতেন। কখনও তাঁরা পরস্পরকে তাম্বূল সেবন করাতেন, তিলকের দ্বারা মুখমণ্ডল শোভিত করতেন এবং পরস্পরের অঙ্গে চন্দন লেপন করতেন। কখনও কখনও পরিহাসছলে বিচিত্রভাবে তাঁদের মুখমণ্ডল চিত্রিত করতেন। তাঁর সখাদের আর একটা কাজ ছিল, তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরাস্ত করতে চাইতেন। কখনও কখনও তাঁরা তাঁর কাপড় ধরে টানতেন, অথবা

তাঁর হাত থেকে ফুল কেড়ে নিতেন। কখনও কখনও কেউ তাঁকে সাজিয়ে দেবার জন্য অন্য কাউকে অনুরোধ করতেন এবং তাতে অকৃতকার্য হয়ে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হতেন। এগুলি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সখাদের কতকগুলি সাধারণ কার্যকলাপ।

শ্রীকৃষ্ণের সখাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লীলাবিলাস হচ্ছে, তাঁরা গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবহ দূতের কাজ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের হয়ে যাজ্ঞা করতেন। গোপীদের সঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণের মতবিরোধ হত, তখন এই সখারা শ্রীকৃষ্ণ সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করতেন—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে গোপীদের পক্ষ অবলম্বন করতেন। এইভাবে কখনও এক পক্ষ, কখনও অপর পক্ষ অবলম্বন করে তাঁরা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কানাকানি করতেন। যদিও কানাকানির বিষয় তেমন কোন গুরুতর ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণের সেবকেরা কখনও কখনও ফুলচয়নে, মূল্যবান রত্ন-অলঙ্কারে তাঁর দেহ সাজাতে, তাঁর সম্মুখে নৃত্য করতে, সঙ্গীত পরিবেশন করতে, গোচারণ করতে, তাঁর অঙ্গমর্দন করতে, ফুলমালা তৈরি করতে এবং তাঁকে ব্যজন করতে নিযুক্ত থাকতেন। এগুলি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবকদের কতকগুলি প্রাথমিক কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের সখারা ও সেবকেরা মিলিতভাবে তাঁর সেবা করতেন। তাঁদের এই সমস্ত কার্যকলাপকে বলা হয় অনুভাব।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়কে দমন করে যমুনা থেকে উঠে এলেন, তখন শ্রীদাম সবার আগে তাঁকে আলিঙ্গন করবার জন্য দৌড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি গভীর মর্যাদা অনুভব করার ফলে, তিনি তাঁর হাত ওঠাতে পারলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যখন তার মুরলী বাজাতেন, তখন তার ধ্বনি স্বাতী লগ্নে আকাশে মেঘগর্জনের মতো শোনাত। বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে স্বাতী নক্ষত্রের উদয়ে যদি বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টির জল যদি সাগরে পড়ে, তা হলে তার ফলে মুক্তার সৃষ্টি হয় এবং তা যদি সাপের মাথায় পড়ে, তা হলে রত্নের সৃষ্টি হয়। তেমনই স্বাতী লগ্নে মেঘগর্জনের মতো যখন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বাজত, তখন শ্রীদামের শরীরের স্বেদবিন্দু মুক্তার মতো শোভা পেত।

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে দেখে, শ্রীমতী রাধারাণীর একটু ঈর্ষা হয়েছিল এবং সেই ভাব গোপন করে তিনি বলেন, "হে সুবল! তুমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, কেন না গুরুজনদের সামনেও কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে তোমার সঙ্কোচ হয় না। নিশ্চয়ই তুমি পূর্বজন্মে নানা রকম তপস্যায় কৃতকার্য হয়েছ।" শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু

গুরুজনদের সামনে তিনি তা করতে পারতেন না। কিন্তু সুবল নিঃসঙ্কোচে তা করতেন। রাধারাণী তাই তাঁর সৌভাগ্যের প্রশংসা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয় হ্রদে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ সখারা এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের দেহ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা ভয়ঙ্কর ঘড়্‌ঘড়্ ধ্বনি করতে শুরু করেছিলেন। সেই সময় তাঁরা মূর্ছিতের মতো ভূমিতে পতিত হন। তেমনই, দাবানলের সময় শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত সখারা তাঁদের নিজেদের প্রতিরক্ষার কথা বিবেচনা না করে, সেই লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে ঘিরে তাঁর চারপাশে দাঁড়ান। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর সখাদের এই ব্যবহারকে মনীষীরা ব্যভিচারী ভাব বলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যভিচারী ভাবে কখনও কখনও উন্মত্ততা, দক্ষতা, ভয়, আলস্য, হর্ষ, গর্ব, বিহ্বলতা, ধৃতি, ব্যাধি, বিস্মৃতি ও দৈন্য আদি ভাব দেখা দেয়। এইগুলি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যভিচারী ভাবের সামান্য লক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্ভ্রম রহিত তাঁর যে সমস্ত সখা তাঁকে তাঁদের সমান বলে মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের এই সখ্যভাবকে বলা হয় স্থায়িভাব। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সখ্যরতিতে আকর্ষণ, স্নেহ, রতি ও আসক্তি আদি প্রেমের লক্ষণগুলি দেখা যায়। স্থায়িভাবের একটি উদাহরণ হচ্ছে অর্জুন (বৃন্দাবনের এই অর্জুন পাণ্ডুপুত্র অর্জুন নন), যিনি অক্রূরকে বলেন, "হে গান্দিনীনন্দন! কৃপা করে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করুন, কখন আমি তাঁকে আমার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারব?"

যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হয়, কিন্তু তবুও তাঁর সঙ্গে সখ্যরসে আচরণে সম্ভ্রমের নামগন্ধ থাকে না, সেই অবস্থাকে বলা হয় স্নেহ। এই স্নেহের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, দেবাদিদেব মহাদেবের নেতৃত্বে দেবতারা যখন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ঐশ্বর্য বর্ণনা করে তাঁর বন্দনা করছিলেন, তখন অর্জুন (পূর্ববর্ণিত অর্জুন) তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর শিখীপুচ্ছ থেকে সযত্নে ধুলি ঝেড়ে দিয়েছিলেন।

দুর্যোধনের দ্বারা নির্বাসিত হয়ে পাণ্ডবেরা যখন অজ্ঞাতভাবে বনবাস করেছিলেন, তখন কেউই জানত না তাঁরা কোথায় আছেন। সেই সময় দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে মুকুন্দ! যদিও আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আপনিই হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান, আর সেই আপনার সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করে পাণ্ডবেরা আজ তাদের রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, তারা এখন বনবাসী। কখনও কখনও তাদেরকে একজন সাধারণ শ্রমিকের তা অপরের গৃহে কাজ করতে হয়। জড়-জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলিকে

অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক লক্ষণ বলে মনে হয়, কিন্তু এত দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও পাণ্ডবেরা আপনার প্রতি তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেনি। সেটি হচ্ছে এর মাধুর্য। প্রকৃতপক্ষে তারা নিরন্তর আপনার কথাই চিন্তা করে এবং অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত সখ্য ভাবাপন্ন হয়ে আপনার নামকীর্তন করে।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগের আর একটি দৃষ্টান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৫/১৮) বর্ণিত হয়েছে। একদিন গোচারণে শ্রীকৃষ্ণ ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করার জন্য ভূমিতে শয়ন করেন, সেই সময় গোপবালকেরা সেখানে সমবেত হয়ে গভীর অনুরাগের সঙ্গে গান গাইতে শুরু করেন, যাতে শ্রীকৃষ্ণ ভালভাবে বিশ্রাম করতে পারেন।

সখ্যভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সখ্য। সেই যুদ্ধের সময় একদিন দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা অন্যায়ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে, যদিও রণনীতি অনুসারে সারথিকে কখনও আক্রমণ করা উচিত নয়। অশ্বত্থামা এত জঘন্য মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন, তবুও সে তাঁকে আক্রমণ করতে সঙ্কোচ করেনি। অর্জুন যখন দেখলেন যে, অশ্বত্থামা শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করার জন্য নানা রকম বাণ নিক্ষেপ করছে, তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে সেগুলি প্রতিহত করেন। সেই সময় অর্জুন যদিও বাণের আঘাতে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এক দিব্যপ্রেম অনুভব করেছিলেন, এবং সেই বাণগুলি তাঁর কাছে পুষ্পবৃষ্টির মতো মনে হয়েছিল।

সখ্যরসে কৃষ্ণপ্রেমের আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—বৃষভ নামক এক গোপবালক যখন শ্রীকৃষ্ণের মালা গাঁথার জন্য পুষ্পচয়ন করছিলেন, তখন মধ্যাহ্ন-সূর্য প্রবলভাবে তাপ বিকিরণ করছিল। কিন্তু বৃষভের কাছে সূর্যের সেই তপ্ত কিরণ চন্দ্রের সুশীতল জ্যোৎস্নার মতো মনে হয়েছিল। ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি সম্পাদনের এটিই হচ্ছে পন্থা; ভক্তরা গভীর বিপদেও—পাণ্ডবদের যেমন হয়েছিল—সেই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থাকে ভগবানের সেবা করার এক মহান সুযোগ বলে মনে করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের সখ্যের বর্ণনা করে নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণকে মনে করিয়ে দেন, "অর্জুন যখন ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করছিলেন, তখন বহুদিন তিনি আপনাকে দর্শন করতে পারেননি। কিন্তু আপনি যখন সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।" অর্থাৎ অর্জুন যদিও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করছিলেন, তবুও তিনি মুহূর্তের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাননি এবং শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা মাত্রই তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

পত্রী নামক শ্রীকৃষ্ণের এক সেবক তাঁকে সম্বোধন করে বলেন — "হে প্রভু! অঘাসুরের গ্রাস থেকে আপনি গোপবালকদের রক্ষা করেছেন, কালীয়নাগের বিষ থেকে আপনি তাদের রক্ষা করেছেন এবং দাবানলের প্রচণ্ড দহন থেকে আপনি তাদের রক্ষা করেছেন। কিন্তু আমি আপনার বিরহ বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি, যে বেদনা অঘাসুরের ক্ষুধার থেকেও, কালীয় হ্রদের বিষজ্বালার থেকেও এবং দাবাগ্নির দহন থেকেও দুঃসহ। সুতরাং আমার বিরহ বেদনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করবেন।" শ্রীকৃষ্ণের অন্য এক সখা এক সময় তাঁকে বলেন, "হে কংসারি। যখন থেকে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ, তখন থেকেই বিরহের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই বিরহব্যথা অধিক তীব্র হয়ে ওঠে যখন আমরা জানতে পারি যে, ভাণ্ডীরবনে তুমি বৃষভানুতনয়া রাধারাণীরূপী শীতল নদীতে অবগাহন করে তোমার শ্রান্তি দূর করছ।" অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধারাণীর সঙ্গে মিলিত হতেন, তখন সুবল আদি গোপবালকেরা গভীর বিরহ বেদনা অনুভব করতেন এবং তা তাঁদের কাছে অসহ্য ছিল।

অন্য এক বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! হে অঘারি! তুমি যখন কংসকে বধ করার জন্য বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গিয়েছিলে, তখন গোপবালকদের শরীরে পঞ্চভূতের চারটি ভূত (মাটি, জল, আগুন ও আকাশ) লোপ পেয়েছিল, কেবল পঞ্চম ভূত বায়ু তাদের নাসারন্ধ্রে তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল।" শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসকে বধ করার জন্য মথুরায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বিরহে গোপবালকেরা এত ব্যথিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন বলা হয় যে, সে পঞ্চমহাভূত ত্যাগ করেছে, কেন না দেহ তখন সেই পাঁচটি উপাদানে বিলীন হয়ে যায়। এখানে যদিও মাটি, জল, আগুন ও আকাশ লুপ্ত হয়েছিল, অপর উপাদান বায়ু তখন খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং তাঁদের নাসারন্ধ্রে তা প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, কংসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের পরিণাম কি হবে, সে কথা চিন্তা করে গোপবালকেরা সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতেন।

এক সখা এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে সখে! তোমার এক সখা তোমার বিরহে এত আকুল হয়ে উঠেছিল যে, তার নয়নকমল অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাই কালো ভ্রমররূপী নিদ্রা তাতে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়ে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল।" কৃষ্ণভ্রমরেরা পদ্মফুলে উড়ে গিয়ে মধু সঞ্চয় করে। শ্রীকৃষ্ণের সখার চোখদুটির সঙ্গে পদ্মফুলের তুলনা করা হয়েছে, এবং যেহেতু তা অশ্রুজলে পূর্ণ ছিল, তাই নিদ্রারূপী কালো ভ্রমর সেই পদ্ম থেকে মধু সঞ্চয় করতে পারেনি, তাই তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল, অর্থাৎ অত্যন্ত বিরহে

তাঁর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাই তিনি ঘুমাতে পারেননি। এটি শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত অনিদ্রার একটি উদাহরণ।

আলম্বন শূন্যতার বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "বৃন্দাবন ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় চলে যাবার ফলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম গোপসখাদের চিত্ত এত হালকা হয়ে যায় যে, তাঁরা আলম্বন শূন্য হয়ে বায়ুর থেকেও হালকা তুলোর মতো বাতাসে ভাসছিলেন।" অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপবালকদের মন সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে যান, তখন গোপবালকদের মধ্যে অধীরতার লক্ষণ দেখা দেয়। বিরহ-ব্যথায় অধীর হয়ে সমস্ত গোপবালকেরা গোচারণ করতে ভুলে যান এবং গোচারণে যে সমস্ত সুমধুর গান তাঁরা করতেন, তা তাঁরা ভুলে যান। কৃষ্ণবিরহে তাঁদের আর তখন বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছিল না।

কৃষ্ণবিরহে স্থির হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন শ্রীকৃষ্ণের এক সখা মথুরায় তাঁকে বলেন যে, তাঁর বিরহে সমস্ত গোপবালকেরা পর্বত-শীর্ষের পত্রহীন বৃক্ষের মতো হয়ে গেছেন। অত্যন্ত কৃশ ও রুগ্ন হয়ে তাঁরা নগ্নপ্রায় হয়ে গেছেন, এবং তাঁরা আর কোন ফল অথবা ফুল বহন করছে না। তাঁর বিরহে তাঁরা কখনও কখনও ব্যাধি অনুভব করছেন, এবং এই বিরহ-ব্যথায় অধীর হয়ে তাঁরা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে যমুনার তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে অনুপস্থিত ছিলেন, তখন সমস্ত গোপবালকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন, এবং তাঁরা তাঁদের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেন। তখন তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁরা যেন উন্মাদ হয়ে গেছেন এবং তাঁরা সমস্ত কাজ করতে ভুলে গেছেন। তাঁরা কখনও মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন, কখনও উন্মাদের মতো হাসতেন এবং কখনও অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়াতেন। তার ফলে তাঁদের পাগলের মতো মনে হত। এক সখা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করে বলেন, "হে সখে! কংসকে বধ করে তুমি এখন মথুরার রাজা হয়েছ, এই সংবাদ জগতের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। কিন্তু সমস্ত ব্রজবাসীরা আজ তোমার বিরহে কাতর হয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে করতে অন্ধ হয়ে গেছে। তাদের হৃদয় ব্যাকুলতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই তুমি মথুরার রাজা হওয়ার ফলে তারা একটুও হর্ষ অনুভব করছে না।"

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কখনও কখনও মৃত্যুর লক্ষণও দেখা যায়। এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছিল, "হে কংসারি! তোমার বিরহে গোপবালকেরা নিদারুণ কষ্টভোগ করছে, এবং এখন তারা মাঠে শুয়ে রয়েছে এবং খুব ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে বনের হরিণেরা পর্যন্ত অশ্রুবর্ষণ করছে।"

*স্কন্দ পুরাণের* মথুরা খণ্ডে গোচারণরত গোপবালক পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বর্ণনা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্রুপদ নগরে কুম্ভকারের দোকানে অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হন, তখন তাঁদের রূপের সাদৃশ্য হেতু তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এটি সারূপ্য হেতু সখ্যের একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৭১/২৭) বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হন, তখন ভীম আনন্দে এতই অধীর হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়েছিল এবং তাঁর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং তিনি তখনই তাঁর মাতুলপুত্রকে আলিঙ্গন করেন। তাঁর পেছনে পেছনে তখন অর্জুন, নকুল ও সহদেবও আনন্দে বিহ্বল হয়ে পূর্ণতৃপ্তি সহকারে ভগবানকে আলিঙ্গন করেন, যাঁর আর এক নাম হচ্ছে অচ্যুত। বৃন্দাবনের গোপবালকদের সম্বন্ধেও এরকম একটি বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তখন সমস্ত গোপবালকেরা নানা রকম মণিমাণিক্য-খচিত কর্ণকুণ্ডল ধারণ করে তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে তাঁরা তাঁদের পুরানো বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করার জন্য বাহু প্রসারিত করেছিলেন। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের সখ্য-প্রীতিতে পূর্ণতৃপ্তির দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১২/১২) বর্ণনা করা হয়েছে যে, গভীর কৃচ্ছ্রসাধন, কঠোর তপস্যা ও যোগাভ্যাসের ফলেও মহান যোগীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদধূলির এক কণামাত্র গ্রহণেরও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না, কিন্তু সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনবাসীরা অনায়াসে দর্শন করতে পারেন। অর্থাৎ, সেই সমস্ত ভক্তদের সৌভাগ্যের কোন তুলনা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপবালকদের সখ্য একটি বিশেষ দিব্য ভাবানুভূতি, যা প্রায় মাধুর্য প্রেমের আনন্দের মতো। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপবালকদের এই প্রীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন। রূপ গোস্বামী প্রমুখ সুদক্ষ ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গোপসখাদের অনির্বচনীয় ভাব সম্বন্ধে তাঁদের বিস্ময় প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরঙ্গ সখাদের মধ্যে যে দিব্য প্রেম, তা আরও অধিক উন্নত হয়ে বাৎসল্য প্রেমে পরিণত হয় এবং তারপর তা আরও বর্ধিত হয়ে মাধুর্য প্রেমের রূপ ধারণ করে, যা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তের দিব্য প্রেমের সর্বোত্তম রস।

# ত্রিচত্বারিংশতি অধ্যায়

# বাৎসল্য ভক্তিরস

যখন প্রেমভাব বর্ধিত হয়ে বাৎসল্য সম্পর্ক বিকশিত হয়ে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সম্পর্ককে বাৎসল্য রস বলা হয়। ভক্তির বাৎসল্য রসের প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পিতা-মাতা আদি গুরুজনদের ব্যবহারের মধ্যে পাওয়া যায়।

তত্ত্বদ্রষ্টা পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনদের মধ্যে যে বাৎসল্য প্রেম দৃষ্ট হয় তার উদ্দীপনের বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "যাঁর দেহ নববিকশিত পদ্মের মতো নীলাভ ও কোমল, যাঁর কমলনয়ন ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে বৃন্দাবনের পথে চলতে দেখে নন্দ মহারাজের প্রিয় পত্নী মা যশোদার স্তনযুগল থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে থাকে এবং তার ফলে তাঁর শরীর সিক্ত হয়।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য প্রেমের উদ্দীপনার কয়েকটি বিশিষ্ট উদ্দীপক রয়েছে—তাঁর শ্যামল অঙ্গকান্তি, তাঁর সর্ব মঙ্গলময় লক্ষণযুক্ত স্বরূপ, তাঁর মৃদুতা, তাঁর মধুর বচন, তাঁর লজ্জা, তাঁর নম্রতা, নিরন্তর গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার এবং উদারতা—এই সমস্ত গুণ বাৎসল্য রসের উদ্দীপক বলে বিবেচনা করা হয়।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৮/৪৫) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, সমস্ত বেদে যাঁকে পরম দেবতা বলে স্বীকার করা হয়েছে, *উপনিষদে* যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সমস্ত দর্শন শাস্ত্রে যাঁকে পরম পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যোগীদের কাছে যিনি হচ্ছেন পরমাত্মা এবং ভক্তদের কাছে যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সেই শ্রীকৃষ্ণকে মা যশোদা তাঁর শিশুসন্তান রূপে লাভ করেছিলেন। এক সময় মা যশোদা তাঁর এক সখীকে বলেন, "গোপরাজ নন্দ মহারাজ ও আমি বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলাম এবং সেই আরাধনার ফলে কৃষ্ণ পূতনা আদি রাক্ষসী ও অসুরদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিল। আমার অঙ্গনের অর্জুন বৃক্ষদুটি অবশ্য প্রবল বায়ুতাড়িত হয়ে ভূপতিত হয়, এবং তখন যদিও মনে হয়েছিল যে, কৃষ্ণ গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিল, তবে আমার মনে হয় বলরাম সহ নন্দ মহারাজ আসলে সেই পর্বতটি ধারণ করেছিলেন। তা না হলে একটি ছোট্ট শিশুর পক্ষে সেই বিরাট পর্বত ধারণ করা কি করে সম্ভব?" এটি বাৎসল্য রসজনিত প্রেমভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগবশত ভক্ত

মনে করেন যে, তিনি কৃষ্ণের থেকে বড় এবং তিনি যদি কৃষ্ণের লালন-পালন না করেন, তা হলে কৃষ্ণ বাঁচবে না। সেই ভাবের ফলে এই বাৎসল্য রসের প্রকাশ হয়। তাই এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনদের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছি। তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে এবং তাঁর লালন পালন করতে আকুল হয়ে থাকেন। সমস্ত জগতের পিতা যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতি স্নেহশীল সেই সমস্ত ভক্তদের উদ্দেশ্যে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।"

এই রকমই আর একটি প্রার্থনায় এক ব্রাহ্মণ বলেছেন, "অন্যরা *বেদ* ও *উপনিষদের* আরাধনা করুক, যারা জড় অস্তিত্বের ভয়ে ভীত এবং যারা এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তারা *মহাভারতের* আরাধনা করুক, কিন্তু আমি কেবল নন্দ মহারাজের বন্দনা করতে চাই, যাঁর অলিন্দে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি শিশুরূপে হামাগুড়ি দিচ্ছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য স্নেহপরায়ণ প্রধান প্রধান গুরুজনদের নাম হচ্ছে—১) ব্রজেশ্বরী যশোদা মা, ২) ব্রজরাজ নন্দ মহারাজ, ৩) বলরামের মাতা রোহিণী দেবী, ৪) যে সমস্ত গোপবালকদের ব্রহ্মা অপহরণ করেছিলেন তাদের মায়েরা, ৫) বসুদেব-পত্নী দেবকী, ৬) বসুদেবের অন্যান্য পনের জন পত্নী, ৭) অর্জুনের মাতা কুন্তী, ৮) শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পিতা বসুদেব, ৯) শ্রীকৃষ্ণের গুরু সান্দীপনি মুনি। এই সমস্ত শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য স্নেহপরায়ণ। বাৎসল্য স্নেহের আধিক্য অনুসারে এই নামগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনদের মধ্যে নন্দ মহারাজ ও মা যশোদাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৯/৩) শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে মা যশোদার রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাজন! মা যশোদার গুরুনিতম্ব বেষ্টন করে রয়েছে সুন্দর পট্টবস্ত্র, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহের ফলে তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হচ্ছিল। তিনি যখন দৃঢ়ভাবে মন্থনরজ্জু ধারণ করে দধি মন্থন করতেন, তখন তাঁর কঙ্কন থেকে কিঙ্কিনী শব্দ উত্থিত হত এবং তাঁর কানের কুণ্ডল আন্দোলিত হত, তখন তাঁর খোঁপা থেকে ফুল ঝরে পড়ত। অত্যন্ত পরিশ্রম করার ফলে তাঁর মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু দেখা দিত।"

এক ভক্তের প্রার্থনায়ও মা যশোদার বর্ণনা পাওয়া যায়, "মা যশোদা আমাকে রক্ষা করুন, যাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি সুন্দর দড়ি দিয়ে বাঁধা, সিঁদুর তাঁর সীমন্ত উজ্জ্বল সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছে এবং তাঁর দেহের সৌন্দর্য সমস্ত অলঙ্কারগুলিকে

তিরস্কার করছে, তাঁর নেত্রযুগল নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল দর্শন করছে এবং তার ফলে তারা সর্বদাই অশ্রুপূর্ণ, নীল পদ্মের মতো তাঁর অঙ্গকান্তি বহুবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রের প্রভাবে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হোক, যাতে আমরা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে এবং ভগবদ্ভক্তির মার্গে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারি।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার স্নেহের বর্ণনা করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মা যশোদা সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বুকের দুধ খাওয়ান, এবং তারপর নানা রকম বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তারপর তিনি খুব সুন্দরভাবে তাঁর কপালে তিলক পরিয়ে দেন এবং তাঁর হাতে রক্ষাকবচ বেঁধে দেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহের প্রতীক।

নন্দ মহারাজের রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তাঁর মাথার চুল সাধারণত কালো, তবে কিছু চুল পাকা। তাঁর পরনের বসন কচি কলাপাতার রঙের মতো সবুজ। তাঁর উদর স্থূল, তাঁর অঙ্গকান্তি ঠিক পূর্ণচন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এবং তাঁর মুখে খুব সুন্দর শ্মশ্রু রয়েছে। সেই ব্রজরাজ নন্দকে আমরা পূজা করি! একদিন শিশু কৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের হাত ধরে আঙিনায় হাঁটছিলেন এবং যেহেতু তিনি তখনও ঠিকমতো হাঁটতে পারতেন না, তাই মনে হচ্ছিল তিনি যেন পড়ে যাবেন। এইভাবে নন্দ মহারাজ তখন তাঁর অপ্রাকৃত পুত্রটিকে হাঁটতে শেখাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর চোখদুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সেই নন্দ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি!

শৈশব কাল, শিশুর পোশাক, শিশুর গতিবিধি, শিশুর আধো আধো কথা এবং হাস্য আদি শিশুসুলভ লীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য প্রেমের উদ্দীপক। শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকে আদ্য, মধ্য ও শেষ—এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আদ্য ও মধ্য কৌমার অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের উরুদ্বয় স্থূল এবং তাঁর চোখের কোণগুলি সাদা। তাঁর তখন ছোট ছোট দাঁত উঠতে দেখা যায়, এবং তিনি অত্যন্ত মৃদু ও কোমল। তাঁর সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "কৃষ্ণের যখন কেবল তিন-চারটি দাঁত উঠেছিল, তখন তাঁর উরুদ্বয় স্থূল ছিল, তাঁর দেহ খুব ছোট ছিল এবং তিনি শিশুসুলভ কার্যকলাপের মাধ্যমে নন্দ মহারাজ ও যশোদা মায়ের বাৎসল্য-স্নেহ বর্ধিত করেছিলেন। তিনি কখনও কখনও তাঁর ছোট পা-দুটি দিয়ে চলবার প্রয়াস করতেন, কখনও কখনও কাঁদতেন, কখনও হাসতেন, কখনও আঙ্গুল চুষতেন এবং কখনও চিৎ হয়ে ভূমিতে শুয়ে থাকতেন।" এই সমস্ত বালকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা, বিভিন্ন ক্রীড়া। যখন শ্রীকৃষ্ণ ভূমিতে চিৎ হয়ে শুয়ে তাঁর

শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষতেন বা হাসতেন বা কখনও কাঁদতেন, তখন তাঁর এই সমস্ত লীলা দেখে মা যশোদা তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেন না। পক্ষান্তরে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্রের শৈশব লীলা দর্শন করে দিব্য আনন্দে মগ্ন হতেন।" শ্রীকৃষ্ণের কৌমার অবস্থার শুরুতে বাঘের নখ বসানো একটি সোনার হার তাঁর গলায় ঝুলত, তাঁর কপালে রক্ষাসূচক তিলক শোভা পেত, তাঁর চোখে কাজল পরানো থাকত এবং তাঁর কোমর বেষ্টন করে থাকত একটি রেশমের ডুরি। এগুলি আদ্য কৌমার অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষার বর্ণনা।

গলায় বাঘের নখ বসানো মালা পরিহিত, নবীন তমাল বৃক্ষের মতো বর্ণযুক্ত গো-তিলকে সুশোভিত, হাতে সুন্দর রেশমের ডুরির বন্ধনযুক্ত এবং পীতাম্বর পরিহিত তাঁর শিশুপুত্র শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য যখন নন্দ মহারাজ দর্শন করতেন, তখন তাঁকে প্রাণভরে দেখেও যেন তাঁর আশ মিটত না।

মধ্য কৌমার অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের কেশের অগ্রভাগ তাঁর চোখের চারদিকে এলোমেলো হয়ে পড়ত। কখনও তাঁর কোমরে কাপড় জড়ানো থাকত, আর কখনও তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন থাকতেন। কখনও তিনি এক পা এক পা করে হাঁটবার চেষ্টা করতেন এবং কখনও অত্যন্ত মধুরভাবে আধো-আধো স্বরে কথা বলতেন। এগুলি মধ্য কৌমার অবস্থার কতকগুলি লক্ষণ। মা যশোদা যখন তাঁকে একবার তাঁর মধ্য কৌমার অবস্থায় দর্শন করেছিলেন, তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তাঁর মাথার এলোমেলো চুলগুলি তাঁর ভ্রূ স্পর্শ করছিল এবং তাঁর চোখগুলি ছিল চঞ্চল, কিন্তু তিনি ঠিকমতো কথা বলে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারছিলেন না। কিন্তু তবুও তিনি আধো-আধো স্বরে কথা বলছিলেন, তাঁর সেই কথা শুনতে খুব মিষ্টি লাগছিল। মা যশোদা তখন তাঁর ছোট ছোট কানগুলি দেখলেন এবং দেখলেন যে, নগ্ন শরীরে ছোট ছোট পায়ে তিনি দৌড়বার চেষ্টা করছেন, তখন তিনি আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ হচ্ছে—নাকে মুক্তার নোলক, তাঁর করকমলে ননী এবং তাঁর কোমরে বাঁধা কিঙ্কিণী। মা যশোদা যখন দেখতেন, কিঙ্কিণীর শব্দ করে চলতে চলতে সেই শিশুটি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে, নাকে তাঁর মুক্তার নোলক আর হাতে তাঁর ননীর দলা। তখন তাঁর এই শিশুপুত্রটিকে দর্শন করে মা যশোদার হৃদয় এক অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠত।

মধ্য কৌমার অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশ ক্ষীণ হয়, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত হয় এবং তাঁর মস্তক কাকের পালকের মতো কুঞ্চিত কেশরাশির দ্বারা সুশোভিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত সৌন্দর্য দর্শন করে মা যশোদা আশ্চর্য না হয়ে পারতেন না। শেষ কৌমার অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকে ছোট্ট একটি যষ্টি। তাঁর বস্ত্র তখন

একটু লম্বা হয় এবং তাঁর কোমরে গিঁট বাঁধা থাকে, যা দেখতে ঠিক সাপের মতো মনে হয়। সেইভাবে সজ্জিত হয়ে তিনি গৃহের নিকটেই গোবৎসদের দেখাশুনা করতেন এবং কখনও কখনও সমবয়সী গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করতেন। তাঁর কাছে তখন একটি পাতলা বাঁশি ও মহিষের শৃঙ্গ থাকত, কখনও আবার তিনি পাতার বাঁশিও বাজাতেন। এইগুলি শ্রীকৃষ্ণের শেষ কৌমারের কতকগুলি লক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন একটু বড় হলেন এবং গোবৎসদের তত্ত্বাবধান করতে শুরু করলেন, তখন তাদের চরাতে চরাতে তিনি কখনও কখনও বনের কাছে এসে উপস্থিত হতেন। তাঁর ঘরে ফিরতে যখন একটু দেরি হত, তখন নন্দ মহারাজ চন্দ্রশালিকায় (চতুর্দিক ভাল করে দেখবার জন্য ছাতের উপরে তৈরি ছোট মঞ্চ) উঠে তাঁর অন্বেষণ করতেন। তাঁর ছোট ছেলেটির ঘরে ফিরতে দেরি হওয়ার ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে, নন্দ মহারাজ যতক্ষণ পর্যন্ত না গোপসখা পরিবৃত হয়ে গোবৎসদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে আসতে দেখতেন এবং সেই কথা তাঁর পত্নীকে বলতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চন্দ্রশালিকার উপরেই থাকতেন। তাঁর শিশুপুত্রের মাথার ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়ে তিনি তাঁর প্রিয় পত্নীকে বলতেন, সেই শিশুটি কিভাবে তাঁর নেত্রদ্বয়কে আনন্দ দান করছে।

মা যশোদা তখন নন্দ মহারাজকে বলতেন, "দেখ, আমার প্রিয় পুত্র, যার চোখ দুটি শুভ্র আভাযুক্ত, যার মাথায় পাগড়ি, গায়ে চাদর আর তার পায়ে বাঁধা মধুরভাবে শব্দ সৃজনকারী নূপুর। সে তার সুরভি গোবৎসদের নিয়ে আসছে। দেখ দেখ, কিভাবে সে বৃন্দাবনের পবিত্র ভূমিতে বিহার করছে।"

তেমনই, নন্দ মহারাজ তাঁর প্রিয় পত্নীকে বলতেন, হে যশোদা! তোমার পুত্র কৃষ্ণকে দেখ! তার শ্যামল অঙ্গকান্তি, তার আরক্তিম চক্ষু, তার উন্নত বক্ষ ও সুন্দর স্বর্ণহার তাকে কি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে! তাঁকে দেখতে কি সুন্দর লাগছে এবং সে কি অদ্ভুতভাবে আমার হৃদয়ে দিব্য আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে!"

নন্দ মহারাজের প্রিয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর কৈশোরে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর সৌন্দর্য আরও বর্ধিত হয়, কিন্তু তবুও তাঁর পিতা-মাতা মনে করতেন যে, তিনি তখনও পৌগণ্ড অবস্থাতেই রয়েছেন—যদিও তখন তাঁর বয়স দশ থেকে পনের বৎসর। তার ঠিক বিপরীতভাবে আবার তাঁর পৌগণ্ড অবস্থায় তাঁর কয়েকজন ভৃত্য তাঁকে কৈশোর অবস্থাপ্রাপ্ত বলে মনে করত। বাল্যলীলা বিলাসকালে কৃষ্ণ প্রায়ই দুধ ও দধির ভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলতেন, সারা আঙ্গিনা জুড়ে দই ছিটিয়ে দিতেন এবং ননী চুরি করতেন। কখনও কখনও তিনি দধিমন্থন

দণ্ড ভেঙ্গে ফেলতেন এবং কখনও কখনও তিনি আগুনে মাখন ঢেলে দিতেন। এইভাবে তিনি মা যশোদার আনন্দ বর্ধন করতেন।

এই সম্পর্কে এক সময় মা যশোদা তাঁর দাসী মুখরাকে বলেন, "দেখ, সশঙ্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কৃষ্ণ কিভাবে লতাবিতানের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। তাকে দেখ, মনে হচ্ছে সে যেন ননী চুরি করতে আসছে। দেখ, ও যেন তোমাকে দেখতে না পায় অথবা বুঝতে না পারে যে, আমরা তাকে দেখছি। আমি তার চতুর ভ্রূভঙ্গিমা, সাতঙ্ক নেত্রযুগল ও সুন্দর মুখমণ্ডল হৃদয় ভরে দেখতে চাই।"

শ্রীকৃষ্ণের চুপি চুপি মাখন-চুরির লীলায় মা যশোদা তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে, কখনও তাঁর হাত দিয়ে তাঁকে আদর করে, কখনও তাঁকে আশীর্বাদ করে, কখনও একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে, কখনও তাঁকে পালন করে এবং কখনও চুরি না করার সদুপদেশ দিয়ে বাৎসল্য প্রেমের আনন্দ আস্বাদন করতেন। এখানে একটি বিশেষভাবে দর্শনীয় তথ্য হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যেও চুরি করার শিশুসুলভ প্রবৃত্তি দেখা যায় এবং তাই এই প্রবৃত্তিটি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে চুরি করার এই প্রবৃত্তি জড় জগতের মতো দোষযুক্ত নয়।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৩/৩৩) শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন, "হে রাজন! বয়স্কা গোপীরা যখন তাঁদের পুত্রদের আসতে দেখতেন, তখন এক অনির্বচনীয় বাৎসল্য স্নেহে তাঁদের হৃদয় ভরে উঠত এবং সেই স্নেহে তাঁরা মগ্ন হতেন। প্রথমে তাঁরা সঙ্কল্প করতেন, মাখন চুরি করার জন্য তাঁরা তাঁদের পুত্রদের তিরস্কার করবেন, কিন্তু তাঁদের পুত্রদের দর্শন করা মাত্রই তাঁদের রাগ স্তিমিত হয়ে যেত এবং গভীর স্নেহে তাঁরা বিহ্বল হয়ে যেতেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রদের আলিঙ্গন করে তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করতেন এবং তাঁদের পুত্রদের প্রতি স্নেহে উন্মাদিনীর মতো হয়ে যেতেন।" বাল্যলীলায় এই সমস্ত গোপবালকেরা মাখন চুরি করতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগ দিতেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে মা যশোদা তাঁর বুকের দুগ্ধধারায় সিক্ত হতেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহে তিনি বারবার তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করতেন।

গোপবালকদের প্রতি তাঁদের মায়েদের স্নেহের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিগুলি হচ্ছে চুম্বন, আলিঙ্গন, তাঁদের নাম ধরে ডাকা এবং তাঁদের চৌর্যবৃত্তির জন্য তাঁদের মৃদুভাবে তিরস্কার করা। বাৎসল্য প্রেমের এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে বলা হয় সাত্ত্বিক ভাব, যার মধ্যে ভাবের আট প্রকার লক্ষণ পূর্ণরূপে দৃষ্ট হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৩/২২) শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন, "সমস্ত গোপবালকদের মায়েরা ভগবানের যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন, এবং যখনই

তাঁরা তাঁদের পুত্রদের শব্দ শুনতেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াতেন এবং মনে মনে তাঁদের পুত্রদের আলিঙ্গন করতেন, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে সরাসরিভাবে সৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদেরকে তাঁদের গর্ভজাত সন্তান বলে মনে করে, তাঁরা তাঁদের কোলে তুলে নিতেন এবং গভীর প্রেমে তাঁদের বুকের উপর সেই শিশুদের নিয়ে তাঁরা তাঁদের আলিঙ্গন করতেন। সেই আবেগপ্রসূত ভাব অমৃতের থেকেও মধুর। মায়েদের স্তন থেকে তখন দুগ্ধধারা বর্ষিত হত এবং বালকেরা তখন তা পান করত।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ললিত-মাধবে* শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "হে কৃষ্ণ! তুমি যখন গোচারণে যাও, তখন গাভী ও গোবৎসদের খুর থেকে উত্থিত ধূলি তোমার সুন্দর মুখ ও তিলক ঢেকে দেয় এবং তোমাকে তখন ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত বলে মনে হয়। কিন্তু তুমি যখন গৃহে ফিরে আস, তখন তোমার মায়ের স্তন-নিঃসৃত দুগ্ধধারা তোমার ধূলি-আচ্ছাদিত মুখমণ্ডল ধুইয়ে দেয় এবং তখন মনে হয় তুমি যেন সেই দুধের দ্বারা পবিত্র হলে, ঠিক যেভাবে অভিষেকের সময় শ্রীবিগ্রহকে দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়।" মন্দিরে রীতি আছে, যখন কোন অপবিত্র কার্যকলাপ হয়, তখন মন্দিরের শ্রীবিগ্রহকে দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং মা যশোদার স্তন-নিঃসৃত দুগ্ধধারায় স্নাত হয়ে তিনি ধূলির আবরণ থেকে পবিত্র হতেন।

ভাবের আবেগে মা যশোদা কখনও কখনও স্তম্ভিত হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেন, তখন মা যশোদা তাঁকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে সঙ্কোচ বোধ করেন এবং স্তম্ভিত হয়ে যান। গিরি-গোবর্ধন ধারণজনিত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে মা যশোদার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে অসমর্থ হন এবং উৎকণ্ঠায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই, সেই অবস্থায় কৃষ্ণের কি করা উচিত, তা পর্যন্ত তিনি তাঁকে বলতে পারেননি। এটি ভগবৎ-প্রেমে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত।

পুতনা আদি রাক্ষস-রাক্ষসীদের আক্রমণ থেকে তাঁর শিশু পুত্রটিকে রক্ষা পেতে দেখে মা যশোদা অপার আনন্দ অনুভব করতেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৭/১৯) শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, "মা যশোদা তাঁর হারানো পুত্রকে ফিরে পেয়ে, নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী বলে মনে করতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে কোলে নিয়ে বারবার তাঁকে আলিঙ্গন করতেন। এইভাবে তিনি যখন বারবার তাঁর পুত্রটিকে আলিঙ্গন করতেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ত এবং তিনি তাঁর দিব্য আনন্দ ব্যক্ত করতে পারতেন না।" শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *বিদগ্ধ-মাধবে* বলা হয়েছে, "হে কৃষ্ণ! তোমার মায়ের স্পর্শ এতই

স্নিগ্ধ ও আরামদায়ক যে, তা চন্দনের প্রলেপের স্নিগ্ধতাকে এবং উশীর শিকড় সিক্ত উজ্জ্বল চন্দ্র-কিরণকেও পরাভূত করে।" (উশীর হচ্ছে এক রকমের শিকড়, যা জলে ভেজালে অত্যন্ত শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্যদহনের সময় তা সাধারণত ব্যবহার করা হয়।)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম নিরন্তর দৃঢ়ভাবে বর্ধিত হয়। কখনও তা অতিশয় স্নেহ এবং কখনও প্রবল অনুরাগরূপে তাঁর সেই প্রেম প্রকাশিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৬/৪৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রবল স্নেহের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যেখানে শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন, "হে রাজন! উদার চরিত্র নন্দ মহারাজ যখন মথুরা থেকে ফিরে এলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করতে থাকেন।" এই রকম আর একটি বর্ণনা মা যশোদা সম্বন্ধেও রয়েছে। গোচারণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় তাঁর বংশীধ্বনি শোনবার জন্য যখন তিনি আকুল হয়ে ওঠেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে বলে মনে করায় তাঁর আকুলতা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে এবং তাঁর স্তনযুগল থেকে দুগ্ধধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি কখনও ঘরের ভিতরে যাচ্ছিলেন, এবং কখনও ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। তিনি নিরন্তর পথের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন গোবিন্দ আসছে কি না। যখন অনেক মহর্ষিরা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপের জন্য তাঁর বন্দনা করছিলেন, তখন গোকুলেশ্বরী মা যশোদা কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং দুগ্ধধারায় তাঁর শাড়ির অধোভাগ সিক্ত হয়। মা যশোদার কুরুক্ষেত্রে এই প্রবেশ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ যখন সূর্যগ্রহণের সময় দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, সেই সময় ব্রজবাসীরাও তাঁকে দর্শন করবার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই কুরুক্ষেত্রের তীর্থে উপস্থিত হন, তখন সেখানে সমবেত সমস্ত মানুষেরা বলতে শুরু করেন যে, দেবকীসুত কৃষ্ণ এসেছেন। সেই সময় ঠিক একজন স্নেহশীলা মাতার মতো দেবকী কৃষ্ণের মুখমণ্ডলে হাত দিয়ে আদর করতে থাকেন। লোকেরা যখন আবার বলতে থাকেন যে, বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, তখন মা যশোদা ও নন্দ মহারাজ উভয়েই উল্লসিত হয়ে তাঁদের প্রগাঢ় আনন্দ ব্যক্ত করতে থাকেন।

গোকুলেশ্বরী মা যশোদা যখন কুরুক্ষেত্রে তাঁর পুত্রকে দর্শন করতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর এক সখী তাঁকে বলেন, "হে রাণী! তোমার স্তনরূপ পর্বত থেকে প্রবাহিত দুগ্ধধারা গঙ্গাকে শুভ্র করে দিয়েছে, আর তোমার চোখের কাজল-মিশ্রিত অশ্রুধারা যমুনাকে কালো করে দিয়েছে। আর তুমি এই নদী মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ। তাই, তোমার পুত্রের মুখ দর্শন করবার জন্য আর

উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। এই দুটি নদীই তোমার বাৎসল্য স্নেহ তার কাছে প্রদর্শন করছে!"

মা যশোদার এই সখীটি কৃষ্ণকে বলেন, "হে মুকুন্দ! গোকুলেশ্বরী মা যশোদাকে যদি তোমার মুখারবিন্দ দর্শন করার জন্য আগুনের মধ্যে দাঁড়াতে হয়, তা হলে তাঁর কাছে সেই আগুন তুষারাচ্ছাদিত হিমালয় পর্বতের মতো মনে হবে। তেমনই তাঁকে যদি তোমার মুখারবিন্দ দর্শন থেকে বঞ্চিত করে অমৃতের সমুদ্রেও রাখা হয়, তা হলে তাঁর কাছে সেই অমৃতের সমুদ্র বিষের সমুদ্রের মতো মনে হবে।" নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শনাকাঙ্ক্ষী মা যশোদার উৎকণ্ঠার মহিমা সমস্ত জগৎ জুড়ে প্রচারিত হোক।

এ রকমই একটি বর্ণনা কুন্তীদেবী অক্রূরের কাছে করেছিলেন, "হে ভ্রাতঃ অক্রূর! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুকুন্দ বহুদিন আমাদের থেকে অনুপস্থিত রয়েছে। তুমি কি দয়া করে তাকে বলবে যে, তার পিতৃস্বসা কুন্তী শত্রুদের মাঝখানে রয়েছেন, এবং তিনি জানতে চান কবে তিনি আবার তার মুখারবিন্দ দর্শন করতে পারবেন?"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৪৬/২৮) উল্লেখ করা হয়েছে, "উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে গিয়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছিলেন, তখন তা শুনে মা যশোদার স্তন থেকে দুগ্ধ নিঃসৃত হতে থাকে এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়তে থাকে।" কৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার বাৎসল্য প্রেমের পরাকাষ্ঠার এক উদাহরণ তখন প্রকট হয়েছিল, যখন শ্রীকৃষ্ণ কংসের রাজধানী মথুরায় চলে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে, মা যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণের সাজসজ্জার সামগ্রীগুলি দর্শন করেন, তখন তিনি প্রচণ্ড শব্দে অচেতনের মতো ভূমিতে পতিত হন। তিনি যখন ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছিলেন, তখন তাঁর অঙ্গে অনেক আঁচড় পড়ে এবং সেই শোচনীয় অবস্থায় তিনি "হা পুত্র! হা পুত্র!" বলে আর্তনাদ করতে থাকেন, এবং তিনি দুহাতে তাঁর বুক চাপড়াতে থাকেন। ভক্তরা মা যশোদার এই অবস্থাকে বিরহজনিত দিব্যপ্রেম বলে বর্ণনা করেছেন। কখনও কখনও গভীর উৎকণ্ঠা, শোক, নৈরাশ্য, স্তম্ভ, দৈন্য, চাপল্য, উন্মাদনা ও মোহ আদি অন্যান্য লক্ষণও দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ঘরের বাইরে গোচারণ-ভূমিতে ছিলেন, তখন মা যশোদার উৎকণ্ঠা সম্বন্ধে এক ভক্ত তাঁকে বলেন, "হে যশোদা! আমার মনে হয় তোমার গতি এখন মন্থর হয়ে গেছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে উঠেছ। তোমার চোখ দুটি যেন এখন নিস্পন্দ হয়ে উঠেছে, যার ফলে তোমার বুকের দুধ টগবগ করে ফুটছে। এই সমস্ত অবস্থা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে,

তোমার পুত্রের বিরহে তোমার প্রবলভাবে মাথাব্যথা হচ্ছে।" এইগুলি কৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার উৎকণ্ঠার কয়েকটি লক্ষণ।

অক্রূর যখন বৃন্দাবনে গিয়ে দ্বারকায় কৃষ্ণের কার্যকলাপের বর্ণনা করেছিলেন, তখন মা যশোদাকে তিনি বলেছিলেন যে, কৃষ্ণ বহু মহিষীকে বিবাহ করে তাঁর গার্হস্থ্য কার্যকলাপে অত্যন্ত ব্যস্ত। সেই কথা শুনে যশোদা অনুতাপ করে বলেছিলেন যে, তিনি কত অভাগিনী যে, কৈশোর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তিনি তাঁর বিবাহ দিতে পারলেন না এবং তাই তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে নিয়ে আসতে পারলেন না। গভীর দুঃখে তিনি বলে উঠেছিলেন, "হে অক্রূর! তুমি কেবল আমার মাথায় বজ্রাঘাত করছ!" এইগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে মা যশোদার বিষাদের লক্ষণ।

তেমনই, নৈরাশ্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে মা যশোদা চিন্তা করেছিলেন, "যদিও আমার লক্ষ লক্ষ গাভী আছে, সেই সমস্ত গাভীর দুগ্ধ কৃষ্ণকে তৃপ্ত করতে পারল না। তাই এই দুধকে আমি ধিক্কার দিচ্ছি! আর আমাকেও ধিক্, কেন না যদিও আমার ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, তবুও আমি এখন আমার শিশুপুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করতে পারছি না এবং তাকে আমার বুকের দুধ দিতে পারছি না, যে রকম আমি তাকে দিতাম যখন সে বৃন্দাবনে ছিল।" এটি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে মা যশোদার নৈরাশ্যের একটি লক্ষণ।

এক সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি যখন গোকুলে ছিলে, তখন তোমার হাতে সব সময় একটি লাঠি থাকত। সেই লাঠিটি এখন মা যশোদার গৃহে অলসভাবে পড়ে রয়েছে, আর তিনি যখন সেটি দর্শন করেন, তখন তিনিও সেই যষ্ঠিটির মতো নিস্পন্দ হয়ে যান।" এটি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত বিনীতভাবে মা যশোদা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করেন, "হে বিধাতা! তুমি কি কৃপা করে আমার কৃষ্ণকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসবে না, যাতে অন্তত এক পলকের জন্য আমি তাঁকে দর্শন করতে পারি?" কখনও কখনও উন্মাদিনীর মতো অধীর হয়ে মা যশোদা নন্দ মহারাজকে তিরস্কার করতেন, "নির্লজ্জের মতো এই প্রাসাদে তুমি কি করছ? লোকেরা কেন তোমাকে ব্রজরাজ বলে সম্বোধন করে? এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমার প্রিয় পুত্র কৃষ্ণ এখান থেকে চলে গেলেও তুমি একজন কঠিন হৃদয় পিতার মতো এই বৃন্দাবনে এখনও রয়েছ!"

মা যশোদার উন্মত্ততার কথা কেউ শ্রীকৃষ্ণকে গিয়ে এইভাবে শোনান—"উন্মাদিনীর মতো মা যশোদা কদম্ব বৃক্ষগুলিকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'আমার পুত্র কোথায়?' তেমনই, তিনি পক্ষীদের ও ভ্রমরদের জিজ্ঞাসা করছেন

তারা কৃষ্ণকে দেখেছে কি না এবং তিনি তাদের কাছে জানতে চাইছেন তারা তোমার সম্বন্ধে কিছু জানে কি না। এইভাবে বিরহ বেদনায় অধীর হয়ে সকলকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি সমস্ত বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াচ্ছেন।" এটি শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত উন্মাদনার একটি দৃষ্টান্ত।

মা যশোদা যখন নন্দ মহারাজকে 'পাষাণ-হৃদয়' বলে অভিযুক্ত করেন, তখন তিনি উত্তর দেন, "হে প্রিয় যশোদা! তুমি কেন এত উত্তেজিত হচ্ছ? ভাল করে দেখ। তা হলেই দেখবে যে, তোমার পুত্র কৃষ্ণ তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই রকম উন্মাদিনীর মতো আচরণ করো না। দয়া করে ঘরের শান্তি বজায় রাখো।" কৃষ্ণের এক সখা তাঁকে জানান যে, তাঁর বিরহে তাঁর পিতাও এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

বসুদেবের মহিষীরা যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব দর্শন করেন এবং তৎক্ষণাৎ বাৎসল্য স্নেহে তাঁদের স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে শুরু করে এবং তার ফলে তাঁদের শাড়ির অধোভাগ ভিজে যায়। এটি মনোবাসনা পূর্তিজনিত ভগবৎ প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১১/২৯) বর্ণনা করা হয়েছে, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি প্রথমে তাঁর মাতা দেবকী ও অন্য সমস্ত বিমাতাদের দর্শন করেন এবং তাঁদের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন। তাঁর মায়েরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে কোলে তুলে নেন এবং বাৎসল্য স্নেহে উদ্বেল হয়ে তাঁদের স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত হতে থাকে। এইভাবে তাঁদের বুকের দুধের সঙ্গে তাঁদের চোখের জল মিশ্রিত হয় এবং তা-ই ছিল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রথম নৈবেদ্য।" এটি গভীর বিরহের পর মিলন-জনিত তৃপ্তির একটি দৃষ্টান্ত।

*ললিত-মাধবে* এই রকম একটি বর্ণনা রয়েছে—"কি আশ্চর্য যে, নন্দ মহারাজের পত্নী যশোদা, কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য স্নেহে আকুল হয়ে তাঁর চোখের জল এবং বুকের দুধ দিয়ে তাঁর প্রিয় পুত্র কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করেছিলেন।" *বিদগ্ধ-মাধবে*, এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে মুকুন্দ! পদ্মফুলের সৌরভপূর্ণ তোমার মুখচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মা যশোদা বাৎসল্য স্নেহে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর কলসি-সদৃশ স্তনযুগল থেকে দুধ ক্ষরিত হতে থাকে।" এইভাবে যশোদা মায়ের স্তনযুগল থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিরন্তর দুগ্ধের ধারা বর্ষিত হত।

এগুলি কৃষ্ণের প্রতি তাঁর মাতা, পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদের বাৎসল্য স্নেহের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। বাৎসল্য স্নেহজনিত ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণগুলি তখনই

প্রকাশিত হয়, যখন কৃষ্ণকে পুত্ররূপে দর্শন হয়। কৃষ্ণের প্রতি এই নিরন্তর দিব্য ভাবকে বাৎসল্য রসের স্থায়িভাব বলা হয়।

এখানে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতদের মত অনুসারে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিনটি দিব্যভাব কখনও কখনও মিশ্রিত হয়। যেমন, বলরামের সখ্যভাব দাস্য ও বাৎসল্য ভাবযুক্ত। তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রেম বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যভাবের মিশ্রণ। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ উগ্রসেনের দিব্যভাব দাস্য ও বাৎসল্য রসের মিশ্রণ। বৃন্দাবনের সমস্ত বয়স্ক গোপীদের ভাব বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্যভাবের মিশ্রণ। মাদ্রীর পুত্রদ্বয়—নকুল ও সহদেব এবং দেবর্ষি নারদের ভাব সখ্য ও দাস্যের মিশ্রভাব। শিব, গরুড় ও উদ্ধবের ভাব দাস্য ও সখ্যের মিশ্রণ।

# চতুশ্চত্বারিংশতি অধ্যায়

# মধুর ভক্তিরস

মধুর রতিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তের আকর্ষণকে ভক্তির মধুর রস বলা হয়। যদিও এই মধুর ভাব সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত, তবুও এই দিব্য প্রেম ও প্রাকৃত কামক্রীড়াকে আপাতদৃষ্টিতে এক রকম বলে মনে হয়। তাই যারা কেবল প্রাকৃত কামক্রীড়ার প্রতি আসক্ত, তারা এই দিব্য প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে না। দিব্য ভক্তিরসের এই বিনিময় তাদের অত্যন্ত রহস্যময় বলে প্রতীত হয়। সেই জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী মধুর ভক্তিরসের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন।

মধুর ভক্তিরসের আলম্বন হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অতি প্রিয় শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁর সহচরীরা। শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই; কেউই তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত নয়, এবং কেউই তাঁর থেকে মহৎ নয়। তাঁর সৌন্দর্যও অসমোর্ধ্ব, তাঁর সঙ্গে কারওই তুলনা হতে পারে না। যেহেতু তিনি পরম প্রেমিক, তাই তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণ মধুর রসের আলম্বন।

শ্রীজয়দেব গোস্বামী বিরচিত *গীতগোবিন্দ* কাব্যগ্রন্থে জনৈকা গোপী তাঁর এক সখীকে বলেছেন, "এই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস। তাঁর শ্রীঅঙ্গ পদ্মফুলের মতো সুকোমল। গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার, যা ঠিক যুবতীর প্রতি যুবকের প্রেমের মতো, তা হচ্ছে অপ্রাকৃত প্রেমের বিষয়।" গোপিকাদের চরণারবিন্দের অনুগামী জনৈক শুদ্ধ ভক্ত গোপিকাদের আরাধনা করে বলেছেন, "অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত গোপিকাদের আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁরা তাঁদের অপূর্ব রূপমাধুরীর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন।" সমস্ত যুবতী গোপিকাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন প্রধানা।

শ্রীমতী রাধারাণীর সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তাঁর চোখ দুটি চকোরী পক্ষীর চোখের চারুলতাকে পরাভূত করে। কেউ যখন শ্রীমতী রাধারাণীর মুখমণ্ডল দর্শন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি চন্দ্রের সৌন্দর্যের নিন্দা করতে শুরু করেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গের দীপ্তি স্বর্ণকেও লজ্জা দেয়। এই রকম দিব্য সৌন্দর্য মণ্ডিতা শ্রীমতী রাধারাণীকে যেন আমরা দর্শন করতে পারি।" শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা বর্ণনা করে বলেছেন, "যখন আমি শ্রীমতী রাধারাণীর সৌন্দর্য আস্বাদন করার জন্য কোন হাস্য-পরিহাস করি, তখন শ্রীমতী

রাধারাণী সেই কৌতুকপূর্ণ বাক্য অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শোনে, কিন্তু তার শরীরের অঙ্গভঙ্গি ও প্রত্যুত্তরের দ্বারা সে আমাকে অবহেলা করে। তার সেই অবহেলাও আমাকে অনন্ত আনন্দ দান করে, কেন না সে তখন এত সুন্দর হয়ে ওঠে যে, আমার আনন্দ তখন শতগুণে বর্ধিত হয়।" *গীতগোবিন্দেও* এই রকম একটি বর্ণনা রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, কংসারি শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীমতী রাধারাণীকে আলিঙ্গন করেন, তখন তিনি তাঁর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান এবং অন্য সমস্ত গোপিকাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন।

*পদ্যাবলীতে* শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, গোপিকারা যখন শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণ করেন, তখন তাঁরা তাঁদের গুরুজনদের সমস্ত তিরস্কারের কথা ভুলে যান। তাঁরা তাঁদের কলঙ্কের কথা ভুলে যান এবং তাঁদের পতিদের কঠোর ব্যবহারের কথা ভুলে যান। তখন তাঁরা বাইরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে খোঁজার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপিকাদের যখন মিলন হয়, তখন তাঁদের দৃষ্টি-বিনিময় এবং তাঁদের কৌতুকপূর্ণ হাস্যোচ্ছল ব্যবহারকে বলা হয় অনুভাব।

*ললিতমাধব* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ ঠিক যমুনার মতো এবং শ্রীমতী রাধারাণীর হাসি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতো। যখন যমুনা ও চন্দ্রের মিলন হয়, তখন সেই জল অমৃতের মতো হয়ে যায়, তা পান করলে তখন গভীর তৃপ্তিলাভ হয়। তা হিমের মতো শীতল এবং তা সমস্ত সন্তাপ হরণ করে। এইভাবে *পদ্যাবলীতে* রাধারাণীর এক নিত্য সহচরী বলেছেন, "হে চন্দ্রমুখী রাধে! তোমার সমস্ত অঙ্গে তৃপ্তির ছাপ, কিন্তু তবুও তোমার চোখে জল। তোমার বাণী গদ্‌গদ এবং তোমার বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। এই সমস্ত লক্ষণ থেকে আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণ করেছ এবং তার ফলে তোমার হৃদয় এখন দ্রবীভূত হচ্ছে।"

এই *পদ্যাবলীতে* আর একটি বর্ণনা রয়েছে, যা প্রেমের নৈরাশ্যের লক্ষণ বলে গণনা করা হয়। শ্রীমতী রাধারাণী বলেন, "হে অনঙ্গ! দয়া করে আমার উপর বর্ষিত তোমার বাণের আঘাতে আমাকে উত্তেজিত করো না। হে বায়ু! ফুলের সৌরভ বহন করে এনে আমাকে উদ্দীপ্ত করো না। আমি এখন কৃষ্ণের প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়েছি, এবং তাই এই দেহ ধারণ করে কি লাভ? এই শরীরের আর কি প্রয়োজন?" এটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমজনিত নৈরাশ্যের একটি লক্ষণ।

তেমনই, *দানকেলি-কৌমুদীতে* শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়ে বলেন, "বনের এই ধূর্ত বালকটির সৌন্দর্য ঠিক নীলকমলের মতো, এবং সে ত্রিভুবনের সমস্ত যুবতী রমণীদের আকর্ষণ করতে পারে। এখন সে আমাকে তার দিব্য দেহের অমৃতময় আস্বাদন দান করে মদমত্ত করে তুলেছে। এই উন্মাদনা আমি আর সহ্য

করতে পারছি না। আমার অবস্থা এখন ঠিক একটি মাতঙ্গের সঙ্গ প্রভাবে মত্ত মাতঙ্গিনীর মতো!" এটি কৃষ্ণপ্রেম জনিত হর্ষের একটি দৃষ্টান্ত।

মধুর ভক্তিরসের স্থায়িভাবই দেহ সম্ভোগের মূল কারণ। *পদ্যাবলীতে* সম্ভোগের এই মূল কারণের বর্ণনা রাধারাণী তাঁর এক সহচরীকে বলছেন, "হে সখী! এই বালকটি কে? যার নিরন্তর নৃত্যশীল আঁখিপল্লব তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বর্ধিত করছে এবং মাধুর্য রসে আমাকে উদ্বেল করেছে? কানে তার অশোকের মঞ্জরী আর পরনে তার পীতবসন। তার মুরলীর সুরে এই বালকটি আমাকে অস্থির করে তুলেছে।"

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মাধুর্য প্রেম কখনও কোন রকম স্বার্থের দ্বারা বিচলিত হয় না। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মাধুর্য প্রেমের অবিচলিত ভাবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ থেকে একটু দূরে মা যশোদা দাঁড়িয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখাদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন, তাঁর সামনে ছিল চন্দ্রাবলী, আর সেই সময় ব্রজের প্রবেশপথে একটি পাথরের উপর বৃষাসুর দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণ যখন একটি লতাকুঞ্জের আড়ালে শ্রীমতী রাধারাণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর সুন্দর ভ্রূযুগল বিদ্যুতের মতো তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করল।"

আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, "আঙ্গিনার এক পাশে পড়েছিল শৃগাল পরিবৃত শঙ্খাসুরের মৃতদেহ। অপর পাশে ছিলেন বিজিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীবৃন্দ। তাঁরা সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা নিবেদন করছিলেন, যা ছিল গ্রীষ্মকালে শীতল বায়ুর মতো স্নিগ্ধ। স্নিগ্ধ শীতলতা বিস্তার করে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। স্নিগ্ধ ও দগ্ধ—এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও রাধারাণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপী কমল ম্লান হয়নি।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর এই প্রেমকে প্রায়ই বিকশিত কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়; তবে কমলের সঙ্গে তার কেবল একটি মাত্র পার্থক্য—শ্রীমতীর প্রেম নিত্য বর্ধনশীল মাধুর্যমণ্ডিত।

মাধুর্য প্রেমকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ মাধুর্য প্রেমকে তিনটি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, ১) পূর্বরাগ, অথবা প্রাথমিক আকর্ষণ, ২) মান, অথবা আপাত অভিমান, এবং ৩) প্রবাস, অথবা দূরত্বজনিত বিচ্ছেদ।

প্রেমিক ও প্রেমিকার যখন মনে হয় যে, পূর্বে তাঁদের কখনও মিলন হয়নি, তাকে বলা হয় পূর্বরাগ। *পদ্যাবলীতে* শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর এক সখীকে বলেছেন, "হে সখী! আমি যখন যমুনার তীরে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ বর্ষার জলভরা মেঘের মতো শ্যামবর্ণ একটি অপূর্ব সুন্দর বালক আমার গোচরীভূত হয়। সে আমার দিকে

এমনভাবে তাকাল, যা আমি বর্ণনা করতে পারব না। তারপর থেকেই আমি আর গৃহকাজে মনোনিবেশ করতে পারি না।" এটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগের একটি দৃষ্টান্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৫৩/২) শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীর কাছ থেকে আগত ব্রাহ্মণ দূতকে বলেন, "হে ব্রাহ্মণ! রুক্মিণীর মতো আমিও বিনিদ্র রাত্রি যাপন করি, এবং আমার মনও সর্বদাই তার চিন্তায় মগ্ন থাকে। আমি জানি যে, তার ভাই রুক্মী আমার বিরোধী এবং তারই চক্রান্তে আমাদের বিবাহ হয়নি।" এটি পূর্বরাগের আর একটি দৃষ্টান্ত।

মান সম্বন্ধে *গীতগোবিন্দে* নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলি রয়েছে—"শ্রীমতী রাধারাণী যখন দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপিকাদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করছেন, তখন তাঁর উৎকর্ষ নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তিনি একটু ঈর্ষান্বিত হন। তাই, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেলেন এবং ভ্রমরের গুঞ্জন মুখরিত পুষ্পশোভিত একটি সুন্দর লতাবিতানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তারপর লতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে তিনি তাঁর দুঃখের কথা তাঁর এক সখীকে বলতে লাগলেন।" এটি মানের একটি দৃষ্টান্ত।

প্রবাসের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে *পদ্যাবলীতে* বলা হয়েছে, "যে শুভক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করেছেন, সেই দিন থেকে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর করতলে মাথা রেখে নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করছেন। তাই তাঁর মুখমণ্ডল এখন সর্বদাই আর্দ্র এবং ক্ষণিকের জন্যও তাঁর চোখে ঘুম নেই।" মুখ ভিজে থাকলে ঘুম কেটে যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধারাণী যখন নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করছিলেন, তখন রাধারাণী ক্ষণিকের জন্যও ঘুমাতে পারছিলেন না। *প্রহ্লাদ-সংহিতায়* উদ্ধব বলেছেন, "কামদেবের শরাঘাতে আহত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ নিরন্তর আপনাদের (গোপিকাদের) কথাই চিন্তা করছেন এবং তার ফলে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।"

যখন প্রেমিক ও প্রেমিকা মিলিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গলাভে আনন্দ উপভোগ করেন, তাকে বলা হয় সম্ভোগ। *পদ্যাবলীতে* এক জায়গায় বলা হয়েছে, "শ্রীকৃষ্ণ এত সুন্দরভাবে শ্রীমতী রাধারাণীকে আলিঙ্গন করলেন যে, তা দেখে মনে হল যেন ময়ূরদের নৃত্যোৎসব হচ্ছে।" এইভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের পঞ্চম লহরী সমাপ্ত করেছেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান গোপালের সনাতন রূপকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছেন।

*ইতি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের 'পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস নিরূপণকারী' পশ্চিম বিভাগের ভক্তিবেদান্ত ভাষ্য সমাপ্ত।*

# চতুর্থ খণ্ড

## পঞ্চচত্বারিংশতি অধ্যায়

# গৌণ ভক্তিরস

### হাস্য ভক্তিরস

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের চতুর্থ বিভাগে শ্রীল রূপ গোস্বামী হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাতটি গৌণ ভক্তিরসের বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী বিবিধ ভাবের পরস্পর মৈত্রী-বৈরী, স্থিতি ও রসাভাসের বর্ণনা করেছেন। যখন এক প্রকার ভক্তিরস বিরুদ্ধভাবে অপর কোন রসকে ছাপিয়ে যায়, তখন তাকে রসাভাস বলা হয়।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, হাস্যরস সাধারণত যুবক-যুবতীদের মধ্যে অথবা শিশু ও বৃদ্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। কখনও কখনও অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবসম্পন্ন মানুষদের মধ্যেও এই দিব্য প্রেমময় রস দেখতে পাওয়া যায়। এক সময় এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক যশোদা মায়ের দুয়ারে আসে। তাকে দেখে কৃষ্ণ মা যশোদাকে বলেন, "মা! আমি এই রুগ্নাকৃতি মানুষটির কাছে যেতে চাই না। আমি যদি তার কাছে যাই, তা হলে সে আমাকে তার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে পুরে নিয়ে তোমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে!" এইভাবে অপূর্ব শিশু কৃষ্ণ তাঁর মায়ের দিকে তাকাতে থাকেন, আর তখন সেই ভিক্ষুকটি যে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল, সে তার হাস্য সংবরণ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে তৎক্ষণাৎ হেসে উঠল। এই দৃষ্টান্তটিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হাস্যরসের আলম্বন।

এক সময় শ্রীকৃষ্ণের এক বন্ধু তাঁকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি যদি হাঁ কর, তা হলে আমি তোমাকে একটি খুব সুন্দর ননীর মিঠাই দেব।" শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ মুখ খুলে হাঁ করলেন, কিন্তু ননীর মিঠাইয়ের পরিবর্তে, সেই সখাটি তাঁর মুখে একটি ফুল গুঁজে দিলেন। সেই ফুলটি আস্বাদন করে কৃষ্ণ তাঁর মুখ বিকৃতি করলেন, এবং তা দেখে তাঁর সমস্ত সখারা উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন।

এক সময় এক জ্যোতিষী নন্দ মহারাজের গৃহে আসেন, এবং নন্দ মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে মহর্ষি! আপনি কি দয়া করে আমার শিশুপুত্র কৃষ্ণের হাতটি দেখবেন। আপনি দয়া করে বলুন সে কত বছর জীবিত থাকবে, এবং সে কি হাজার হাজার গাভীর মালিক হতে পারবে?" সেই কথা শুনে সেই জ্যোতিষীটি হাসতে শুরু করেন এবং নন্দ মহারাজ তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন,

"প্রভু! আপনি হাসছেন কেন? আর হাস্য সংবরণ করার জন্য আপনি আপনার মুখই বা আচ্ছাদিত করছেন কেন?"

এই হাস্যরসে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় হচ্ছে সেই হাসির কারণ। এই হাস্যরসে হর্ষ, আলস্য, গোপনতা আদি ব্যভিচারী ভাব দেখা যায়।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে দিব্য প্রেমভাব জনিত হাস্যরসকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। হাসির মাত্রা অনুসারে সেগুলি হচ্ছে—স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত অতিহসিত। এর মধ্যে স্মিত, হসিত ও বিহসিত হচ্ছে মুখ্য ভাগ এবং অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত হচ্ছে গৌণ ভাগ।

যে হাসিতে দাঁত দেখা যায় না এবং গালে স্পষ্টভাবে পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায়, তাকে বলা হয় স্মিত হাসি। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন ননী চুরি করছিলেন, তখন গৃহের প্রধানা দাসী জরাতি তা দেখে ফেলেন এবং কৃষ্ণকে ধরবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন। সেই সময় জরাতির ভয়ে ভীত হয়ে কৃষ্ণ তার প্রিয় সখা সুবলের শরণাপন্ন হন, তিনি তাঁকে বলেন, "ভাই সুবল! আমি ননী চুরি করেছি। তাই দেখ জরাতি আমাকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে!" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জরাতির ভয়ে সুবলের আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখে, স্বর্গলোকের সমস্ত মহর্ষিরা হাসতে লাগলেন। তাঁদের সেই হাসিকে স্মিত হাস্য বলা হয়েছে।

যে হাসিতে দাঁতগুলি অল্প দেখা যায়, তাকে বলা হয় হসিত হাসি। একদিন শ্রীমতী রাধারাণীর তথাকথিত পতি অভিমন্যু যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তিনি তাঁর গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অভিমন্যুর বেশ ধারণ করে অভিমন্যুর মাতা জটিলার কাছে গিয়ে বলেন, "মা! আমি হচ্ছি তোমার আসল পুত্র অভিমন্যু, কিন্তু দেখ, কৃষ্ণ ঠিক আমার মতো বেশ ধারণ করে এখানে আসছে!" অভিমন্যুর মা জটিলা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করলেন যে, কৃষ্ণই হচ্ছেন তাঁর আসল পুত্র এবং তার ফলে তাঁর আসল পুত্র অভিমন্যু, যিনি ঘরে আসছিলেন, তাঁর ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাঁর প্রকৃত পুত্রকে তিরস্কার সহকারে দূর করে দিতে লাগলেন, তিনি তখন বারবার তাঁকে বলছিলেন, "মা! মা! তুমি কি করছ?" সেই ঘটনা দেখে সেখানে উপস্থিত রাধারাণীর সমস্ত সখীরা হাসতে শুরু করলেন এবং তাঁদের দাঁত একটুখানি দেখা গেল। এটি হসিত হাস্যের একটি দৃষ্টান্ত।

যে হাসিতে স্পষ্টভাবে দাঁত দেখা যায়, তাকে বলা হয় বিহসিত হাস্য। একদিন শ্রীকৃষ্ণ জটিলার বাড়ি থেকে ননী ও দধি চুরি করার সময় তাঁর সখাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, "হে সখাগণ! সেই বৃদ্ধা এখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, কারণ

আমি তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এসো, আমরা নিঃশব্দে, খুব সাবধানে ননী ও দধি চুরি করি।" কিন্তু বৃদ্ধা জটিলা তখন ঘুমাচ্ছিলেন না; তাই তিনি তাঁর হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না, এবং তাঁর দন্তরাজি বিকশিত করে তিনি হেসে উঠলেন। এটি বিহসিত হাস্যের একটি দৃষ্টান্ত।

যে হাসিতে নাক ফুলে যায় এবং চোখ ছোট হয়ে যায়, সেই হাসিকে বলা হয় অবহসিত। একদিন খুব সকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসনৃত্য সমাপনান্তে ঘরে ফিরে আসছিলেন, মা যশোদা তখন কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে বলেন, "কৃষ্ণ! তোমার মুখে ধাতুরাগ লেগে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে কেন? আর তুমি বলদেবের নীল বসন পরে আছ কেন?" মা যশোদা যখন কৃষ্ণকে এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত এক গোপী হেসে উঠলেন এবং তাঁর নাক ফুলে উঠল এবং চোখ দুটি ছোট হয়ে গেল। এটি অবহসিত হাস্যের একটি দৃষ্টান্ত। সেই গোপিকাটি জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য উপভোগ করছিলেন এবং মা যশোদা তাঁর পুত্রের কার্যকলাপ জানতে পারেননি অথবা কিভাবে যে তাঁর মুখে গোপিকাদের অঙ্গরাগ লেগেছে, তা বুঝতে পারেননি।

যখন চোখের জল মুখের হাসির সঙ্গে মিলিত হয় এবং স্কন্ধ আন্দোলিত হয়, সেই হাসিকে বলা হয় অপহসিত। একদিন কৃষ্ণ যখন বৃদ্ধা দাসী জরাতির গানের সুরে নাচছিলেন, নারদ তখন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যান। পরমেশ্বর ভগবান, যিনি ব্রহ্মা আদি মহান দেবতাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি এখানে এক বৃদ্ধা দাসীর সঙ্কেত অনুসারে নাচছেন। সেই মজা দেখে নারদও নাচতে শুরু করেন, এবং তাঁর স্কন্ধদ্বয় আন্দোলিত হতে থাকে এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় নৃত্য করতে থাকে। তাঁর হাসির ফলে দন্তরাজি বিকশিত হয় এবং সেই দন্তরাজির জ্যোতিতে আকাশের মেঘগুলি রূপার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কেউ যখন হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে লাফাতে থাকে, সেই হাসিকে অতিহসিত বলা হয়। অতিহসিত হাস্যের দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ এক সময় মুখরাকে বলেন, 'হে ভদ্রে! তোমার মুখের ত্বক এখন ঝুলে পড়েছে। তাই তোমার মুখটি দেখতে এখন ঠিক একটি বাঁদরের মতো লাগছে। সেই হেতু বাঁদরের রাজা বলীমুখ তোমাকে তার সুযোগ্য জীবন-সঙ্গিনী রূপে বরণ করতে মনস্থ করেছে।" শ্রীকৃষ্ণ যখন মুখরাকে নিয়ে এইভাবে পরিহাস করছিলেন, তখন মুখরা উত্তর দেন যে, বাঁদরের রাজা যে তাঁকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছে, সেটি তিনি জানেন; কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই বহু বলবান অসুরহন্তা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি ইতিমধ্যেই বাঁদরের রাজার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করবেন বলে মনস্থ করেছেন। বাচাল মুখরার এই পরিহাস শুনে,

সেখানে উপস্থিত সমস্ত গোপবালিকারা হাততালি দিয়ে হাসতে শুরু করেন। করতালি মিশ্রিত এই হাসির নাম অতিহসিত।

কখনও কখনও পরোক্ষ ব্যঙ্গোক্তির ফলে অতিহসিত হাসি দেখা যায়। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, জটিলার কন্যা এবং রাধারাণীর তথাকথিত পতি অভিমন্যুর ভগিনী কুটিলার প্রতি জনৈকা গোপিকার মন্তব্য। পরোক্ষভাবে কুটিলাকে অপমান করে তিনি বলেন, "হে জটিলাপুত্রী কুটিলা! তোমার স্তনযুগল শিমের মতো শুষ্ক ও লম্বা। তোমার নাকটি এতই জাঁকালো যে, তা ব্যাঙের নাকের সৌন্দর্যকে লজ্জা দেয়। আর তোমার চোখদুটি বৃদ্ধা কচ্ছপের চোখের মতো। তোমার ওষ্ঠাধর জলন্ত কয়লার মতো সুন্দর আর তোমার পেটটি ঠিক একটি ঢাকের মতো সুন্দর। তাই হে সুন্দরী কুটিলা! তুমি বৃন্দাবনের সমস্ত গোপবালিকাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, আর তোমার এই অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিও তোমাকে আকর্ষণ করতে পারে না।" সেই কথা শুনে উপস্থিত সমস্ত ব্রজবালারা আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিয়ে হাসতে শুরু করেন। এটি অতিহসিত হাস্যের আর একটি দৃষ্টান্ত।

# ষড়চত্বারিংশতি অধ্যায়

# অদ্ভুত ও বীররস

## অদ্ভুত রস

অদ্ভুত ভক্তিরস অনুভূতি হয় দুভাবে—প্রত্যক্ষ বা স্বচক্ষে দর্শন দ্বারা, এবং অপ্রত্যক্ষ বা অন্যের কাছ থেকে শ্রবণের দ্বারা।

নারদ মুনি যখন ভগবানের লীলা দর্শন করার জন্য দ্বারকায় গিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে প্রতিটি প্রাসাদে বিরাজ করছেন এবং বিভিন্ন প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন লীলাবিলাসে রত রয়েছেন, তখন তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এটি প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে অদ্ভুত ভক্তিরসের একটি দৃষ্টান্ত। যশোদা মায়ের এক সখী তাঁকে বলেন, "হে যশোদে! দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই কৃষ্ণ একদিকে তোমার শিশুপুত্র, যে সব সময় তোমার স্তনপানে মগ্ন, আর সেই শিশুটি তার বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর গগনচুম্বী বিশাল গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছে, যেন সেটি একটি ছোট্ট খেলনা! এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!" এটি প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে অদ্ভুত ভক্তিরসের আর একটি দৃষ্টান্ত।

পরোক্ষভাবে অদ্ভুত ভক্তিরসের অনুভব মহারাজ পরীক্ষিতের হয়েছিল, যখন তিনি শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণের নরকাসুর বধের কাহিনী শ্রবণ করেন। নরকাসুর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। দশ লক্ষ নয় হাজার তিনশ পঞ্চাশ পদাতিক, ছয় লক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শ দশ অশ্ব, দুই লক্ষ এক হাজার আটশ সত্তর হস্তী এবং দুই লক্ষ এক হাজার আটশ সত্তর রথ নিয়ে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য হয়। নরকাসুরের সঙ্গে এই রকম একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, এবং তারা সকলেই সমবেতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবল তিনটি বাণ নিক্ষেপ করে তাদের সকলকে হত্যা করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এই অদ্ভুত বিজয়ের কথা শ্রবণ করেন, তখন তিনি আনন্দে অভিভূত হন এবং তাঁর নেত্রযুগল থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। এটি শ্রবণজনিত পরোক্ষ অদ্ভুত ভক্তিরসের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই পরমেশ্বর ভগবান কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা তাঁর গোপসখা ও গোবৎস চুরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এক নিমেষ পর ব্রহ্মা যখন ফিরে

তাকালেন, তখন তিনি দেখলেন যে, সমস্ত গোপসখা ও গোবৎস ঠিক পূর্বের মতোই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিরাজ করছেন। ব্রহ্মা যখন সত্যলোকে তাঁর পার্ষদদের সেই কথা বলেন, তখন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হন। ব্রহ্মা তাঁদের বলেন যে, কৃষ্ণসখা সমস্ত গোপবালকদের চুরি করে নিয়ে যাবার পর তিনি যখন ফিরে তাকালেন, তখন তিনি দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক আগের মতোই তাঁর সখাদের সঙ্গে খেলা করছেন। তাঁদের অঙ্গকান্তি শ্রীকৃষ্ণেরই মতো ঘনশ্যাম, এবং তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ। সমস্ত গোবৎসরাও সেখানে আগের মতোই বিরাজ করছিল। সেই ঘটনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রহ্মাও বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আর সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, অন্যান্য বহু ব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্যান্য অনেক ব্রহ্মারাও তখন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের উপাসনা করার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন।" পরোক্ষভাবে অদ্ভুত ভক্তিরসের এটি আর একটি দৃষ্টান্ত।

তেমনই, ভাণ্ডীর বনে যখন দাবানল জ্বলে ওঠে, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর সখাদের চোখ বন্ধ করতে বলেন, এবং তাঁরা সকলেই তা করেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই দাবাগ্নি নির্বাপিত করেন, তখন সমস্ত গোপবালকেরা চোখ খুলে দেখেন যে, তাঁরা বিপদমুক্ত হয়েছেন, এবং তাঁদের সমস্ত গাভী ও গোবৎসরাও নিরাপদে আছে। তখন কৃষ্ণ যে কিভাবে তাঁদের রক্ষা করেছেন, সেই কথা কেবল অনুমান করে তাঁরা বিস্ময়াভিভূত হন। এটি পরোক্ষভাবে অদ্ভুত ভক্তিরসের অনুভূতির একটি দৃষ্টান্ত।

প্রিয়জনের কার্যকলাপ যদি তেমন অসাধারণ নাও হয়, তবুও তা হৃদয়ে ও চিত্তে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু যে জন প্রিয় নয়, তার অতি অদ্ভুত কার্যকলাপও হৃদয়ে কোন রেখাপাত করে না। প্রীতির প্রভাবেই কেবল ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ হৃদয়ে রেখাপাত করে।

## বীররস

ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তির ফলে যখন হৃদয়ে এক শৌর্যশালী উৎসাহের উদয় হয়, তখন তাকে বলা হয় বীররস। তার অভিব্যক্তি খেলাচ্ছলে যুদ্ধ, দাক্ষিণ্য প্রদর্শন, দয়া প্রদর্শন ও ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের মাধ্যমে বীরত্ব প্রদর্শনকারীকে বলা হয় যুদ্ধবীর। দাক্ষিণ্য প্রদর্শনকারীকে বলা হয় দানবীর। দয়া প্রদর্শনকারীকে বলা হয় দয়াবীর, এবং ধর্ম-অনুষ্ঠানে উদারতা প্রদর্শনকারীকে বলা হয় ধর্মবীর। এই সমস্ত বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের অবলম্বন হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের কোন সখা যখন বীররসের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করতে চান, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিরোধীপক্ষ বলে মনে করে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন; অথবা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই যুদ্ধ দেখেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে অন্য কোন সখা বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এক সময় শ্রীকৃষ্ণের এক সখা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলেন, "হে মাধব! কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না বলে তুমি খুব গর্বে স্ফীত হয়েছ। কিন্তু তুমি যদি এখান থেকে পালিয়ে না যাও, তা হলে আমি তোমাকে দেখাব, কিভাবে আমি তোমাকে পরাজিত করতে পারি। তা দেখে আমার অন্য সমস্ত সখারা খুব আনন্দ লাভ করবে।"

কৃষ্ণ ও শ্রীদাম ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ সখা, কিন্তু তবুও ক্রোধবশে তিনি কৃষ্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলেন। তারপর তাঁরা যখন পরস্পরের সঙ্গে যমুনার তটে লড়াই করতে শুরু করেন, তখন অন্য সমস্ত সখারা এই দুই অন্তরঙ্গ সখার অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করে গভীর আনন্দ উপভোগ করেন। খেলাচ্ছলে যুদ্ধ করার জন্য তাঁরা ধনুর্বাণ বানিয়েছিলেন, এবং কৃষ্ণ শ্রীদামের উপর বাণ বর্ষণ করতে থাকেন, আর শ্রীদাম তাঁর লাঠি ঘুরিয়ে সেই বাণগুলি প্রতিহত করতে থাকেন। শ্রীদামের এই বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সাধারণত বীরপুরুষদের মধ্যে এই ধরনের খেলাচ্ছলে যুদ্ধ হয়, যার ফলে দর্শকদের চিত্তে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

*হরিবংশে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কখনও কখনও কুন্তীদেবীর সামনে লড়াই করতেন, এবং অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরাস্ত হতেন।

সখাদের মধ্যে এই ধরনের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে কখনও কখনও আত্মশ্লাঘা, আত্মপ্রসাদ, গর্ব, বল, অস্ত্রগ্রহণ, যুদ্ধে আহ্বান ও পাঁয়তারা করা হয়। এই সমস্ত বীররসের উদ্দীপন।

শ্রীকৃষ্ণের এক সখা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলেন, "হে সখে দামোদর! তুমি কেবল আহারেই পারদর্শী। সুবলকে তুমি পরাজিত করতে পেরেছ, কেন না সে তো একে দুর্বল এবং তার ওপর তুমি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলে। এইভাবে নিজেকে এক মস্ত বড় বীর বলে জাহির করার চেষ্টা করো না। তোমার বিশাল বাহুরূপ সর্পের দর্পহারী এই স্তোককৃষ্ণরূপ ময়ূর গম্ভীর শব্দ সহকারে মত্ত হয়ে নৃত্য করছে।"

সখাদের মধ্যে এই ধরনের যুদ্ধে, এই রকমের আত্মশ্লাঘাকে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা অনুভাব বলে বর্ণনা করেছেন। গর্জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান, পাঁয়তারা কষা, উৎসাহ ও ভীত দর্শকদের আশ্বাস প্রদান—এগুলি হচ্ছে বীররসের অনুভাব।

শ্রীকৃষ্ণের এক সখা তাঁকে বলেন, "হে মধুসূদন! আমার পরাক্রম সম্বন্ধে তুমি ভালভাবেই অবগত আছ, কিন্তু তবুও তুমি বলবান বলদেবকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করার জন্য ভদ্রসেনকে অনুপ্রাণিত করছ, আমাকে নয়। এইভাবে তুমি কেবল আমাকে অপমান করছ, কেন না আমার বাহুদ্বয় দুয়ারের অর্গলের মতো শক্তিশালী!"

এক সময় এক ভক্ত বলেন, "হে কৃষ্ণ! বজ্রের মতো ও সিংহের মতো গর্জন করে তোমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানকারী শ্রীদামের জয় হোক! শ্রীদামের বীরত্বের জয় হোক!" যুদ্ধ, দান, দয়া এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় বীররসের কার্যকলাপকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়; আর গর্ব, ভাবুকতা, সহনশীলতা, কোমলতা, নিষ্ঠা, হর্ষ, উৎসাহ, অমর্ষ ও স্মৃতিকে ব্যাভিচারী ভাব বলা হয়। স্তোককৃষ্ণ নামক শ্রীকৃষ্ণের এক সখা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তখন সমস্ত ব্রজবাসীদের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। সেই তিরস্কারের ফলে স্তোককৃষ্ণ নিরস্ত হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে থাকেন, তখন স্তোককৃষ্ণ তাঁর লাঠি নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

এক সময় শ্রীদাম ভদ্রসেনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলেন, "হে সখে! এখনই আমাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। প্রথমে আমি আমাদের প্রিয় ভ্রাতা বলরামকে পরাস্ত করব, তারপর আমি কৃষ্ণকে পরাস্ত করব, এবং তারপর আমি তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করব।" ভদ্রসেন তখন বলরামের দল ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের দলে যোগ দেন। তার ফলে মন্দর পর্বত যেভাবে সমুদ্রকে উদ্বেলিত করেছিল, তাঁর সখাদের তিনি সেইভাবে উদ্বেলিত করেছিলেন। তাঁর গর্জনের শব্দে তাঁর সখাদের কানে তালা লেগেছিল, এবং তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করেছিলেন।

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত সখাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলেন, "হে সখাগণ! দেখ প্রচণ্ড বীরত্বে অধীর হয়ে আমি স্থির থাকতে পারছি না, এখন দয়া করে তোমরা পালিয়ে যেও না।" তাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনে, বরূথপ নামক এক সখা তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করেন।

এক সখা এক সময় মন্তব্য করেন, "দামোদরকে পরাজিত করবার জন্য সুদামা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, আর আমার মনে হয় শক্তিশালী সুবল যদি তার সঙ্গে যোগ দেয়, তা হলে তা স্বর্ণালঙ্কারে বসানো রত্নের মতো এক অতি সুন্দর জোড় হবে।"

এই ধরনের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সখারাই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা কখনই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের সখাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানকে বীর ভক্তিরস বলা হয়।

দানবীর দুই প্রকারের—উদার ও ত্যাগী। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় উদার। যখন কেউ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে সেই উদারতার উদ্দীপক বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন নন্দ মহারাজ শুদ্ধভাবে তাঁর পুত্রের মঙ্গলের জন্য বহু মূল্যবান সমস্ত গাভী ব্রাহ্মণদের দান করতে থাকেন। এই দানক্রিয়ায় ব্রাহ্মণেরা এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, তাঁর এই দান মহারাজ পৃথু ও মহারাজ নৃগ আদি পূর্ববর্তী রাজাদের দানকেও অতিক্রম করেছে।

কেউ যখন ভগবানের মহিমা পূর্ণরূপে অবগত হয়ে, ভগবানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হন, তখন তাঁকে বলা হয় সম্প্রদানক।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হন, তখন মনে মনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চন্দন লেপন করেন, আজানুলম্বিত মালায় তাঁকে ভূষিত করেন, স্বর্ণখচিত বসন তাঁকে দান করেন, নানা রকম মূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কার দান করেন এবং পূর্ণরূপে মণি-রত্নভূষিত বহু হস্তী, রথ ও অশ্ব তাঁকে দান করেন। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রাজ্য, তাঁর পরিবার দান করতে বাসনা করেন এবং অবশেষে নিজেকে পর্যন্ত তাঁর চরণে উৎসর্গ করেন। এইভাবে বাসনা করার পর যখন আর দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন।

তেমনই, বলী মহারাজ এক সময় তাঁর পুরোহিত শুক্রাচার্যকে বলেন, "হে ঋষি! আপনি বৈদিক জ্ঞানে পূর্ণরূপে নিস্নাত এবং তাই বৈদিক বিধান অনুসারে আপনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন। এই খর্বকায় ব্রাহ্মণ (বামন অবতার) যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণু, একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ অথবা এমন কি আমার শত্রুও হোন, তিনি যে ভূমি আমার কাছে ভিক্ষা করেছেন, তা আমি তাঁকে দিতে মনস্থ করেছি।" মহারাজ বলী এতই ভাগ্যবান ছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান লক্ষ্মীদেবীর বক্ষের কুমকুমে আরক্তিম তাঁর হস্তদ্বয় প্রসারিত করে তাঁর কাছে দানভিক্ষা করেছিলেন। অর্থাৎ সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর যাঁর আনন্দ-বিধানে তৎপর, সেই পরমেশ্বর ভগবান বলী মহারাজের কাছ থেকে দান গ্রহণ করার জন্য তাঁর হস্ত প্রসারিত করেছিলেন।

যিনি কোন কিছু প্রত্যাশা না করে শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছু দান করেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ত্যাগী। তাই ভগবান যদি ভক্তকে মুক্তিও দান করতে চান, ভক্ত তা গ্রহণ করতে চান না। যথার্থ কৃষ্ণপ্রেম তখনই প্রকাশিত হয়, যখন শ্রীকৃষ্ণ হন গ্রহীতা আর ভক্ত হন দাতা।

*হরিভক্তি-সুধোদয়ে* ধ্রুব মহারাজ সম্বন্ধেও আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি সেখানে বলেছেন, "হে প্রভু! আমি আপনার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন অনুশীলন করছিলাম, কিন্তু তার বিনিময়ে আপনি আমাকে মহাত্মা মহর্ষিদেরও দৃষ্টির অগোচর আপনার যে রূপ, সেই রূপে দর্শন দান করেছেন। আমি কতকগুলি ভাঙা কাঁচের টুকরো খুঁজছিলাম, কিন্তু তার পরিবর্তে আমি সব চাইতে মূল্যবান রত্ন খুঁজে পেয়েছি। তাই, হে ভগবান! আমি এখন পূর্ণরূপে তৃপ্ত। আমি আপনার কাছ থেকে আর কিছুই আশা করি না।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/১৫/৪৮) এই রকম একটি বর্ণনা রয়েছে। সনক আদি চারজন মহর্ষি ভগবানকে সম্বোধন করে বলেন, "হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার নির্মল কীর্তি অত্যন্ত আকর্ষক, তাই আপনার মহিমাই কেবল কীর্তনের যোগ্য এবং প্রকৃতপক্ষে আপনিই হচ্ছেন সমস্ত তীর্থের মূল আধার। যে সমস্ত সৌভাগ্যশালী পুরুষ আপনার মহিমা কীর্তন করেন এবং যথাযথভাবে আপনার দিব্য স্বরূপ সম্বন্ধে জানেন, তাঁরা আপনার দেওয়া মুক্তি পর্যন্ত গ্রহণ করতে চান না। কারণ তাঁরা দিব্যভাবে এতই ঐশ্বর্যশালী যে, তাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রের পদ পর্যন্ত গ্রহণ করতে চান না। তাঁরা জানেন যে, দেবরাজ ইন্দ্রের পদও ভয়জনক, কিন্তু যাঁরা আপনার দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তনে রত, তাঁরা সব রকম বিপদের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে কেবল দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। এই ধরনের পুরুষেরা কেনই বা দেবরাজ ইন্দ্রের পদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন?

মহারাজ ময়ূরধ্বজের দানশীলতা সম্বন্ধে এক ভক্ত তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছেন—"যাঁর দানশীলতার বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব, সেই মহারাজ ময়ূরধ্বজকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" ময়ূরধ্বজ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, একজন ব্রাহ্মণের বেশে শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর কাছে এসেছিলেন। ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর পত্নী ও পুত্র যেন একটি করাত দিয়ে তাঁর দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং এইভাবে তাঁর খণ্ডিত দেহের অর্ধাংশ তিনি তাঁর কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। মহারাজ ময়ূরধ্বজ তাতে সম্মত হয়েছিলেন। ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ফলেই মহারাজ ময়ূরধ্বজ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এবং যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসেছেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর দেহের অর্ধাংশ নিবেদন করতে ইতস্তত করেননি। শ্রীকৃষ্ণের চরণে মহারাজ ময়ূরধ্বজের এই নিবেদন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণভক্তি সহকারে তাঁর প্রতি আমাদের প্রণতি

নিবেদন করা। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান তাঁর ছিল এবং তিনিই হচ্ছেন যথার্থ দানবীর।

যে মানুষ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানে তৎপর এবং যিনি নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে আগ্রহী, তাঁকে বলা হয় ধর্মবীর। ধর্ম অনুষ্ঠানে রত উত্তম ভক্তরাই কেবল ধর্মবীর পদবাচ্য হতে পারেন। প্রামাণিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, নীতি অনুশীলন, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, সহনশীলতা ও ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা ধর্মবীর হওয়া যায়। যে সমস্ত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁরাই ভগবদ্ভক্তিতে স্থির থাকেন, কিন্তু যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্ম-অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা হচ্ছেন কেবল পুণ্যবান।

ধর্মবীরের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মহারাজ যুধিষ্ঠির। এক ভক্ত এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ! হে অসুরহন্তা! মহারাজ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব রকমের যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করেছেন। সেই সমস্ত যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করবার জন্য তিনি সর্বদাই ইন্দ্রকে আহ্বান করেছেন। এইভাবে প্রায় স্বর্গ থেকে ইন্দ্রের অনুপস্থিতি থাকার জন্য শচীদেবীকে প্রায়ই ইন্দ্রবিরহে করতলে মাথা রেখে কাল যাপন করতে হত।"

দেবতাদের জন্য নানান যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করাকে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গের আরাধনা করা বলেই বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ, এবং তাই তাঁদের আরাধনা করার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গের উপাসনা করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোন রকম জাগতিক কামনা-বাসনা ছিল না; তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনায় সমস্ত যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করতেন এবং তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু পাওয়ার বাসনা তাঁর ছিল না। তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা এবং তাই তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে গণ্য করা হয়। তিনি সর্বদাই ভগবদ্ভক্তির সাগরে নিমগ্ন থাকতেন।

## সপ্তচত্বারিংশতি অধ্যায়

# করুণ ও রৌদ্র ভক্তিরস

### করুণ ভক্তিরস

যখন ভগবদ্ভক্তির ফলে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন প্রকার শোকের উৎপত্তি হয়, তাকে করুণ ভক্তিরস বলা হয়। এই ভক্তিরসের উদ্দীপন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী, রূপ ও কার্যকলাপ। এই ভক্তিভাবের ফলে কখনও কখনও অনুশোচনা, দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন, ভূমিতে পতন ও বুক চাপড়ানো আদি অনুভব দেখা যায়। কখনও কখনও আলস্য, নির্বেদ, অপযশ, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, গ্লানি, উৎসুকতা, চপলতা, উন্মাদনা, মৃত্যু, বিস্মৃতি, ব্যাধি ও মোহ প্রকাশ পায়। যখন ভক্তহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কা হয়, তাকে বলা হয় শোকজনিত ভগবদ্ভক্তি। এই ধরনের শোক করুণ ভক্তিরসের অন্য একটি লক্ষণ।

*শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/১৬/১০) বর্ণনা করা হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনার জলে কালীয়কে দণ্ড দিচ্ছেন, তখন সেই বিশাল সর্পের বেষ্টনে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শরীর বেষ্টিত দেখে তাঁর সমস্ত গোপসখারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। শোক, সন্তাপ ও ভয়ের ফলে তাঁরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং ভূমিতে পতিত হন। মোহের বশে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কোন বিপদ হতে পারে, তাই তাঁদের এই লক্ষণ মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। তাঁরা তাঁদের সখ্য, তাঁদের কামনা-বাসনা, তাঁদের সর্বস্ব, এমন কি তাঁদের আত্মা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়ের উপস্থিতির ফলে ভয়ঙ্করভাবে বিষাক্ত যমুনার জলে প্রবেশ করেন, তখন মা যশোদা নানা প্রকার বিপদ আশঙ্কা করছিলেন, এবং তিনি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। তাঁর নেত্র-বিগলিত অশ্রুধারায় তাঁর বসন সিক্ত হয়েছিল এবং তিনি প্রায় মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন।

তেমনই, শঙ্খাসুর যখন একে একে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের আক্রমণ করছিল, তখন বলদেবের অঙ্গকান্তি নীলাভ হয়ে গিয়েছিল।

*হংসদূত* নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনাটির বর্ণনা করা হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন অন্বেষণ করার জন্য গোপিকারা হংসদূতকে অনুরোধ করেছিলেন এবং

ব্রহ্মা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের গোপসখাদের চুরি করার পর তাঁর মস্তকে তা ধারণ করেছিলেন, সেইভাবে সেই চরণচিহ্ন তার মস্তকে সে যেন ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করার ফলে অনুতপ্ত হয়ে, ব্রহ্মা তাঁকে নতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর মস্তকের মুকুট শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের দ্বারা ভূষিত হয়েছিল। গোপীরা হংসদূতকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, দেবর্ষি নারদের মতো মহাত্মারাও শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং কখনও কখনও মুক্ত মহর্ষিরাও সেই চরণচিহ্ন দর্শন করার জন্য লালায়িত হন। তাঁরা বলেছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন পাবার জন্য তাই, গভীর উৎসাহপূর্বক তোমার অন্বেষণ করা উচিত।" এটি করুণ ভক্তিরসের একটি দৃষ্টান্ত।

আর একটি দৃষ্টান্তে দেখা যায়, এক সময় যখন নকুলের অনুজ সহদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় চরণচিহ্ন দর্শন করেন, তখন তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, "মাতা মাদ্রী! আপনি এখন কোথায়? পিতা পাণ্ডু! আপনি এখন কোথায়? অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কৃষ্ণের সেই চরণচিহ্ন দর্শন করার জন্য আপনারা এখানে নেই!" এটি করুণ ভক্তিরসের আর একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে দৃঢ় রতিরহিত ভক্তিতেও স্মিতহাস্য আদি লক্ষণ দেখা যেতে পারে, কিন্তু করুণ ভক্তিরসের শোকভাব কখনও প্রকাশ পেতে পারে না। এই করুণ রতির মূল তত্ত্ব হচ্ছে দিব্য প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রিয় মহিষীদের বিপদের আশঙ্কা, যা বলদেব ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই আশঙ্কার কারণ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির প্রতি অজ্ঞানতা নয়, তার কারণ হচ্ছে তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগ। শ্রীকৃষ্ণের বিপদের আশঙ্কা প্রথমে শোকরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে তা করুণ ভক্তিরসে বিকশিত হয়ে অন্য দিকে প্রবাহিত হয় এবং অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে।

## রৌদ্র ভক্তিরস

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রৌদ্র ভক্তিরসে সর্বদা কৃষ্ণই হচ্ছেন বিষয়। *বিদগ্ধমাধবে* (২/৩৭) ললিতা গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীমতী রাধারাণীকে বলেন, "হে সখী! আমার অন্তরের বাসনাগুলি কলুষিত হয়েছে। তাই আমি যমালয়ে যাব। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে যে, তোমাকে ছলনা করে কৃষ্ণের মুখের হাসি এখনও মিলিয়ে যায়নি। আমি বুঝতে পারি না, তুমি তোমার সমস্ত প্রেম কেন এই কামুক গোপ-যুবককে অর্পণ করেছ।"

শ্রীকৃষ্ণকে দেখে জরাতি এক সময় বলেন, "ওরে ও যুবতীদের সম্পদচোর! আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, আমার পুত্রবধূর ওড়না তোর গায়ে।" তারপর

তিনি চিৎকার করে ব্রজবাসীদের সম্বোধন করে বলতে থাকেন, "দেখ! নন্দ মহারাজের পুত্র আমার পুত্রবধূর গৃহস্থালিতে আগুন লাগাচ্ছে।"

দামোদরের উদূখলের আকর্ষণে ভূপতিত অর্জুন বৃক্ষদুটিকে দেখে রোহিণী দেবীও কৃষ্ণপ্রেম জনিত এই রকম ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। সমস্ত প্রতিবেশীরা তখন সেই দুর্ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। রোহিণী দেবী তখন মা যশোদাকে তিরস্কার করে বলেন, "তোমার ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে শিক্ষা দিতে তো তুমি খুবই দক্ষ, কিন্তু তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তোমার পুত্র কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রয়েছে? বৃক্ষদুটি ভূপতিত হয়েছে, আর ও সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!" মা যশোদার প্রতি রোহিণী দেবীর এই ক্রোধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জনিত রৌদ্র ভক্তিরসের একটি দৃষ্টান্ত।

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে গোচারণভূমিতে বিচরণ করছিলেন, তখন তাঁর কয়েকজন সখা তাঁকে তালবনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, যেখানে গর্দভরূপী ধেনুকাসুর বাস করত। শ্রীকৃষ্ণের সখারা সেই বনের বৃক্ষের ফল খেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই অসুরের ভয়ে তাঁরা সেখানে যেতে পারছিলেন না। তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন ধেনুকাসুরকে বধ করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তারপর তাঁরা যখন গৃহে ফিরে যান, তখন মা যশোদা সেই ঘটনা শুনে শ্রীকৃষ্ণকে একলা সেই ভয়ঙ্কর তালবনে পাঠাবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন এবং তিনি ক্রুদ্ধভাবে তাঁদের দিকে তাকান।

রাধারাণীর এক সখীর ক্রোধেরও আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাধারাণী যখন কৃষ্ণের ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণীর এই অসন্তোষের ফলে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত দুঃখ হয়েছিল এবং ক্ষমাভিক্ষা করে তিনি তাঁর চরণকমলে পতিত হন। তা সত্ত্বেও রাধারাণীর মান ভাঙ্গেনি এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলেননি। সেই সময় রাধারাণীর এক সখী তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, "হে সখী! অতৃপ্তির মন্থনদণ্ড দিয়ে তুমি নিজেকে মন্থন করছ, সুতরাং আমি আর তোমাকে কি বলতে পারি? আমি কেবল তোমাকে এই উপদেশই দিতে পারি যে, তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে এখন নিয়ে এস। কারণ তোমার এই দুর্ব্যবহার আমাকে অত্যন্ত বেদনা দিচ্ছে। আমি তোমার এই দুর্ব্যবহার সহ্য করতে পারছি না, কেন না শ্রীকৃষ্ণের শিখীপুচ্ছ যদিও তোমার চরণ স্পর্শ করেছে, তবুও তোমার মুখ এখনও ক্রোধে আরক্তিম হয়ে আছে।"

উপরোক্ত ভগবদ্ভক্তি জনিত অসন্তোষ ও ক্রোধের এই ভাবকে বলা হয় ঈর্ষ্যু।

অক্রূর যখন বৃন্দাবন থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন কয়েকজন বয়স্কা গোপিকা তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, "হে গান্দিনীনন্দন! তোমার নিষ্ঠুরতা যদুবংশে কলঙ্ক লেপন করছে। কৃষ্ণের বিরহে এক করুণ অবস্থায় আমাদের ফেলে তুমি তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছ। তুমি কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার আগেই, এখনই সমস্ত গোপিকাদের প্রাণবায়ু প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে।"

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করে, তখন পিতামহ ভীষ্মসহ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সেই সময় মহাক্রোধে ভীম বলেন, "শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর পায়ের নখ *বেদের* কর্ণধারদের মণিরত্ন-খচিত মুকুটের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। কেউ যদি তাঁর অপমান করে, তার হয়ে একজন পাণ্ডবরূপে আমি ঘোষণা করছি যে, আমি আমার বাঁ-পা দিয়ে তার মাথায় পদাঘাত করব এবং যমদণ্ড-সদৃশ আমার সেই পদাঘাতে তাকে যথার্থ শিক্ষা দেব!" এটি কৃষ্ণপ্রেম জনিত ক্রোধের একটি দৃষ্টান্ত।

এই ধরনের দিব্য ক্রোধে কখনও কখনও তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত ও অপমানসূচক উক্তি প্রকাশ পায়। হাত কচলানো, দাঁত কিড়মিড় করা, ঠোঁট কামড়ানো, ভ্রূ কোঁচকানো, হাত চুলকানো, মস্তক অবনত করা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া, কঠোর বচন, মাথা নাড়ানো, চোখের কোণ হলুদ হয়ে যাওয়া ও ওষ্ঠাধরে কম্পন—এই সমস্ত লক্ষণগুলিও কখনও কখনও দেখা যায়। কখনও কখনও চোখ আরক্তিম হয় এবং কখনও বা তা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কখনও তিরস্কার, আবার কখনও বা নীরবতা প্রকাশ পায়। ক্রোধের এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী, অর্থাৎ স্থায়ী ও অস্থায়ী লক্ষণ। কখনও কখনও গভীর আবেগ, হতবুদ্ধি, গর্ব, নৈরাশ্য, মোহ, দুর্বলতা, ঈর্ষা, নিপুণতা, অবহেলা, শ্রম আদি ব্যভিচারী ভাব দেখা যায়।

রৌদ্ররস হচ্ছে দিব্য প্রেমের এই সমস্ত লক্ষণের স্থায়িভাব।

জরাসন্ধ যখন ক্রোধান্ধ হয়ে মথুরা নগরী আক্রমণ করে, তখন সে ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকায়। সেই সময় বলরাম তাঁর হল ধারণ করে ক্রোধরঞ্জিত চক্ষে জরাসন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

*বিদগ্ধমাধবে* বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীমতী রাধারাণীর শ্বশ্রূমাতা জটিলা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য রাধারাণীকে তিরস্কার করেন, তখন ক্রোধভরে রাধারাণী বলেন, "মা! আমি তোমাকে কি বলব? কৃষ্ণ এতই নিষ্ঠুর যে, সে প্রায়ই পথের মাঝে আমাকে আক্রমণ করে, এবং আমি যদি তখন চীৎকার করার চেষ্টা করি, তখন সেই শিখীপুচ্ছধারী বালক আমার মুখ ঢেকে দেয়, যাতে

আমি চীৎকার করতে না পারি। আর আমি যদি তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে সেখান থেকে চলে যেতে চাই, তখন সে দুহাত বাড়িয়ে আমার পথরোধ করে। আমি যখন রোষবশত অধর দংশন করি, তখন সে বারবার আমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়। মা আমার অবস্থাটি একটু বোঝবার চেষ্টা কর, এবং অনর্থক আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না। পক্ষান্তরে, দয়া করে আমাকে বল, কৃষ্ণের এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ থেকে আমি কিভাবে নিজেকে রক্ষা করব!"

কখনও কখনও সমবয়সীদের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম জনিত ক্রোধ প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এই ধরনের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে জটিলা ও মুখরার ঝগড়া। জটিলা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর শাশুড়ী এবং মুখরা হচ্ছেন তাঁর মাতামহী। যাতায়াতের পথে কৃষ্ণ যে অনর্থক রাধারাণীকে উত্ত্যক্ত করেন, সেই বিষয়ে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। জটিলা বলেন, "নিষ্ঠুরমুখী মুখরা! তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, যেন আমার হৃদয় আগুনের তাপে পুড়ে যাচ্ছে!" আর মুখরা তার উত্তরে বলেন, "ওরে পাপিষ্ঠা জটিলা! তোমার কথা শুনে আমার মাথা ব্যথা করছে! আমার দৌহিত্রী কীর্তিদার কন্যা রাধারাণীকে যে গিরিধারী স্পর্শ করেছে, তার কোন প্রমাণ তুমি দিতে পারনি।"

এক সময় শ্রীমতী রাধারাণী যখন শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া রত্নহার খুলে রাখছিলেন, তখন তাঁর শাশুড়ী জটিলা তাঁর এক সখীকে বলেন, "হে সখী! দেখ, কৃষ্ণ রাধারাণীকে কি সুন্দর একটা রত্নহার উপহার দিয়েছে। সেটি এখনও তার হাতে রয়েছে, অথচ সে আমাদের বোঝাতে চাইছে যে, কৃষ্ণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এই মেয়েটির কার্যকলাপে আমাদের সমস্ত কুল কলঙ্কিত হয়েছে!"

শিশুপালের মতো ব্যক্তিদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক ঈর্ষা, তা কখনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রৌদ্ররস জনিত প্রেম বলে স্বীকার করা যায় না।

# অষ্টচত্বারিংশতি অধ্যায়

# ভয়ানক ও বীভৎস ভক্তিরস

## ভয়ানক ভক্তিরস

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভয়ানক ভক্তিরসের দুটি কারণ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, অথবা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে কোন ভীতিজনক পরিস্থিতি। কোন ভক্ত যখন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অপরাধী বলে মনে করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভয়ানক ভক্তিরসের আলম্বন হন। যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের বশে তাঁর সখা অথবা সুহৃৎ তাঁর জন্য কোন ভয়ের আশঙ্কা করেন, তখন সেই অবস্থাটি ভয়ের আলম্বন হয়।

যখন ঋক্ষরাজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তখন অকস্মাৎ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেন, "হে ঋক্ষরাজ! তোমার মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? আমাকে ভয় পেয়ো না। এইভাবে তোমার হৃৎকম্প হওয়ার কোন কারণ নেই। তুমি নির্ভয় হও। তোমার প্রতি আমার কোন রাগ নেই। তবে তুমি আমার ওপর যত ইচ্ছা রাগ করতে পার—কেন না তার ফলে তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করে আমার প্রতি তোমার সেবাভাব বর্ধিত করবে।" কৃষ্ণভক্তি রসের এই ভয়ানক অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভয়ানক রসের আলম্বন।

শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ভয়ের বিষয়, সেই রকম একটি ভয়ানক অবস্থার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যমুনার জলে বালকৃষ্ণের দ্বারা উপযুক্তভাবে দণ্ডিত হয়ে কালীয় সর্প ভগবানকে বলেন, "হে মুরারে! কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে আমি নানা রকম যোগসিদ্ধি লাভ করেছি, কিন্তু আপনার সামনে আমি কিছুই নই; আমি সব চাইতে নগণ্য। তাই দয়া করে আমার মতো দীন জীবের প্রতি কৃপা করুন এবং আমার প্রতি আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন। আমি আপনার যথার্থ স্বরূপ জানতে পারিনি এবং তাই অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে আমি ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছি। কৃপা করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা, অজ্ঞান জীব। দয়া করে আপনি আমাকে কৃপা করুন।" এটি ভয়ানক ভক্তিরসের আর একটি দৃষ্টান্ত।

কেশী দানব এমন একটি বড় অশ্বের রূপ ধারণ করেছিল যে, সে গাছের উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারত। সেই রূপ নিয়ে সে যখন বৃন্দাবনে উৎপাত

করতে শুরু করে, তখন মা যশোদা তাঁর পতি নন্দ মহারাজকে বলেন, "আমাদের পুত্রটি অত্যন্ত চঞ্চল, তাই ওকে বাড়িতে বন্ধ করে রাখাই ভাল। ইদানীং আমি বিশাল অশ্বের রূপধারী কেশী দানবের উৎপাতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি।" মা যশোদা যখন জানতে পেরেছিলেন, সেই দানবটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গোকুলে প্রবেশ করেছে, তখন তাঁর শিশুপুত্রকে রক্ষা করার জন্য তিনি এতই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভয়ানক কোন কিছু দর্শন অথবা শ্রবণজনিত ভয়ানক ভক্তিরসের এটি একটি দৃষ্টান্ত।

পূতনা রাক্ষসীর মৃত্যুর পর যশোদা মায়ের কয়েকজন সখী তাঁকে সেই ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। মা যশোদা তখনই তাঁর সখীদের বলেন, "তোমরা চুপ কর! তোমরা চুপ কর! পূতনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। সেই ঘটনার কথা মনে করলেই ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। পূতনা রাক্ষসী আমার পুত্রকে খেতে এসেছিল, আর সে আমাকে ছলনা করে আমার শিশুটিকে তার কোলে তুলে নিয়েছিল। তারপর সে মরে পড়ে যায়, যার ফলে তার বিশালকায় শরীর থেকে ভয়ানক শব্দ হয়েছিল।"

ভয়ানক ভক্তিরসের অনুভাব হচ্ছে—মুখ শুকিয়ে যাওয়া, উচ্ছ্বাস, পিছন ফিরে দেখা, লুকিয়ে পড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়া, প্রেমাস্পদের অন্বেষণ করা এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করা। অন্য কয়েকটি ব্যভিচারী ভাব হচ্ছে—মোহ, বিস্মৃতি, ভয়ের আশঙ্কা ইত্যাদি। এই সবের মধ্যে ভয়ানক হচ্ছে স্থায়িভাব। এই ভয়ের কারণ হচ্ছে অপরাধ অথবা ভয়ানক পরিস্থিতি। অপরাধ নানা প্রকার হতে পারে এবং যে অপরাধ করে, তার চিত্তে ভয়ের উদয় হয়। কোন ভীতিজনক বস্তু, বিশেষত কোন ব্যক্তি থেকে যখন ভয় হয়, সেই ভয়ানক ব্যক্তিটির আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রভাব সাধারণত ভয়ানক হয়। ভয়ানক রতির উদ্রেককারী দৃষ্টান্ত হচ্ছে পূতনা রাক্ষসী। ভয়ানক রতির কারণ কংস আদি দুর্বৃত্ত অসুর হতে পারে, এবং ইন্দ্র অথবা শঙ্কর আদি শক্তিশালী দেবতাও হতে পারে।

কংসের মতো অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত ছিল, কিন্তু তাদের সেই অনুভূতিকে ভয়ানক ভক্তিরসের অন্তর্গত বলে বিবেচনা করা যায় না।

## বীভৎস ভক্তিরস

প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরক্তির অনুভূতির ফলে বীভৎস রতিজনিত কৃষ্ণভক্তি কখনও কখনও প্রকট হয়। এই প্রকার কৃষ্ণভক্তি রসের অনুভবকারী মানুষ সাধারণত শান্তরসে অবস্থিত থাকেন। বীভৎস

ভক্তিরসের একটি বর্ণনা হচ্ছে—"এই মানুষটি পূর্বে কামক্রীড়া ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাপারেই কেবল পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল। তার কামবিকার পূর্তির জন্য সে স্ত্রীলোকদের প্রবঞ্চনার কাজে খুব পারদর্শিতা লাভ করেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়, সেই মানুষটি এখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করছে। এখন যখন সে কোন স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করে, তৎক্ষণাৎ সে বিরক্ত হয়। তার মুখ দেখে বোঝা যায় যে, এখন সে স্ত্রীসঙ্গকে ঘৃণা করে।"

ভক্তির এই বীভৎস রসের কয়েকটি অনুভাবের লক্ষণ হচ্ছে, পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করে থুথু ফেলা, মুখ বিকৃত করা, নাক ঢাকা ও হাত ধোয়া। আর তা ছাড়া দেহে কম্পন, জোর করে আড়মোড়া দেওয়া ও ঘামা—এই লক্ষণগুলিও দেখা যায়। অন্য কয়েকটি লক্ষণ হচ্ছে গ্লানি, শ্রম, উন্মাদনা, মোহ, নৈরাশ্য, বিনয়, চঞ্চলতা, ঔৎসুক্য ও জাড্য।

কোন ভক্ত যখন তাঁর পূর্ব জীবনের জঘন্য কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা করেন, তখন তাঁর দেহে বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় এবং তাঁর সেই ভাবকে বীভৎস ভক্তিরস বলা হয়। হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্মেষের জন্য তা হয়।

এই সম্পর্কে কথিত আছে, "কোন মানুষ কিভাবে এই শরীরটির মাধ্যমে মৈথুনসুখ উপভোগ করতে পারে, যে শরীর অস্থি-চর্ম রচিত একটি থলিসদৃশ এবং চর্মনির্মিত সেই শরীরে রয়েছে রক্ত ও মাংস, যা থেকে কফ ও দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়?" যার হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনার উন্মেষ হয়েছে এবং যিনি এই জড় শরীরের ঘৃণ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন, তিনিই কেবল এইভাবে অনুভব করতে পারেন।

এক সৌভাগ্যশালী শিশু তাঁর মাতৃজঠরে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করে বলেন, "হে কংসারি! এই প্রাকৃত দেহটির জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করছি। এখন আমি আমার মাতৃগর্ভে রক্ত, মূত্র ও মলের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। এই দুরবস্থার মধ্যে আমি অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করছি। তাই হে কৃপাসিন্ধু! আমাকে কৃপা করুন। ভক্তিভরে আপনার সেবায় যুক্ত হওয়ার কোন যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু কৃপা করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন!" নারকীয় জীবনে অধঃপতিত এক ব্যক্তিও এইভাবে প্রার্থনা করেছেন। পরমেশ্বর ভগবানকে তিনি বলেন, "হে প্রভু! অত্যন্ত নোংরা ও পূতিগন্ধপূর্ণ এই অবস্থায় যমরাজ আমাকে প্রেরণ করেছেন। নানা রকম কীট-পতঙ্গপূর্ণ বিভিন্ন রোগগ্রস্ত মানুষদের মলের মধ্যে আমি পড়ে আছি। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমার চোখে ঘা হয়েছে এবং আমি প্রায় অন্ধ হয়ে পড়েছি। তাই আমি প্রার্থনা করি, হে প্রভু! হে নারকীয় পরিবেশ থেকে জীবকে উদ্ধারকারী! আমি এই নরকে পতিত হয়েছি, তবুও আমি

নিরন্তর আপনার দিব্য নাম স্মরণ করার চেষ্টা করব, এবং এইভাবে আমি আমার জীবন ধারণ করার চেষ্টা করব।" এটি নারকীয় পরিবেশে পতিত হওয়ার ফলে কৃষ্ণভক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত।

এখানে বুঝতে হবে, যে মানুষ নিরন্তর *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—ভগবানের এই দিব্য নাম জপ করেন, তিনি ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেম লাভ করেছেন, এবং জীবনের যে কোনও পরিস্থিতিতে তিনি কেবলমাত্র পূর্ণ প্রেম ও ভক্তি সহকারে ভগবানের নাম স্মরণ করার ফলে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন।

এর সারমর্ম হচ্ছে, বীভৎস কৃষ্ণভক্তি রসের প্রাদুর্ভাব সুপ্ত শান্তরসে উৎপন্ন স্নেহভাবে বিকশিত হওয়ার অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

## ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

# রসের মিশ্রণ

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, বারোটি বিভিন্ন রস, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বারো প্রকারের সম্বন্ধ রয়েছে। তাদের মধ্যে পাঁচটি রস মুখ্য, এবং সেগুলি হচ্ছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। আর অন্য সাতটি রস গৌণ, সেগুলি হচ্ছে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। চিন্ময় জগৎ বা বৈকুণ্ঠধামে পাঁচটি মুখ্য রস নিত্য প্রকাশিত থাকে, কিন্তু সাতটি গৌণরস গোকুল বৃন্দাবনে, অর্থাৎ এই জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তাঁর দিব্য লীলাবিলাস করেন, সেখানে নিত্য প্রকট ও অপ্রকট হয়।

প্রায়ই মূল রসের সঙ্গে অন্য রসেরও প্রকাশ হতে দেখা যায় এবং এই রসের মিশ্রণ কখনও কখনও সুসঙ্গত বা উপাদেয় হয়। আবার কখনও অসঙ্গত বা অনুপাদেয় হয়। এই মিশ্রণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হল।

শান্তরসে যখন বীভৎস অথবা অদ্ভুত রসের আভাস দেখা যায়, তখন তা সুসঙ্গত। শান্তরসে যখন মাধুর্য, বীর, রৌদ্র অথবা ভয়ানক রস দেখা যায়, তা অসঙ্গত মিশ্রণ।

দাস্যরসে যখন বীভৎস, শান্ত অথবা বীররস (যেমন ধর্মবীর ও দানবীর) মিশ্রিত হয়, তখন সেই মিশ্রণ সুসঙ্গত। যুদ্ধবীর ও রৌদ্ররস শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উৎপাদিত হয়।

সখ্যরস যখন মাধুর্য, হাস্য অথবা বীররসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তা অত্যন্ত উপাদেয়। সেই সখ্যরস যখন ভয়ানক অথবা বাৎসল্য রসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন তা অত্যন্ত অনুপাদেয়।

যদিও বাৎসল্য রসের সঙ্গে হাস্য, করুণ অথবা ভয়ানক রসের বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তবুও তাদের মিশ্রণ সুসঙ্গত।

বাৎসল্য রসের সঙ্গে মাধুর্য, বীর অথবা রৌদ্ররসের মিশ্রণ অসঙ্গত।

মাধুর্য রসের সঙ্গে হাস্য অথবা সখ্যরসের মিশ্রণ সুসঙ্গত।

কোন কোন তত্ত্ববিৎদের মতানুসারে মাধুর্য রসের সঙ্গে কেবল যুদ্ধবীর ও ধর্মবীর রসের সুসঙ্গত মিলন হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, এই দুটি রস ছাড়া মাধুর্য রসের সঙ্গে অন্য সমস্ত রসের মিশ্রণ অসঙ্গত।

হাস্যরসের সঙ্গে ভয়ানক, মাধুর্য অথবা বাৎসল্য রস সুসঙ্গত, কিন্তু করুণ অথবা বীভৎস রসের মিশ্রণ অসঙ্গত।

অদ্ভুত রসের সঙ্গে বীর অথবা শান্তরসের মিশ্রণ সুসঙ্গত, কিন্তু রৌদ্র বা ভয়ানক রসের মিশ্রণ সর্বদাই অসঙ্গত।

বীররসের সঙ্গে অদ্ভুত, হাস্য অথবা দাস্যরসের মিশ্রণ সুসঙ্গত, কিন্তু ভয়ানক ও মাধুর্য রসের মিশ্রণ অসঙ্গত। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মত অনুসারে, বীররসের সঙ্গে শান্তরসের মিশ্রণ সর্বদাই সুসঙ্গত।

রৌদ্ররসের সঙ্গে করুণ অথবা বীররসের মিশ্রণ সুসঙ্গত, কিন্তু হাস্য, মাধুর্য অথবা বীভৎস রসের মিশ্রণ অসঙ্গত।

ভয়ানক রসের সঙ্গে বীভৎস অথবা করুণ রসের মিশ্রণ সুসঙ্গত।

বীররসের সঙ্গে মাধুর্য, হাস্য অথবা রৌদ্ররসের মিশ্রণ সর্বদাই অসঙ্গত।

বীভৎস রসের সঙ্গে শান্ত, হাস্য অথবা দাস্যরসের মিশ্রণ সুসঙ্গত, কিন্তু মাধুর্য ও সখ্যরসের মিশ্রণ অসঙ্গত।

উপরোক্ত বিশ্লেষণগুলি রসাভাস, অথবা রসের অসঙ্গত মিশ্রণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। রসাভাসের এই দিব্য বিজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি রসের পরস্পরের সঙ্গে সুসঙ্গত ও অসঙ্গত মিশ্রণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে বিরাজ করছিলেন, তখন বহু কবি ও ভক্ত তাঁর কাছে তাদের স্বরচিত কাব্য সমর্পণ করতেন। কিন্তু নিয়ম ছিল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সচিব স্বরূপ দামোদর প্রথমে সেই সমস্ত রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতেন, এবং তাতে যদি কোন রকম রসাভাস না থাকত, তা হলেই কেবল তিনি সেই কবিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতে দিতেন।

রসাভাসের বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁরা ভগবানের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কের বর্ণনায় পূর্ণ সুসঙ্গতি দর্শন করতে আশা করেন। রসের এই মৈত্রী অথবা বিরোধী ভাবের অধ্যয়ন কখনও কখনও অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। তাই কেন তা হয়, তার ইঙ্গিত দেওয়া হল। যখন এক বন্ধুর সঙ্গে আর এক বন্ধুর মিলন হয়, তখন তাদের মিলনের ফলে উৎপন্ন রস সাধারণত অতি উপাদেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুই বন্ধুর এই মিলনেও এত প্রকার ভাবের উদয় হয় যে, কখন যে তা সুসঙ্গত এবং কখন যে অসঙ্গত তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা পূর্ণ ও আংশিক রূপে বিভিন্ন রসের মিশ্রণকে ভাগ করে কোন্ কোন্ রস সুসঙ্গত, তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই পন্থায় মুখ্য রসকে পূর্ণ বলা হয়েছে এবং গৌণ রসকে অংশ বলা হয়েছে।

পূর্ণ ও আংশিক রসের বিষয়ে নিম্নলিখিত উক্তিটিতে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে— "প্রতিটি জীব পরব্রহ্মরূপী অগ্নির স্ফুলিঙ্গসদৃশ। তাই আমি জানি না, আমার মতো ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গ সেই পরম অগ্নিরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সেবায় নিযুক্ত হতে পারবে কি না।" এই উক্তিতে শান্তরস হচ্ছে মুখ্য এবং দাস্যরস হচ্ছে গৌণ। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মজ্যোতিতে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম বিনিময়ের কোন সম্ভাবনাই নেই।

এক ভক্ত অনুশোচনার সুরে বলেছেন, "হায়! আমি এখনও ত্বকের আবরণে আবৃত কফ, পিত্ত, শুক্র ও রক্ত সমন্বিত এই দেহটির মাধ্যমে আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করছি। আমাকে ধিক্, কেন না এই দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আমি ভগবৎ-স্মরণরূপ দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারি না।" এই উক্তিটিতে শান্ত ও বীভৎস—এই দুটি রস রয়েছে। শান্তরস হচ্ছে মুখ্য, আর বীভৎস রস গৌণ।

অন্য এক ভক্তের এই রকম একটি উক্তি রয়েছে, "আমি এখন স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করতে শুরু করব। তিনি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো ঘনশ্যাম বর্ণবিশিষ্ট দিব্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমব্রহ্ম। এখন আমি রক্ত ও মাংস দিয়ে তৈরি এই জড় শরীরের প্রতি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করব।" এখানেও দাস্য ও বীভৎস রসের মিশ্রণ হয়েছে। তার মধ্যে দাস্যরস হচ্ছে মুখ্য এবং বীভৎস রস গৌণ।

আর একটি উক্তিতে বলা হয়েছে, "কখন আমি তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারব? এইভাবে পবিত্র হয়ে, কখন আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় যুক্ত হতে পারব? তখনই কেবল তাঁর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল ও নয়নকমল দর্শন করে আমি তাঁর আরাধনা করতে সক্ষম হব।" এই উক্তিটিকে শান্তরস হচ্ছে মুখ্য এবং দাস্যরস গৌণ।

এই রকম আর একটি উক্তি হচ্ছে, "দেখ, শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের কথা স্মরণ করে ভগবানের এই ভক্তটি কিভাবে নৃত্য করছে। কেবলমাত্র তার এই নৃত্য দর্শন করলে তুমি সব চাইতে সুন্দরী রমণীর প্রতিও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে!" এই উক্তিটিতে শান্তরস হচ্ছে মুখ্য এবং বীভৎস রস গৌণ।

এক ভক্ত দৃঢ়তাপূর্বক বলেছেন, "হে প্রভু! এখন আমি যুবতীদের সঙ্গ করার সমস্ত চিন্তার প্রতি বিরক্তি অনুভব করছি। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমার আর কোন রকম স্পৃহা নেই, কেন না আমি এখন আপনার চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হয়েছি। তার ফলে আমি এমনভাবে আনন্দমগ্ন হয়েছি যে, আমার আর অন্য কোন বাসনা নেই, এমন কি যোগসিদ্ধির বাসনাও নেই। এখন আমার চিত্ত কেবল আপনার

চরণারবিন্দের আরাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।” এই উক্তিতে শান্তরস হচ্ছে মুখ্য এবং বীররস হচ্ছে গৌণ।

আর একটি উক্তিতে সুবলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, “হে সুবল! বৃন্দাবনের যে সমস্ত ব্রজবালিকারা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তারা নিশ্চয়ই এই জগতে সব চাইতে সৌভাগ্যবতী রমণী।” এই দৃষ্টান্তটিতে সখ্যরস হচ্ছে মুখ্য এবং মাধুর্য রস গৌণ।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলেন, “হে মুগ্ধা! এই রকম আকুল দৃষ্টিতে তোমরা আমার দিকে তাকিও না। তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে বৃন্দাবনে তোমাদের গৃহে ফিরে যাও। এখানে তোমাদের থাকার কোন প্রয়োজন নেই।” তাঁর সঙ্গে রাসনৃত্যের আনন্দ উপভোগের অভিলাষী ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে পরিহাস করছিলেন, সুবল তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তখন হাস্যোজ্জ্বল আয়ত নয়নে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুবলের মধ্যে তখন সখ্য ও হাস্যরসের মিশ্র ভাবের উদয় হয়েছিল। তাতে সখ্যরস ছিল মুখ্য এবং হাস্যরস ছিল গৌণ।

নিম্নলিখিত উদাহরণটিতে যথাক্রমে সখ্যরস ও হাস্যরসের মিশ্রণ হয়েছে, যা মুখ্য ও গৌণরূপে গণ্য করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনার তীরে অশোক তরুর ছায়ায় লুকায়িত রাধারাণীর বেশধারী সুবলকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ান। কৃষ্ণকে দেখে সুবল তাঁর মুখ ঢেকে হাস্য সংবরণ করার চেষ্টা করেন।

বাৎসল্য রসের সঙ্গে করুণ রসের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—মা যশোদা যখন বৃন্দাবনের বনে পাদুকা ও ছত্রবিহীন হয়ে বিচরণরত কৃষ্ণের কথা মনে করেন, তখন কৃষ্ণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন। এই দৃষ্টান্তটিতে বাৎসল্য রস হচ্ছে মুখ্য এবং করুণ রস হচ্ছে গৌণ।

বাৎসল্য রস ও হাস্যরসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—মা যশোদার এক সখী তাঁকে বলেন, “হে যশোদে! তোমার পুত্রটি খুব চতুরভাবে আমার গৃহ থেকে ননী চুরি করেছে। আর তার এই দুষ্কৃত কার্যের জন্য আমার ছেলেকে দোষ দেওয়ার চেষ্টায় সে আমার সেই ঘুমন্ত শিশুর মুখে ননী লাগিয়ে দিয়েছে।” সেই কথা শুনে মা যশোদা তাঁর বঙ্কিম ভ্রূযুগল আন্দোলিত করেন। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে তিনি তাঁর সখীটির দিকে তাকান। মা যশোদা তাঁর সেই হাস্যোৎফুল্ল ভাবের দ্বারা সকলকে আশীর্বাদ করুন! এই দৃষ্টান্তটিতে বাৎসল্য রস হচ্ছে মুখ্য এবং হাস্যরস হচ্ছে গৌণ।

কয়েকটি ভক্তিরসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁর

কেশরাশি তাঁর স্কন্ধযুগলের উপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাঁর দেহে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছিল। মা যশোদা যখন তাঁকে এইভাবে দেখলেন, তখন তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তারপর তিনি যখন আয়ত নয়নে সেই দৃশ্য দেখছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, কৃষ্ণ পরিহাস করে নানাভাবে মুখবিকৃতি করছে। মা যশোদা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাসতে থাকেন। তারপর যখন আবার তাঁর মনে হল যে, কৃষ্ণ এত দীর্ঘকাল ধরে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করে আছেন, তখন তাঁর বসন স্বেদবিন্দুতে সিক্ত হয়। ব্রজেশ্বরী মা যশোদা তাঁর অন্তহীন করুণার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করুন! এই দৃষ্টান্তটিতে বাৎসল্য রস হচ্ছে মুখ্য, এবং ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য, করুণ ইত্যাদি রসগুলি হচ্ছে গৌণ।

মাধুর্য ও সখ্যরসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, শ্রীমতী রাধারাণী যখন বলেন, "হে সখী! দেখ, কৃষ্ণ কিভাবে যুবতী রমণীর বেশধারী সুবলের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমার মনে হয় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সুবলকে দিয়ে আমার কাছে কোন বার্তা প্রেরণ করবে।" রাধারাণীর অভিভাবকেরা চাইতেন না যে, কৃষ্ণ অথবা গোপসখারা রাধারাণীর সঙ্গে মেলামেশা করে; তাই কৃষ্ণের সখারা কখনও কখনও বালিকার সাজে সজ্জিত হয়ে রাধারাণীর কাছে কৃষ্ণের বার্তা বহন করে আনতেন। এই দৃষ্টান্তটির মুখ্য রস হচ্ছে মাধুর্য এবং সখ্যরস হচ্ছে গৌণ।

মাধুর্য ও হাস্য ভক্তিরসের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—কৃষ্ণ যখন যুবতীর বেশ ধারণ করে শ্রীমতী রাধারাণীকে বলেন, "হে নির্দয়হৃদয় বালিকে! তুমি কি জান না যে, আমি তোমার ভগিনী? তুমি কেন আমাকে চিনতে পারছ না? আমার প্রতি কৃপাপরবশ হও! দয়া করে আমার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করে প্রেমভরে আমাকে আলিঙ্গন কর!" কৃষ্ণ যখন ঠিক রাধারাণীর মতো রূপ ধারণ করে, এই রকম মধুরভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, শ্রীমতী রাধারাণী তখন তাঁকে চিনে ফেলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর গুরুজনেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি কিছু না বলে কেবল মুখ টিপে হাসতে থাকেন। এখানে মাধুর্য রস হচ্ছে মুখ্য এবং হাস্যরস গৌণ।

অনেক রসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—চন্দ্রাবলীর এক সখী যখন দেখেন যে, কৃষ্ণ বৃষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন তিনি ভাবতে থাকেন, "কৃষ্ণ কি অদ্ভুত! তার মন চন্দ্রাবলীর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও বঙ্কিম ভ্রূযুগলের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছে। তার ভুজঙ্গ-সদৃশ বাহুযুগল তাঁর সখার স্কন্ধে ন্যস্ত, এবং সেই সঙ্গে সিংহের মতো গর্জন করে সে বৃষাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করছে!" এটি মাধুর্য, সখ্য ও বীররসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত। এখানে মাধুর্য রস মুখ্য এবং সখ্য ও বীররস হচ্ছে গৌণ।

কুব্জা যখন কামার্ত হয়ে কৃষ্ণের পীতবসন আকর্ষণ করে, তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত মানুষেরা হাসতে থাকে এবং লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণ মাথা নত করেন এবং তাঁর কপোলযুগল আরক্তিম হয়ে ওঠে। এটি মাধুর্য ও হাস্যরসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত। এখানে হাস্যরস হচ্ছে মুখ্য এবং মাধুর্য রস গৌণ।

বিশাল নামক একটি গোপবালক যখন ভদ্রসেনকে পরাজিত করে শ্রীদামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন, তখন শ্রীদাম বলেন, "তুমি কেন আমার সামনে তোমার বীরত্ব প্রদর্শন করবার চেষ্টা করছ? এর পূর্বেও তুমি শ্রীদামের সঙ্গে লড়াই করার তোড়জোড় করেছ। কিন্তু জেনে রাখ যে, শ্রীদাম শত শত বলরামের সঙ্গে লড়াই করতেও পরোয়া করে না। আর তুমি তো কোন্ ছার!" এটি সখ্য ভক্তিরস আর বীররসের মিশ্রণ। এখানে বীররস মুখ্য, আর সখ্যরস গৌণ।

শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা শিশুপালের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার সেই কৃষ্ণনিন্দা কৃষ্ণের থেকেও পাণ্ডবদের বেশি উত্ত্যক্ত করেছিল, তাই পাণ্ডবেরা সব রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিশুপালকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁদের চিত্তে তখন রৌদ্র ভক্তিরস ও সখ্যরসের মিশ্রণ হয়েছিল। তাতে রৌদ্ররস ছিল মুখ্য এবং সখ্যরস ছিল গৌণ।

এক সময় কৃষ্ণ দেখছিলেন যে, শ্রীদাম খুব দক্ষতার সঙ্গে লাঠি নিয়ে বলরামের সঙ্গে লড়াই করছে, যে বলরাম গদাযুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী এবং যিনি গদাঘাতে প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, ছোট্ট একটি লাঠি নিয়ে যুদ্ধরত শ্রীদামের কাছে বলরাম পরাজিত হয়েছেন, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে শ্রীদামের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই দৃষ্টান্তটি অদ্ভুত, সখ্য ও বীররসের মিশ্রণ। এখানে অদ্ভুত রস হচ্ছে মুখ্য এবং সখ্য ও বীররস গৌণ।

এই সমস্ত রসের পারদর্শী বিশ্লেষণ-কর্তারা নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন বিভিন্ন রস পরস্পরকে ছাপিয়ে যায়, তখন মুখ্য রসকে বলা হয় স্থায়িভাব। *বিষ্ণুধর্মোত্তরে* প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যখন বিভিন্ন রসের মিশ্রণ হয়, তখন মুখ্য রসকে ভক্তির স্থায়ী রস বলা হয়। যদিও কোন বিশেষ সময়ে গৌণ রস প্রকাশিত হয়, তবে পরিণামে তা মুখ্য রসে লীন হয়ে যায়। তাই তাকে বলা হয় ভক্তিরসের ব্যভিচারী ভাব।

এই সম্পর্কে মুখ্য ও গৌণ রসের সম্বন্ধ প্রদর্শন করে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীবামনদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি ইন্দ্রের ভ্রাতারূপে 'জন্ম' গ্রহণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই বামনদেবকে যদিও কখনও কখনও কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতা বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি

হচ্ছেন দেবরাজ ইন্দ্রের নিয়ন্তা। তাই দেবতারূপে বামনদেবকে তত অধিক গুরুত্ব দেওয়া না হলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান—সমস্ত দেবতাদেরও উৎস। এইভাবে মুখ্য রস কখনও কখনও গৌণরূপে প্রকাশিত হয়, যদিও এর সঠিক অবস্থান ভক্তের প্রেমানুভূতির মধ্যে।

ভগবদ্ভক্তির কোন ব্যভিচারী ভাব কোন সময় মুখ্যরূপে প্রকাশিত হলেও, তা গৌণ বলেই বিবেচনা করা হয়। তা যদি অধিক প্রাধান্য সহকারে প্রকাশিত না হয়, তা হলে সামান্য প্রকাশিত হয়ে অচিরেই মুখ্য রসে লীন হয়ে যায়। সেই স্বল্প অভিব্যক্তিতে তাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অত্যন্ত উপাদেয় আহার গ্রহণ করার সময় কেউ যদি একটি ছোট ঘাসের টুকরো খেয়ে ফেলেন, তিনি তখন তা বুঝতে পারেন না এবং তার স্বাদ যে কি রকম তা জানবারও প্রচেষ্টা করেন না।

## পঞ্চাশৎ অধ্যায়

# মিশ্র রসের অধিক বিশ্লেষণ

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, বিরোধী রসের মিশ্রণকে রসাভাস বলা হয়। মিষ্টান্নের সঙ্গে যদি লবণ অথবা টক মেশানো হয়, তা হলে সেই মিশ্রণটি উপাদেয় হয় না, এবং সেই মিশ্রণকে অসঙ্গত বলা হয়।

বিরোধী ভাবের মিশ্রণের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে—একজন নির্বিশেষবাদী যখন উচ্চৈঃস্বরে অনুশোচনা করে বলেন, "আমি কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত হয়েছি, এবং ধ্যান অভ্যাস করার চেষ্টায় অর্থহীনভাবে দিনাতিপাত করছি। আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস এবং সমস্ত দিব্য আনন্দের আধার শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করিনি।" এই উক্তিটিতে শান্ত ও মাধুর্য রসের আভাস দেখা যায়, এবং এই মিশ্রণ অসঙ্গত।

বৃন্দাবন আদি স্থানে কখনও কখনও দেখা যায় যে, শান্তরসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বল্প ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কৃত্রিমভাবে মাধুর্য রসের স্তরে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শান্তরস ও মাধুর্য রসের মিলন সুসঙ্গত নয় বলে সেই ব্যক্তিদের ভগবদ্ভক্তির স্তর থেকে অধঃপতিত হতে দেখা যায়।

সেই অসঙ্গতি প্রকাশ করে এক মহান শান্ত ভক্ত ব্যঙ্গোক্তি করে প্রার্থনা করেছেন, "আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, যিনি পিতৃলোকের পিতাদের থেকে লক্ষ কোটিগুণ অধিক স্নেহসম্পন্ন এবং যিনি মহান দেবতা ও ঋষিদের দ্বারা নিরন্তর পূজিত। সে যাই হোক আমি কিছুটা আশ্চর্যান্বিত যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীপতি তবুও তাঁর শরীর বরাঙ্গনাদের নখচিহ্নে ভূষিত!" এটি শান্তরস ও অতি উচ্চস্তরের মাধুর্য রসের অসঙ্গত মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত।

জনৈক গোপী বলেন, "হে কৃষ্ণ! সর্বপ্রথমে তোমার অত্যন্ত বলবান বাহুযুগলের দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করা উচিত। তারপর, হে সখে! প্রথমে আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করব এবং তারপর আমি তোমার সঙ্গে খেলা করব।" এটি মুখ্য মাধুর্য রস ও গৌণ বাৎসল্য রসের অসঙ্গত মিলনের একটি দৃষ্টান্ত।

এক ভক্ত বলেন, "হে কৃষ্ণ! মহান বৈদান্তিকেরা তোমাকে পরম সত্য বলে সম্বোধন করে এবং *নারদ-পঞ্চরাত্র* বিধির অনুগামী বৈষ্ণবেরা তোমাকে পরমেশ্বর

ভগবান বলে সম্বোধন করে, তা হলে আমি কিভাবে তোমাকে আমার পুত্র বলে সম্বোধন করব? তুমি তো সেই পরম পুরুষ, তা হলে আমার জিহ্বা অসাধারণ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে কিভাবে তোমাকে আমার সাধারণ পুত্র বলে সম্বোধন করবে?" এটি শান্ত ও বাৎসল্য রসের মিশ্রণ, এবং এই মিশ্রণটি অসঙ্গত।

আর এক ভক্ত বলেন, "হে সখে! আমার যৌবনের সৌন্দর্য মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতো ক্ষণস্থায়ী, তাই আমার মনোরম দেহসৌষ্ঠব নিতান্তই অর্থহীন। অতএব আমি অনুরোধ করছি, দয়া করে এখনই তাঁর সঙ্গে আমার মিলনের ব্যবস্থা কর।" এই উক্তিটিতে শান্তরসের সঙ্গে মাধুর্য রসের অসঙ্গত মিশ্রণ দেখা যায়।

কৈলাসের এক কামার্তা রমণী এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি চিরজীবী হও!" তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন। এটি বাৎসল্য রসের সঙ্গে মাধুর্য রসের অসঙ্গত মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত।

উপরোক্ত বিবরণগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের প্রেম বিনিময়ের পরিণাম যদি শুদ্ধ না হয়, তা হলে যে রসাভাস হয় তা প্রদর্শন করা। শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতো মহান ভক্তদের মত অনুসারে বিরোধী ভাবের মিশ্রণের ফলে রসাভাস হয়।

এক সময় একজন যুবতী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, "হে বালক! আমি জানি যে, রক্তমাংস দিয়ে গঠিত আমার এই দেহটি কখনই তোমার রমণের যোগ্য নয়। কিন্তু তবুও আমি তোমার রূপে এতই আকৃষ্ট হয়েছি যে, আমি তোমার প্রেমিকারূপে তোমার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের বাসনা করি।" এই উক্তিটিতে বীভৎস রস ও মাধুর্য রসের অসঙ্গত মিশ্রণ দেখা যায়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তদের সাবধান করে দিয়েছেন, তাঁদের রচনায় অথবা ব্যবহারে এই ধরনের অসঙ্গত মিশ্রণ না ঘটাতে। এই ধরনের বিরোধী ভাবের উপস্থিতিকে বলা হয় রসাভাস। কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থে যখন এই ধরনের রসাভাস দেখা যায়, কোন তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত অথবা ভক্ত তা স্বীকার করেন না।

*বিদগ্ধ-মাধবের* দ্বিতীয় অঙ্কের সপ্তদশ শ্লোকে পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলেছেন, "দেখ, কি আশ্চর্যের বিষয়! সব সময় বিষয়বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মহর্ষিরা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, এবং বহু কষ্টে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের হৃদয়ে স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। আর এর বিপরীতে, এই যুবতী রমণীটি কি না শ্রীকৃষ্ণের থেকে তার মন উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে যে বিষয়-ভোগের চিন্তায় মগ্ন হতে পারে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মহান ঋষিরা কঠোর তপস্যা ও অধ্যবসায় সহকারে যেই শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজছেন, এই বালিকাটি তাকে তার হৃদয় থেকে দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করছে!" যদিও এই উক্তিটিতে বিরোধী রসের

মিশ্রণ দেখা যায়, কিন্তু তার পরিণাম অসঙ্গত নয়, কেন না এখানে মাধুর্য রস এত উন্নত যে, তা অন্য সমস্ত রসকে পরাভূত করেছে। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, চিত্তে এই রকম প্রেমের বিকাশ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তা কেবল বৃন্দাবনের গোপিকাদের পক্ষেই সম্ভব।

এই রকম বিরোধী রসের অন্য অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে রসাভাস হয় না। স্বর্গলোকের এক দেবতা এক সময় বলেন, "শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর পরিহাসপূর্ণ বচন ব্রজবাসীদের হাস্যোচ্ছল করে তুলত, তিনি সর্পরাজ কালীয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন এবং সকলের বিষাদের কারণ হয়েছেন। এখানে হাস্য ও করুণ রসের মিশ্রণ হয়েছে, কিন্তু সেই মিশ্রণ অসঙ্গত নয়, কেন না এই দুটি রসের ফলে প্রেম বর্ধিত হচ্ছে।

এক সময় শ্রীমতী রাধারাণীকে বলা হয়েছিল যে, যদিও তিনি সব রকম কাজকর্ম বন্ধ করেছেন, তবুও তিনি হচ্ছেন সব রকম ভগবৎ-সেবায় পরম অনুপ্রেরণা দানকারী। সেই উক্তিটিতে বলা হয়েছে, "হে রাধারাণী! কৃষ্ণের বিরহে তুমি সর্বাপেক্ষা সুন্দর বৃক্ষের মতো নিশ্চল হয়ে আছ, পল্লবের দ্বারা যার মাধুর্য আচ্ছাদিত হয়নি। তোমার প্রশান্ত ভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন ব্রহ্মানন্দে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন রয়েছ!" এই দৃষ্টান্তটি শান্ত ও মাধুর্য রসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত, কিন্তু মাধুর্য রস সব কিছু ছাপিয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান এক রুদ্ধ অস্তিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলেছেন, "আমার জন্য শ্রীমতী রাধারাণী মূর্তিমতী শান্তিভাব প্রাপ্ত হয়েছে। তার জন্য আমি এখন বিনিদ্র রজনী যাপন করি। নির্নিমেষ নয়নে আমি তাকিয়ে থাকি, এবং ধ্যানস্থভাবে নিরন্তর অবস্থান করি। তার জন্য আমি পর্বতকন্দরে আমার গৃহ স্থাপন করেছি!" এটি মাধুর্য রসের সঙ্গে শান্তরসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেখানে কোন রকম অসঙ্গতি নেই।

রম্ভা অপ্সরাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "তুমি কে?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি মূর্তিমতী শান্তি।" তা হলে তুমি অন্তরীক্ষে কেন?" "পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার জন্য আমি অন্তরীক্ষে অবস্থান করছি।" "তা হলে তুমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ কেন?" "পরমতত্ত্বের পরম সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করবার জন্য।" "তা হলে তোমার মন অস্থির বলে মনে হচ্ছে কেন।" "যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যে আমি অত্যন্ত ব্যাকুলা হয়েছি এবং আজও আমি কন্দর্প হবার চেষ্টা করছি।" এই দৃষ্টান্তটিতে বিরোধী রস থাকলেও রসাভাস নেই, কেন না সামগ্রিকভাবে মধুর রস শান্তরসের সীমা অতিক্রম করে গেছে।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৬০/৪৫) রুক্মিণী দেবী বলেছেন, "হে পতিদেব! যে রমণী তোমার সঙ্গ প্রভাবে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারেনি, সে গোঁফ, দাড়ি, লোম, নখ, ও চুল দ্বারা আচ্ছাদিত মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ,

পিত্ত আদি পরিপূর্ণ একটি শবকে তার পতিরূপে ভজনা করে। প্রকৃতপক্ষে ঐ পতি নিতান্তই একটি মৃতবৎ দেহ, কিন্তু তোমার দিব্য রূপের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার ফলে, স্ত্রীলোকেরা মল ও মূত্রের সমন্বয়ে গঠিত ঐ দেহটিকেই তাদের পতি বলে গ্রহণ করে।" এই উক্তিতে সেই তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, যার দ্বারা প্রাকৃত শরীর তৈরি হয়। কিন্তু এতে কোন রসাভাস নেই, কেন না এখানে জড় ও চেতনের যথার্থ ভেদ প্রতিপন্ন হয়েছে।

*বিদগ্ধ-মাধবে* (২/৩১) শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এক সখাকে বলেছেন, "হে সখে! কি আশ্চর্যের বিষয়, যখন থেকে আমি রাধারাণীর সুন্দর নয়নকমল দর্শন করেছি, তখন থেকে চন্দ্র ও পদ্মকে স্মরণ করে ঘৃণায় আমার মুখ বিকৃত হচ্ছে।" এটি বীভৎস রসের সঙ্গে মাধুর্য রসের মিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত, কিন্তু কোন রকম অসঙ্গতি নেই।

নিম্নলিখিত উক্তিতে ভগবদ্ভক্তির নানা প্রকার রসের বর্ণনা করা হয়েছে, "যদিও শত্রুদের কাছে কৃষ্ণ অপরাজেয়, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে রাজবেশে সজ্জিত অজিত শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রণকৌশল দর্শন করে, গোপবালকেরা বিস্ময়ে প্রায় নীলাভ হয়ে গিয়েছিল।" এই উক্তিতে যদিও বীররস ও ভয়ানক রসের মিশ্রণ হয়েছে, তবুও সেই মিশ্রণে রসাভাস হয়নি।

এক মথুরার নিবাসিনী তাঁর পিতাকে অনুরোধ করেন দ্বার বন্ধ করে তাঁর সঙ্গে সান্দীপনি মুনির পাঠশালায় শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে যেতে। তিনি অভিযোগ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে তাঁর হৃদয় চুরি করে নিয়েছেন। এইখানে বাৎসল্য রসের সঙ্গে মধুর রসের মিশ্রণ হয়েছে, কিন্তু রসের কোন অসঙ্গতি হয়নি।

এক ব্রহ্মানন্দী (অদ্বৈতবাদী) তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করে বলেছেন, "সেই পরমব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি কবে দেখতে পাব, যাঁর বক্ষঃস্থল রুক্মিণীর স্তনস্পর্শে কুমকুমের রঙে রঞ্জিত হয়েছে?" এখানে শান্তরসের সঙ্গে মধুর রসের মিশ্রণ হয়েছে। যদিও এটি রসদ্বয়ের বিরোধ, তবুও অসঙ্গতি নেই, কারণ একজন ব্রহ্মানন্দীও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হতে চায়।

নন্দ মহারাজ তাঁর পত্নীকে বলেন, "হে যশোদে! তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যদিও মল্লিকা পুষ্পের মতো কোমল ও মৃদু, তবুও সে পর্বতের মতো বলবান কেশী দানবকে নিধন করতে গেছে। তাই আমার চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই, আমার পুত্রের সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক। আমি স্তম্ভের মতো শক্তিশালী এই হাত উঁচিয়ে কেশী দৈত্যকে নিধন করে সমস্ত ব্রজবাসীদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করব।" এই উক্তিটিতে বীর ও ভয়ানক রসের মিলন হয়েছে। বিরোধী হলেও এই রস দুটি বাৎসল্য রসকে বর্ধিত করেছে, তাই তা রসাভাস নয়।

*ললিতমাধব* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, "কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন, কংসের পুরোহিত তখন ঘৃণাভরে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়েছিলেন। কংস ও তার পুরোহিতের কাছে সমস্ত রঙ্গমঞ্চ তখন বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিল, কৃষ্ণের সখাদের মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হয়েছিল, মল্লরা রক্তিম হয়ে উঠেছিল, তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুরা নৈরাশ্যমগ্ন হয়েছিল, মহর্ষিরা ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, দেবকী ও মাতৃস্থানীয় রমণীদের চক্ষু অশ্রুধারায় প্লাবিত হয়েছিল, ইন্দ্র আদি দেবতাদের হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হয়েছিল, ভৃত্যরা নৃত্য করতে শুরু করেছিল, এবং যুবতীদের চঞ্চল চাহনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।" এই উক্তিটিতে বিভিন্ন রসের মিশ্রণের বর্ণনা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন অসঙ্গতি নেই।

অসঙ্গতিবিহীন এই রকম আর একটি বর্ণনা *ললিতমাধবে* পাওয়া যায়, যেখানে সেই গ্রন্থের সমস্ত পাঠকদের আশীর্বাদ করে গ্রন্থকার বলেছেন, "যদিও পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর গোবর্ধন পর্বত ধারণ করতে পারেন, তবুও তিনি সর্বদাই অত্যন্ত বিনীত ও নম্র। তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। তাঁর দ্বারা যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাঁর প্রতি ইন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণকে তিনি সর্বতোভাবে নিরাশ করেছেন। তিনি সমস্ত যুবতীদের পরম আনন্দের কারণ। তিনি আপনাদের সকলের প্রতি কৃপা পরায়ণ হোন!"

# একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

# রসের বিকৃত প্রকাশ

রসাভাস অথবা রসের অসঙ্গত মিশ্রণকে উপরস, অনুরস ও অপরস—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

এক নির্বিশেষবাদী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে বলেন, "কেউ যখন এই জড় জগতের সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যান, তখন সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু হে আদিদেব! হে আদি পুরুষ! আপনাকে দর্শন করে আমি সেই আনন্দ উপভোগ করছি।" এই রসাভাসের নাম শান্ত উপরস, কেন না তা নির্বিশেষবাদ এবং সবিশেষবাদ মিশ্রণের ফলে হয়েছে।

অন্য আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, "আমি যেদিকে তাকাই সেখানেই কেবল আপনার স্বরূপ দর্শন করি। তাই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনি হচ্ছেন নির্বিকার ব্রহ্মজ্যোতি এবং সমস্ত কারণের পরম কারণ। এই প্রকট সৃষ্টিতে আপনি ছাড়া আর কিছুই নেই।" এটি উপরসের আর একটি উদাহরণ।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা মধুমঙ্গল যখন কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করে কৃষ্ণের সামনে নাচছিলেন, তখন কেউই তার প্রতি কোন রকম মনোযোগ দিচ্ছিল না, সে তখন ঠাট্টাচ্ছলে বলে, "হে কৃষ্ণ! তুমি আমার প্রতি কৃপাপরবশ হও। আমি তোমার কৃপাভিক্ষা করছি!" এটি সখ্যরস এবং শান্তরসজাত উপরসের একটি দৃষ্টান্ত।

কংস তার ভগ্নী দেবকীকে সম্বোধন করে বলে, "হে ভগ্নী! যখন থেকে আমি তোমার পুত্র কৃষ্ণকে দেখেছি, তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, সে পর্বতের মতো বলশালী মল্লবীরদের পর্যন্ত বধ করতে পারে। অতএব সে যদি ভয়ঙ্কর যুদ্ধেও লিপ্ত হয়, তবুও তার জন্য আমার আর কোন উৎকণ্ঠা নেই।" এটি বাৎসল্য উপরসের উদাহরণ।

*ললিতমাধব* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, "যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীরা সকলেই ছিলেন যুবতী রমণী এবং বৃন্দাবনের ব্রজগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট ছিলেন, তাঁরাও ঠিক সেভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের সেই আকর্ষণের ফলে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করিয়েছিলেন।" এখানে বাৎসল্য ও মাধুর্য—এই দুটি রস প্রকাশিত হয়েছে এবং তার পরিণাম হচ্ছে মাধুর্য রসের উপরস।

শ্রীমতী রাধারাণীর এক সখী তাঁকে বলেন, "হে গান্ধর্বীকে! আমাদের গ্রামে তুমিই ছিলে সব চাইতে সতীসাধ্বী যুবতী, কিন্তু এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে সাধ্বী নও। কৃষ্ণকে দর্শন করার পর এবং তাঁর মুরলীধ্বনি শ্রবণ করার পর কামদেবের প্রভাবেই তা হয়েছে।" এটি মাধুর্য প্রেমের বিভক্ত অনুরাগ জনিত উপরসের একটি দৃষ্টান্ত।

কিছু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদের মত অনুসারে নায়ক-নায়িকার ভাব নানা প্রকার রসাভাস উৎপন্ন করে।

"শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাতের ফলে গোপিকারা পবিত্র হয়েছিলেন, এবং তাঁদের শ্রীঅঙ্গে কামদেবের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।" যদিও জড়-জাগতিক বিচারে কোন যুবতীর প্রতি যুবকের দৃষ্টিপাত দূষিত বলে মনে করা হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপিকাদের প্রতি তাঁর দিব্য দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তখন তার ফলে তাঁরা পবিত্র হয়েছিলেন। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পরতত্ত্ব, তাই তাঁর প্রতিটি কার্যই দিব্য ও পরম শুদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনার জলে কালীয় নাগকে শাসন করার জন্য তার মাথায় নাচছিলেন, তখন কালীয়ের পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "হে গোপাল! আমরা সকলেই কালীয়ের যুবতী স্ত্রী, তাই তুমি কেন তোমার বাঁশি বাজিয়ে আমাদের চিত্তকে উদ্বেলিত করছ?" কালীয়ের পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণকে তোষামোদ করছিলেন, যাতে তিনি তাঁদের পতিকে ক্ষমা করেন। তাই এটি উপরসের একটি দৃষ্টান্ত।

এক ভক্ত বলেন, "হে গোবিন্দ! এখানে এই কৈলাস পর্বতে এক অতি সুন্দর পুষ্পকুঞ্জ রয়েছে। আমি একটি সুন্দরী যুবতী আর তুমি একজন রমণীয় যুবক। এর পর আমি আর কি-ই বা বলতে পারি? তুমিই বিচার করে দেখ।" এটি মাধুর্য প্রেমে বাচালতা জনিত উপরসের একটি দৃষ্টান্ত।

নারদ মুনি যখন বৃন্দাবনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ভাণ্ডীরবনের একটি বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অনুগামী প্রসিদ্ধ শুক ও শারীকে দর্শন করেন। তারা *বেদান্ত* দর্শনের কিছু শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করছিল এবং এইভাবে তারা বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে তর্ক-বিতর্ক করছিল। তা দেখে নারদ মুনি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হন, এবং তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এটি অনুরস বা অনুকরণের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ যখন রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দূর থেকে চঞ্চল নয়নে জরাসন্ধ তা দেখছিল এবং অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছিল। এইভাবে বিজয়ের গর্বে গর্বিত হয়ে সে অট্টহাস্য করছিল। এটি অপরসের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত সব কিছুকেই দিব্যভাব বলা হয়, যদিও তা বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হতে পারে—কখনও তা যথার্থ ভাব এবং কখনও তা ভাবাভাস হতে পারে। বিচক্ষণ ভক্তদের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যা প্রেম উদ্দীপ্ত করে, তা দিব্যরস বলে গণ্য করা হয়।

*ইতি—শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*

# উপসংহার :

শ্রীল রূপ গোস্বামী উপসংহারে বলেছেন যে, সাধারণ জনগণের পক্ষে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনুধাবন করা খুবই কঠিন। তবুও তিনি আশা করেন যে, আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ফলে প্রসন্ন হবেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী আনুমানিক ১৫৫২ সালে গোকুল বৃন্দাবনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর প্রকটকালে বৃন্দাবনের বিভিন্ন জায়গায় থাকতেন, এবং তাঁর মুখ্য ভজন-স্থানটি ছিল বর্তমান বৃন্দাবন শহরের শ্রীশ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে। সেখানেই তাঁর ভজন-কুটিরটি আজও বর্তমান আছে। সেখানে দুটি স্মৃতি-সৌধ পাশাপাশি বর্তমান; একটি তাঁর ভজন কুটির, আর অন্যটি তাঁর সমাধি মন্দির। এই সমাধি মন্দিরের পিছনেই রয়েছে আমার ভজন-কুটির। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পর থেকে আমি সেখানে থাকি না। এখন আমার শিষ্যরাই সেই স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে আমি এখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ তথা ইস্‌কনের লস্ এঞ্জেলেস মন্দিরে অবস্থান করছি। এই গ্রন্থের তাৎপর্যটি আজ, ১৯৬৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত হল।

# শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজে হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

শ্রীল রূপগোস্বামী কৃত

# ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীল রূপগোস্বামী কৃত মূল ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের সার সংকলন হচ্ছে এই "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থটি। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" হচ্ছে ভক্তিসমুদ্র থেকে নির্গত অমৃতসুধা। এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক ভক্তিযোগের পদ্ধতি, বা ভগবদ্ভক্তির দিব্য প্রেমময়ী সেবার সর্বোচ্চ সংযোগ। ভক্তিযোগ হল কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের সর্বোচ্চ পন্থা। এটি হচ্ছে সহজ, সরল ও সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এই যুগে এটি সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

ISBN 978-93-85986-46-8
90000>
9 789385 986468